বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা হালখাতা

অবদমন সংখ্যা

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি–মার্চ ২০০৮

প্রকাশকাল
০১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

সম্পাদক
শওকত হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
শরমিন নিশাত

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ পথশিল্প সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র
বাড়ি ৩/সি, রাস্তা ১৩/২, জিগাতলা, পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৩য় তলা, ঢাকা ১২০৯
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৫৫৯১১৩৯৬১,
ই-মেইল: halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম
সফেদ ফরাজী

পত্রিকার নামলিপি
রবিন আহসান

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
শরমিন নিশাত ও শওকত হোসেন
(সালভাদর দালির পেইন্টিং অবলম্বনে)

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ সহযোগিতায়
বিকল্প প্রিন্টিং
সুলতান আহমেদ প্লাজা
৩২ পুরানা পল্টন, নিচ তলা
ঢাকা ১০০০

মূল্য
১০০.০০ টাকা
১০০.০০ রুপি
৫ $ ডলার

সম্পাদকীয়: এক

আমরা জানি, 'অবদমন' সম্পর্কে সর্বপ্রথম তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড। বেদনাদায়ক বা অপমানজনক কোনো স্মৃতি বা ঘটনা যা আমাদের কাছে কাঙ্ক্ষিত নয়, যাকে আমরা মনেও করতে চাই না এবং ভুলে যেতে চাই; তাকে মনের সজ্ঞান স্তর থেকে নির্জ্ঞান স্তরে পাঠিয়ে দেয়াকে ফ্রয়েড বলেছেন 'অবদমন'। অবদমনের এই প্রক্রিয়া মনের অবচেতনে ঘটে থাকে।

কিন্ত প্রায় সোয়া'শ বছর আগের দেয়া তত্ত্বের অর্থ, আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিশে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে এসে ঐ তত্ত্ব আজ একটি ভিন্ন অর্থে উপস্থাপিত হচ্ছে। দার্শনিকদের দেয়া তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে গ্রহণ না-করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ তাদের নিজেদের মতো করে এর ভিন্ন একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছেন। এটা পরিষ্কার যে, শুধু ব্যক্তিজীবনেই অবদমন ঘটে না বরং এর বিষবাষ্পে জড়িয়ে আছে সমাজ, রাষ্ট্র তথা গোটা বিশ্ব।

এটা ঠিক– ঘর থেকেই অবদমন প্রক্রিয়া শুরু হয়। একটি শিশুর চিন্তাজগৎ প্রথম অবদমিত হয় তার মা-বাবা দ্বারাই। শিশুর ছোট ছোট স্বপ্ন, ইচ্ছা বা চাহিদা মা-বাবার আদেশ নিষেধের দেয়াল টপকাতে পারে না। তখন সে অবদমিত হতে থাকে। যদিও মা-বাবা এটাকে অনেক সময় তাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব বলে মনে করেন।

পুঁজিবাদী-বিশ্বায়নের কৌশলগত অবদমনের ফলে বিশ্বব্যপি সৃষ্টি হচ্ছে অর্থনৈতিক বৈষম্য। অবদমন এখন সর্বগ্রাসী হয়ে অক্টোপাসের মতো অষ্ট দিক হতে বেঁধে ফেলছে আমাদের গোটা বিশ্ব।

তবে অবদমিত হতে হতে যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, কোনো দিকে যাওয়ার আর জায়গা নেই– তখন রুখে দাঁড়ানোর প্রশ্নটিও বড় হয়ে আসে। 'অবদমন' মানুষকে আত্মঘাতী করে তোলে। আবার 'অবদমন' থেকে প্রাপ্ত 'বিশেষ-শক্তি' পরিস্থিতির দাবি মেটাতে মানুষকে প্রতিবাদী এবং স্বাধীনতাকামীও করে তোলে।

শরমিন নিশাত
নির্বাহী সম্পাদক
০১.০২.২০০৮

সম্পাদকীয়ঃ দুই

'অবদমন' বলতে সাধারণভাবে আমরা প্রায় সবাই সেক্সুয়াল অবদমনকে বুঝি। সিগমুন্ড ফ্রয়েড যেহেতু অবদমন বা রিপ্রেশন তত্ত্বে সেক্সের ওপর জোর দিয়েছেন, সে কারণেই হয়তো এটি ঘটছে। কিন্তু 'হালখাতা'র 'অবদমন সংখ্যা'য় রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবদমনসহ অন্যান্য রিপ্রেশনের কথাও আলোচিত হয়েছে। এ সংখ্যার কোনো কোনো লেখায় অবদমনের সঙ্গে 'দমন' বা 'সাপ্রেশন' বিষয়টিও উঠে এসেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর 'এডুকেশন এ্যান্ড দি স্যোসাল অর্ডার' গ্রন্থে যেমন দেখিয়েছেন, কোন ধরনের সামাজিক চাপ আদর্শ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, অর্থ-দেশপ্রেম -নৈতিক শিক্ষাদর্শের ক্ষতি করে এবং সামাজিক চাপ যৌনতা ও ধর্ম বিষয়ে ভুল শিক্ষাদানের মাধ্যমে কীভাবে অনিষ্ট করে।

দুই

ফ্রয়েড মানুষের মনকে কনশাস, প্রি-কনশাস ও আনকনশাস– তিন স্তরে ভাগ করেছেন। জীবনে ঘটে যাওয়া কষ্টদায়ক বিষয় যা ব্যক্তি কখনো আর মনে করতে চায় না– সেগুলো তার মনের আনকনশাস স্তরে চলে যায় এবং পরবর্তীকালে ওই ব্যক্তির নানা আচরণের মধ্যদিয়ে এর প্রকাশ ঘটে। কখনো আবার সেই অতৃপ্ত বাসনা স্বপ্নের ভেতরে সে প্রত্যক্ষ করে। কারও মধ্যে সেটা আবার বিকৃতি হয়ে দেখা দেয়।

পক্ষান্তরে আমাদের সমাজে 'অবদমন' শব্দটি আলাদা ধরনের হেজিমনি তৈরি করেছে। 'না' দিয়ে ঢেকে রাখার যাবতীয় চাপ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ধর্মীয় ইত্যাদি কারণে কোনো কাজ করতে না-পারার যে মনস্তাত্ত্বিক চাপ– সেটাই অবদমন– যার কার্যকারণ ঘটে মনের মধ্যে। যদিও দমনের বিষয়টি ঘটে মনের বাইরে থেকে। সুতরাং দমন দৃশ্যমান আর অবদমন অদৃশ্যমাণ।

তিন

পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলো একে অন্যের প্রতি সহনীয় আচরণ করবে– এ লক্ষ্যে জাতিসংঘ গঠিত হলো। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-দর্শনগুলো সেক্ষেত্রে কাজে আসলো না। কারণ শুধু অভাব নয় । বরং রাষ্ট্রের মনের মধ্যেও ঘটে অবদমনের কার্যকারণ; কোনো কোনো রাষ্ট্র আছে, সেখানে রাষ্ট্রের নির্বাহী বা সরকারের পরিবর্তন ঘটে কিন্তু সেই সব রাষ্ট্রের নীতি পরিবর্তিত হয় না। একই নীতির ওপর ধারাবাহিকভাবে সকল নির্বাহী অর্থাৎ সরকারগুলো কাজ করে যায়। নির্বাহীগণ বা সরকার হল রাষ্ট্রের শরীর আর ঐ রাষ্ট্রনীতি হল রাষ্ট্রের মন। রাষ্ট্রের এই মনের মধ্যে ঘটে অবদমনের ঘটনা যাকে বলা যায় 'রাষ্ট্রের অবদমন'।

ফ্রয়েডের অবদমন তত্ত্বকে নকল করে বলা যায়, রাষ্ট্রের জীবনে ঘটে যাওয়া কষ্টদায়ক বিষয় যা ওই রাষ্ট্র কখনো আর মনে করতে চায় না– সেটা তার আনকনশাস স্তরে চলে যায় এবং পরবর্তী কালে ঐ রাষ্ট্রের নানা হিংস্র ও অস্বাভাবিক আচরণের মধ্যদিয়ে তার প্রকাশ ঘটে ।

চার

প্রচণ্ডভাবে অবদমিত আমাদের সমাজে তো আলোর চেয়ে ছায়ার ছড়াছড়িই বেশি– হতে পারে সূর্য হতে পৃথিবী অনেক দূরে বলে এখানে আলোর তুলনায় ছায়া এতোটা বেশি এসে যাচ্ছে; ঘরে-উঠানে-হাতের কাছে ঘোরাঘুরি করে সেই ছায়া, সবকিছু ঢেকে দেবে বলে । এক সূর্য ছাড়া মহাব্রহ্মাণ্ডে আরও যে অসংখ্য নক্ষত্র আছে, ওরা আসলে আমাদের কেউ না, আমাদের সমাজের অসংখ্য নক্ষত্রের মতোই ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'হে সূর্য!....হে দ্যুলোক আমাদের শ্রেষ্ঠ উৎপত্তি স্থান, আমি তোমার হতে কয় পুরুষই-বা দূরে? বরং ও-ই আমার উৎপত্তিস্থান, ও-ই স্থানেই আমার নিবাস...(ঋগ্বেদ) ।'

সেই 'সূর্যস্থল' থেকে সরে এসে জমির মালিক হয়েছি, পরিবার-রাষ্ট্র-সমাজ তৈরি করেছি– জাতিসংঘ বানিয়েছি । সমাজ সৃষ্টির, বিকাশের যেমন কারণ আছে, সামাজিক বিপ্লবেরও একটা কারণ থাকা চাই । বলা যায় সেই কারণমতো উপযুক্ত পরিস্থিতির দাবি মেটাতে আমাদের সমাজেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসন্ন । এই সমাজ তখন আর এভাবে অবদমিত থাকবে না, এটা প্রকৃতই আমার ও আমাদের হয়ে উঠবে ।

বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা'র ২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা 'অবদমন' নিয়ে একটি আলোচনা তুলে ধরল মাত্র । এই আলোচনা চাঙা হয়ে উঠলে এবং তা অব্যাহতভাবে চলতে থাকলে হালখাতা'র চেষ্টা সামান্য সফল হবে ।

শওকত হোসেন
সম্পাদক
০১.০২.২০০৮

সূচি

প্রচ্ছদ পরিচিতি

যোদ্ধা এক অবদমিত সত্তা, সে নারী বা পুরুষ নয়
ম ই নু দ্দী ন খা লে দ ০৭

'দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব সংখ্যা'র প্রতিক্রিয়া

'হালখাতা'র 'দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব সংখ্যা' প্রসঙ্গে
বি শ্ব জি ৎ স র কা র ১০

হালখাতা'র পথচলা নিরন্তর হোক
দে লো য়া র হো সে ন ১২

ভিন্ন আয়োজনে 'হালখাতা'র যাত্রা
স ফে দ ফ রা জী ১৩

প্রবন্ধ

অবদমনের অ আ ক খ
নী হা র র ঞ্জ ন স র কা র ১৪

অবদমনের স্বরূপ
অ জ য় রা য় ১৮

সাক্ষাৎকার

দমন ও অবদমন
হা সা ন আ জি জু ল হ ক ২৭

নারীর অবদমনে রাষ্ট্র এবং পুরুষ
সে লি না হো সে ন ৩৫

প্রবন্ধ

ফ্রয়েডের আবিষ্কার: দমন ও বাসনা
স লি মু ল্লা হ খা ন ৪৫

অবদমন: অবয়ব বিশ্লেষণ
ফ রী দু ল আ ল ম ৪৮

অবদমনের মনস্তাত্ত্বিক সূত্র
সি দ্ধা র্থ শ ং ক র জো য়া র্দ্দা র ৫৮

সাক্ষাৎকার
অবদমন: শরীর ও মনে
মেহতাব খানম ৬৬
অবদমন: রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক
জাকির তালুকদার ৭৯

প্রবন্ধ
অবদমনের বিভিন্ন প্রেক্ষিত
নির্মলেন্দু গুণ ৯২
পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বায়ন ও অবদমিত সমাজ
আহমেদ স্বপন মাহমুদ ৯৮
অবদমিত ব্যক্তিসত্তা ও সমাজ
রতনতনু ঘোষ ১০১
বাণিজ্য নীতিতে অবদমন: রাষ্ট্রের মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত
অপর্ণা হাওলাদার ১০৪

অনুবাদ
অবদমনের ধারণা
মিশেল ফুকো/শওকত হোসেন ১০৬

প্রবন্ধ
বাংলা সাহিত্যে অবদমন
হাসান অরিন্দম ১১৮
নারী অবদমন প্রসঙ্গ
সালেহা চৌধুরী ১২৪
শিশু ও নারীর অবদমন
বিভানূর মুন্সী ১২৯

নিবন্ধ
যাপিত জীবনে
ফেরদৌসী সুলতানা ১৩৪
অবদমন: একটি অশালীন পর্যালোচনা
তুহিন সমদ্দার ১৩৮

প্রতিক্রিয়া
ভিডিও চলচ্চিত্র ‘ব্ল্যাকআউট’ ও কিছু অবদমন দৃশ্য
টো ক ন ঠা কু র ১৪৫
অবদমন: প্রথা ও সংস্কারের জাল
আ নে য়া র হা সা ন ১৪৭
অবদমন ও একটি জাতির ভবিষ্যৎ
ফ রি দু জ্জা মা ন ১৫০
দিনযাপন
অ মি তা চ ক্র ব র্তী ১৫২
অবদমন ও আমরা
ই য়া সি র আ জি জ ১৫৪

প্র চ্ছ দ প রি চি তি

যোদ্ধা এক অবদমিত সত্তা, সে নারী বা পুরুষ নয়

ম ই নু দ্দী ন খা লে দ

‘যুক্তির নিদ্রাচ্ছন্নতা দৈন্যের জন্ম দেয়’– এই ছিল ফ্রাসিসকো গয়্যার একটি ছবির নাম। এ ছবিতে টেবিলে মাথা পেতে ঘুমিয়ে-পড়া একটি মানুষের মাথা ঘিরে উড়ছে এক ঝাঁক কালো বাদুড়। কালো বাদুড় শুভ, না অশুভ? জাগ্রত চৈতন্য সত্য, নাকি সত্য অবচেতনের কালো বাদুড়-ঝাঁক? বিশাল বিভ্রম। গয়্যার এই ছবির প্রায় দেড়শ’ বছর পর ওই একই দেশের শিল্পী অর্থাৎ স্পেনের সালভাদর দালি ছবি আঁকতে লাগলেন– তাতে আমরা ‘যুক্তিহীনতার বিজয়’ দেখতে পেলাম। কথাটা দালিরই। এই

শিল্পী অবচেতনের তীরে এসে বলেন, 'আমার আর পাগলের মধ্যে পার্থক্য এই যে আমি পাগল নই'। অর্থাৎ সচেতন যুক্তিহীনতা। তাই যে আন্দোলন অবচেতনের নিরুদ্ধ নিকষ অন্ধকারে স্থির হাতে কুপি হাতে ঢুকে যায়– জানতে চায় কোন প্রকোষ্ঠে কোন ভূত বাস করে, সেই সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের সবচেয়ে ক্ষ্যাপা পুরোহিত ধাঁধার ভাষায় আবারও বলেন, 'আমার আর সুররিয়ালিস্টদের মধ্যে পার্থক্য এই যে আমি সুররিয়ালিস্ট'।

মানুষ তার ক্ষমতার দাপটে অস্তিত্বের ভেতরের কোনো প্রান্তরে ঘোড়া দাবড়িয়ে ছোটে, অশ্বক্ষুরের ধূলায় ঢেকে যায় তার প্রান্তর। এভাবে মানুষ নিজেকে খুঁজে পায় এবং হারিয়েও ফেলে আধিপত্যের আতিশয্যে। আধিপত্যের ঘোড়া বিশাল মাঠ খোঁজে, খোঁজে সেই মাঠে প্রতিপক্ষ, লড়াই, রিরংসা, প্রতিহিংসার আগুনখেলা। এই মাঠেই ব্যক্তিমানুষ তার কামনা, বাসনা, ভেতরের ধীশক্তি সাপ, অভিশাপ সব উগড়ে দেয়। হননেচ্ছু না হলে কী করে মানুষ তার শক্তি আবিষ্কার করে? অনুভব করে ভেতরের আমির সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রতিমা? ষাঁড়ের লড়াইয়ের দেশের শিল্পী দালির ছবিতে স্পেনের অনন্ততা প্রদর্শিত হয়। অবশ্য সেই যুক্তিহীনতা শক্তির পরাকাষ্ঠায় নয়, মরমি মনও আরাধনায় ব্যস্ত করে স্পেন। ডুবে যায় অবচেতনের অনন্ত সাগরে। মরমিতার সায়রেও ডুবসাঁতার দিয়ে যিশুর ক্রুশ স্পর্শ করেছেন দালি এবং তিনি ওই বিধি মেনেই মেরির কোলে ঠাঁই নিয়েছেন। ১৯২০-এর দশকের শেষে দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝের কালসরণীতে দাঁড়িয়ে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেন দালি। আরেকটি মহাযুদ্ধ এগিয়ে আসছে দূরপ্রসারী দালিমন তা বুঝে ফেলে। তাই তার ছবিতে কায়ার চেয়ে ছায়া বড় হয়ে যায়, শিল্পের ইতিহাসে আতঙ্কের অধ্যায় যুক্ত হতে থাকে। মহাযুদ্ধের আগেই তার নিজের দেশে 'সিভিল ওয়ার' শুরু হয়ে যায়। যা তিনি ভেবেছিলেন তা হল না। যুদ্ধের বাঁশি শোনার আগেই বোমার আঘাতে নিজের দেশের একাংশ পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেল। দালি বুঝলেন অনেক দিনের চাপা-থাকা ক্রোধ আগ্নেয়গিরির মতো ফুঁসে উঠল দুঃশাসক ফ্রাঙ্কোর রাক্ষুসে অস্তিত্ব থেকে। নির্জ্ঞান ও জ্ঞান, বাস্তবতা ও স্মৃতির জটপাকানো অবস্থার 'সাইকোঅ্যানালাইসিস'-এ মগ্ন হয়ে ফ্রয়েডকে স্যালুট জানালেন শিল্পী। তার সব ছবিতেই ধ্বংসোন্মুখ অঞ্চল আছে, সর্ষেদানার মতো অনুষঙ্গ, তার পাশে আছে দানবীয় অতিকায় অবয়ব, পরিণামে দুটোই সংঘর্ষ। আক্রমণ, সংঘর্ষ, সবই ন্যাচারাল। যুদ্ধটা আসলে 'ন্যাচারাল ফেনোমেনন'। পিকাসো অবশ্য দালির বিরোধিতা করেন। তার মতে যুদ্ধ পলিটিকাল ফেনোমেনন।

দালি কিন্তু ব্যক্তিকেই খুঁড়তে লাগলেন। খুঁড়তে খুঁড়তে তিনি অভাবিত ব্যাপ্ত স্পেসে অদ্ভুতুড়ে রূপান্তর প্রক্রিয়া দেখতে পেলেন পরিচিত মানুষ ও বস্তু-পৃথিবীতে। তার চোখের সামনে থেকে মুছে গেল রেঁনেসাসের পরিপ্রেক্ষিত। স্বপ্নের স্পেসে তিনি একই সমতলে অজস্র দিকে অনন্ততাকে ছুটে যেতে দেখলেন। স্বপ্ন না বলে দুঃস্বপ্ন বলাই সমীচীন। কারণ তা এক অচেনা পরিধি। ইমেজরাশির এক বিচিত্র গ্রন্থিলতা। এক ইমেজ থেকে অন্য ইমেজ জন্ম নেয়। চোখ সরু করে অবচেতনের সেই স্পেসের

রূপ পরীক্ষা করলে বোঝা যায় আপাতদৃষ্টে যা নয়নসুখকর তার মধ্যে যুদ্ধ ও কামনা এক জটিল বাতাবরণ তৈরি করেছে।

১৯৩৮-এ দালি 'স্পেন' নামে এই ছবিটি আঁকেন। এ তার স্বপ্ন-দেখা স্বদেশ নয়। ফ্রাঙ্কোর নিষ্ঠুর যাদুপাশে বন্দি দুঃস্বপ্নের ঘেরের স্পেন। ইমেজের দ্বৈততায় তিনি স্বদেশকে আবিষ্কার করেছেন। এ ছবিতে দালির সঙ্গে দা ভিঞ্চিও আছেন। দা ভিঞ্চির 'ব্যাটল অফ আলযিয়ারি' ও ভার্জিন মেরির মুখটা আছে। ছবিটি চোখ থেকে কমপক্ষে এক ফুট দূরে সরিয়ে চোখ দুটি সরু করে তাকিয়ে দেখলে উপরের দিকে এক নারীকে পাওয়া যাবে। নারীর মুখ আনত, ভিঞ্চির মমতাময়ী মেরী, কিন্তু তার মুখের ও মুখের উপরের স্পেসে মমতা নেই, নির্মম যুদ্ধ আছে, অবদমিত মনের ফলাফলটা আছে। ঘোড়সওয়ারীর ছোটাছুটি, হানাহানি আছে। এই যুদ্ধদৃশ্যটিও ভিঞ্চিরই আঁকা। নারী আকণ্ঠ লড়াইয়ে আক্রান্ত। তার গলদেশ যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে দুই সৈনিক সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত কিন্তু আপাতদৃষ্টে তা নারীর বক্ষদেশ। সেই নারীর দুই চোখেও দুই অশ্বারোহী যোদ্ধা। যোদ্ধা আপাতদৃষ্টে নারীর ভ্রু। সেই ভ্রু নারীর কপাল না হয়ে অনন্তে ধাবিত অবস্থায় রয়েছে। কোনো-এক যোদ্ধার লাল কাপড় নারীর পেলব আপেল-রং ঠোঁট হয়ে গেছে। আর এই লালের সঙ্গে ড্রয়ার থেকে বেরিয়ে আসা লাল কাপড়ের সম্পর্ক তৈরি হয়। এরই মধ্যে সম্পর্ক অনুভূত হয় কামনার লাল ও যুদ্ধের লাল আগুনের। নারীর হাতটি যেখানে ভর করেছে ওয়্যারড্রব, নাকি কোনো বাড়ির সামনের অংশ। এই দেহ কি আসলে নারীর? নারীরই যদি হবে তা হলে পা দুটি তার পুরুষ সৈনিকের মতো কঠিন কেন? আর ওয়ারস্ত্রণের দেহটা মানুষী দেহের মতো দাঁড়িয়ে আছে কেন! বিবিধ বোধের পুঞ্জীভূত রূপ নয় শুধু এ ছবি।

প্রচণ্ডভাবে অবদমিত মনোজাগতিক ইমেজের রূপান্তর; যাতে মানুষী দেহের মাথা হয়েছে যুদ্ধের ময়দান। এই মস্তিষ্ক-ময়দানে যুদ্ধদৃশ্য দেখাই আসল কথা নয়, আসলে মগজ-ঠাসা সময়ের কানুনে, অন্যকে পীড়ন করার সূত্র মগজের কোষে কোষে গাঁথা। মূল কথা হল যুদ্ধ যে করে সেই যোদ্ধা এক অবদমিত সত্তা, সে নারী বা পুরুষ নয়। তা ক্রমরূপান্তরশীল। চাপ চাপ অনুভূতি একে একে খসিয়ে তবে সেই অবদমিত রিরংসালোকের রহস্য উন্মোচন করতে হয়।

‘হালখাতা’র ‘দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব সংখ্যা, প্রসঙ্গে

বিশ্বজিৎ সরকার

আমার জানা মতে বিষয়ভিত্তিক এবং ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাংলাভাষায় দ্বিতীয়টি নেই। সেটা এপার ওপার দু’বাংলার জন্য প্রযোজ্য। বিষয়ভিত্তিক পত্রিকা দু’চারটা থাকলেও সেগুলো বছরে একটি করে বের হয়, কোনো কোনোটি আবার বছরেও বের হয় না। আর যেগুলো নিয়মিত প্রকাশ হয় সেগুলোর একটিও বিষয়ভিত্তিক নয়।

এসব কথা বলার পেছনে কারণ হল একটি ত্রৈমাসিক এবং বিষয়ভিত্তিক এবং সিরিয়াস পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করা সত্যি কঠিন কাজ। সম্পাদক শওকত হোসেন ও নির্বাহী সম্পাদক শরমিন নিশাতকে আমি ব্যক্তিগতভাবে না চিনলেও, এ দু’জনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের, ‘কঠিনেরে বাসিলাম ভালো’– কথাটিই মনে করিয়ে দেয়। আমার পরিবার এবং বন্ধুরা বলে জন্মের পর আমার মুখে নাকি মধু দেয়া হয়নি; তাই আমি প্রায় সবকিছুরই নাকি তেতোব্যাখ্যা পরিবেশন করে থাকি। কিন্তু আমার বাড়ির কাছের একটি বই-এর দোকান থেকে ‘হালখাতা’ পত্রিকাটি কিনে এবং তা পাঠ করে আমি যা পেলাম সেটা সত্যিকার অর্থেই যদি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতাম তাহলে হয়তো আমার জন্মের পর আমার মুখে মধু না দেয়ার অভিযোগটি কেটে যেত। হালখাতা আসলেই ‘দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব সংখ্যা’র ভেতর দিয়ে একটি প্রশংসামূলক যাত্রার সূচনা করল। এ যাত্রার শেষ কোথায় আমি জানি না।

তবে এগার ফর্মার একটি সিরিয়াস প্রবন্ধের পত্রিকা যার মধ্যে যতীন সরকার, সলিমুল্লাহ খান, মঈন চৌধুরী, এবং শওকত আলীর মতো লেখকগণ যেমন আছেন অন্যদিকে জাকির তালুকদার, মামুন হুসাইন, ফয়েজ আলমের মতো সম্ভাবনাময় লেখকগণও রয়েছেন। এঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটলে ভালো লাগত। পরিচয়ের আগ্রহের কথা অবশ্য ‘হালখাতা’র সম্পাদককে আমি মোবাইলে জানিয়েছি। বিশেষ করে মামুন হোসাইনের সাক্ষাৎকার পড়ে আমি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছি। তার কথার মধ্যে শিল্পিত ঢঙ যেমন রয়েছে আবার শ্লেষ-এর মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রকে আঘাতও তিনি করেছেন।

শওকত হোসেনের সম্পাদকীয় পড়ে একটি দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয়েছে কবি ফররুখ আহম্মদ, কবি গোলাম মোস্তফা প্রমুখ বিতর্কিতদের প্রগতিশীল লেখকদের

কাতারে টেনে এনে সম্পাদক কি ঠিক করলেন? আবার অন্য দৃষ্টিতে মনে হয়েছে 'পাঞ্জেরী' কবিতার কবি ফররুখ আহম্মদ প্রগতিশীল হবেন না কেন? কিংবা মহামানব (স.) এর জীবনীকারকে আমরা ঠেলে ফতোয়াবাজদের দলেই বা দেব কেন? এদিক থেকে মনে হয়েছে সম্পাদক সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তারপরও এ বিষয়ে আমার দ্বিধা আর ডরভয় রয়েই গেল।

'হালখাতা'র প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ সুন্দর হয়েছে। কিন্তু প্রচ্ছদ পরিকল্পনা শওকত হোসেন ও শরমিন নিশাত করলেও, প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিটি কার আঁকা কোথাও তার উল্লেখ নেই। যা দুঃখজনক। পত্রিকার নামলিপি করেছেন রবিন আহসান। যা আমি সম্পাদককে ফোন করে জানতে পারি। কিন্তু পত্রিকার কোথাও এর উল্লেখ নেই।

এটাও রবিন আহসানের প্রতি অবিচারমূলক কাজ বলে আমার মনে হয়েছে।

দার্শনিক জায়গা থেকে যতীন সরকারের প্রবন্ধটি খুবই প্রশংসার দাবি রাখে। মোজাফফর আহমদ ও আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ-এর সাক্ষাৎকার পড়তে ভালো লেগেছে। চঞ্চল আশরাফ-এর লেখাটি তেমন মানসম্পন্ন মনে হয়নি, যদিও তার কবিতার আমি ভক্ত। সিদ্ধার্থ শঙ্কর জোয়ার্দ্দার-এর লেখাটি ভালো, তথ্যসমৃদ্ধ ও চিন্তামনস্ক। আহমেদ স্বপন মাহমুদ আন্তর্জাতিক একাধিক প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি নিয়ে যে লেখাটি লিখেছেন, সেটি আরো বিশ্লেষণের দাবী রাখে। মজিদ মাহমুদের লেখাটি এলোমেলো মনে হয়েছে। শওকত হোসেনের অনুবাদ কঠিন ও অসংগত বাক্য দ্বারা পূর্ণ যা পড়তে কষ্ট হয়েছে, পড়ে আমি অন্তত তেমন কিছু বুঝিনি। দু'জন মুক্তিযোদ্ধা– জনাব জয়নাল আবেদীন ও ড. বাতেন শাইখ চমৎকার দুটি প্রতিক্রিয়া উপহার দিয়েছেন। জয়নাল আবেদীনের লেখায় তার ব্যক্তিগত সততা ও সেক্রিফাইসের জায়গাটি ফুটে উঠেছে যা আমাদের উৎসাহিত করে। আর ড. বাতেন শাইখ-এর লেখায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে।

সব মিলিয়ে ত্রৈমাসিক বিষয়ভিত্তিক পত্রিকা 'হালখাতা'র প্রথম বর্ষ ১ম সংখ্যা অর্থাৎ 'দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব সংখ্যা'টি ভালো হয়েছে। এই ভালো বলা শুধু প্রশংসার জন্য প্রশংসা নয়। এই ভালো তখনই সার্থক হবে যখন এর চলার পথ স্থায়িত্ব পাবে। এমন একটি পত্রিকার যেন অকালমৃত্যু না ঘটে। অকালমৃত্যু তো আমাদের শুধু কষ্ট দেয় না আশাহতও করে।

বিশ্বজিৎ সরকার। কবি, কলেজ শিক্ষক, ফরিদপুর।

হালখাতা'র পথচলা নিরন্তর হোক

দে লো য়া র হো সে ন

বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা' একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে তার এই যে প্রথম আত্মপ্রকাশ, 'দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব সংখ্যা'টি আমার কাছে অত্যন্ত সময় উপযোগী বলে মনে হয়েছে। আমার জানামতে বাজারে এরকম পত্রিকা আর আছে বলে মনে হয় না। 'দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব সংখ্যা'টির বিশেষত্ব এই যে, দেশের তথা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সর্বস্তরের মানুষের পক্ষে 'দুর্নীতি' একটি ব্যাধির মতো। যার সাইক্লোজিকাল ট্রিটমেন্ট কী বা সেটা কী কী উপায়ে সম্ভব– এসব মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী দার্শনিক পর্যালোচনা পূর্বে হয়নি বলে পাঠক হিসেবে একে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ করতে গিয়ে পত্রিকার অন্য কোনো দুর্বলতা থাকলেও সেটাকে তুচ্ছ মনে হয়েছে।

দুর্নীতির রোগে আক্রান্ত জাতি হিসেবে নিজেদের তলিয়ে যেতে না দিয়ে বরং রোগমুক্তির উপায় হিসেবে আত্ম-সমালোচনা করা যেমন একান্ত জরুরি তেমনি পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ববাজারের আগ্রাসী থাবা থেকে নিজেদের মুক্ত করার লক্ষ্যে সমালোচনমূলক প্রবন্ধগুলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে। মঈন চৌধুরী ও সলিমুল্লাহ খানের 'আলাপ' ব্যতিক্রম ধারার আয়োজন, যেখানে তাদের দু'জনের এই গঠনমূলক–বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনায় বেরিয়ে এসেছে 'সাইকো–অ্যানালিটিক্যাল বিষয়।'

যতীন সরকার দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন মহাভারত থেকে একটি দৃষ্টান্ত 'পরের মর্ম ছিন্ন না করে, দুষ্কৃত কর্ম না করে, মাছ ধরার মতো বিশ্বাসঘাতকতা না করে কেউই বৃহৎ সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে না।' অর্থাৎ তিনি বলেছেন যে শ্রেণীসমাজে সম্পত্তি আর দুর্নীতি একইসাথে অপরিহার্য দু'টি বিষয়। একটি বাদ দিলে অন্যটি অসম্ভব।

পত্রিকাটির শরীর জুড়ে সিরিয়াসনেসের যে ছাপ রয়েছে, এই সিরিয়াসনেসই এ পত্রিকাটির টিকে থাকার ক্ষেত্রে কাল হয়ে উঠতে পারে। কাজেই এই বৈশিষ্ট্যকে স্থায়িত্ব দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। সে ক্ষেত্রে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সেটা এর সাথে সংশ্লিষ্টগণ আশা করি ভেবে দেখবেন।

দেলোয়ার হোসেন [প্রকৌশলী, ঢাকা।]

ভিন্ন আয়োজনে ‘হালখাতা’র যাত্রা

স ফে দ ফ রা জী

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির জন্মের আগে থেকে, এমনকি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অসংখ্য দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক পত্র-পত্রিকা ও ছোটকাগজ কিংবা সংকলনের আত্মপ্রকাশ যেমন লক্ষ করা গেছে, তেমনি এগুলোর মৃত্যুও ঘটেছে অহরহ। এদের অনেকগুলোই ব্যাপক সম্ভাবনা নিয়ে, আশা-জাগানিয়া ঢঙে যাত্রা শুরু করেছিল, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো এত স্বল্পায়ু ও আশাভঙ্গের বার্তা দিয়ে গেছে, যা কখনোই পাঠকমহলের প্রত্যাশিত নয়। তাই নতুন কোনো পত্রিকা, ছোটকাগজ কিংবা সংকলনের আত্মপ্রকাশ যেমন আমাদের আপ্লুত করে, স্বপ্ন দেখায়, তেমনি এক অজানা আশাভঙ্গের শঙ্কাও আমাদের তাড়া করে ফেরে। বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘হালখাতা’র প্রথম সংখ্যা হাতে নিয়েই উপরোক্ত ভাবনাগুলো মনে এল। জানি না ‘হালখাতা’র শেষযাত্রা কোথায়? একেবারে ভিন্ন আয়োজনে যাত্রা শুরু করল ‘হালখাতা’। পত্রিকাটির প্রচ্ছদে ‘হালখাতা’ লেখাটির উপরে সাব-হেড দিয়ে এর প্রাথমিক চরিত্রটি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা দেয়া হয়েছে ‘বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা’। ছোটকাগজ বা সংকলন নয়। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ‘দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব সংখ্যা’। দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব নিয়ে কোনো পত্রিকায় বা ছোটকাগজে সংখ্যা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এক্ষেত্রে আয়োজনটি অবশ্যই নতুন এবং সেজন্য এটি সাধুবাদ পাওয়ার দাবি রাখে।

‘হালখাতা’র শুরুতেই নির্বাহী সম্পাদক ও সম্পাদক, পত্রিকা ও বর্তমান নির্বাচিত বিষয়টির বিষয়ে কিছু কথাবার্তা লিখেছেন। যেমন– ‘....দুর্নীতিতে আমাদের যে অবস্থান তৈরি হয়েছে, তাতে নিজেদের মনুষ্য জাতি হিসেবে ভাবতে কষ্ট হয়। তবে বাঙালি হিসেবে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অন্য দিকগুলোর কথা ভেবে, কী কারণে আমরা দুর্নীতিপরায়ণ হলাম, সেটা আবিষ্কার করা জরুরি হয়ে পড়েছে।’ কিংবা ‘....সকল দুর্নীতির বীজতলা হল ‘বৈষম্য’। আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের কারণে মানুষের মনে দুর্নীতি করার প্রেরণা জাগে। ... মানুষের মধ্যে আস্থা ও প্রেম সৃষ্টির লক্ষ্যে সবার আগে বৈষম্যের বিষদাঁত ভাঙতে হবে, এভাবে মানুষের মধ্যে উঁচু মনস্তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।’ সম্পাদকীয় থেকেই বোঝা যাচ্ছে পত্রিকাটি ব্যক্তিক, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব বিষয়ে পাঠককে ভিন্ন ভিন্নভাবে ভাবাতে চায়।

সফেদ ফরাজী
কবি, সাংবাদিক, ঢাকা।

অবদমনের অ আ ক খ

নী হা র র ঞ্জ ন স র কা র

'অ'বদমন' শব্দটি মনোবিজ্ঞানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। অবদমনের ধারণাটি সর্বপ্রথম তৈরি করেছিলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড। ফ্রয়েড অবদমন বলতে একটি মানসিক প্রক্রিয়াকে বুঝিয়েছিলেন– যার অর্থ হল কিছু অবাঞ্ছিত বেদনাদায়ক ঘটনার স্মৃতিকে মনের নির্জ্ঞান স্তরে প্রেরণ করা যার ফলে উক্ত স্মৃতিটি আমাদের কষ্ট দিতে না পারে। ফ্রয়েড যে অর্থে অবদমনের ধারণাটি ব্যবহার করেছিলেন তা বুঝতে হলে প্রথমে ফ্রয়েডের মনের গঠন-সম্বন্ধীয় ধারণাগুলোকে বুঝতে হবে।

দুই

(Structure of the mind) ফ্রয়েড মানুষের মন (*Psyche*) বা মানসিক প্রক্রিয়াসমূহকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছিলেন। যেমন ঈদ্ বা আদিম সত্তা (*Id*), ইগো বা অহংসত্তা (*Ego*) এবং অতি অহং বা বিবেক (*Super Ego*)। এগুলো হল বিভিন্ন ধরনের শক্তির অথবা কার্যাবলীর উপমা বা রূপক। যেমন ফ্রয়েড মনে করেন যে, ঈদ্ বা আদিম সত্তা হল জৈবিক সত্তা যা সব ধরনের কামনা-বাসনার আধার। এটা জন্মের সময়ই শিশুর মধ্যে বিদ্যমান থাকে এবং মনকে চালানোর জন্য সকল শক্তি সরবরাহ করে। শিশুর মৌলিক তাগিদগুলো হচ্ছে খাদ্যের চাহিদা, পানীয়ের চাহিদা, উষ্ণতার চাহিদা, স্নেহ ভালোবাসার চাহিদা এবং যৌন চাহিদা। এসব চাহিদার সমষ্টি হল আদিম সত্তা। ফ্রয়েড ছিলেন স্নায়ুতত্ত্ববিদ। সেজন্য তিনি বাস্তবসম্মতভাবে ধারণা করেছিলেন যে, ঈদ্ বা আদিম সত্তার সকল শক্তির উৎস হল জৈবিক। তিনি এই শক্তির নাম দিয়েছিলেন লিবিডো (*Libido*)। শিশুর বয়স যখন বাড়ে তখন ধীরে ধীরে এই জৈবিক শক্তি মানসিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এটা সম্পূর্ণরূপে মনের অবচেতন স্তরে থাকে যা আমাদের অবহিতির বাইরে। সুতরাং এটা বোঝা গেল যে, ঈদের কার্যাবলীর বেশির ভাগই অবচেতন মনে ঘটে। ঈদ্ বা আদিম সত্তা সুখনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করে এবং এটা সব ধরনের কামনাকে তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ

করতে চায়। ঈদ্ যখন সন্তুষ্ট হয় না, অন্য কথায় ঈদ্ যখন তার তাগিদগুলো পূরণ করতে পারে না, তখন পীড়ন বা চাপ সৃষ্টি হয়। ঈদ্ এই পীড়ন থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ সে এটা বর্জন করতে চেষ্টা করে। শিশুর যখন ক্ষুধা পায় তখন তার মধ্যে একটি বেদনাবোধ সৃষ্টি হয় এবং সে নড়াচড়া করতে শুরু করে। যাতে সে স্তন্যপান করতে পারে। ক্ষুধার জন্য যে পীড়ন বা চাপ সৃষ্টি হয়েছিল স্তন্যপানের মাধ্যমে সে তার থেকে মুক্তি পায়। বিভিন্ন ধরনের তাগিদ জানাতে পীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়ার আরেকটি পদ্ধতি হল চিন্তন (thinking), কল্পনা বা দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে সন্তুষ্টি লাভ করা। এগুলোকে বলা হয় মৌলিক প্রক্রিয়ার চিন্ড়ন (primary process thinking)। শিশু যখন স্তন্যপান করতে পারে না তখন সে মায়ের স্তন্য পান করছে বলে কল্পনা করে এবং এর মাধ্যমে সাময়িকভাবে ক্ষুধার জন্য সন্তুষ্টি পায়।

মনের পরবর্তী অংশ হল ইগো বা অহংবোধ। ইগোর বিকাশ ঈদের মতো নয়। ইগো সচেতন এবং এটা শিশুর ৬ মাস থেকে ১২ মাসের মধ্যে ঈদ্ থেকে বিকাশ লাভ করে। ঈদ্ যেমন চাহিদা পূরণের জন্য দিবাস্বপ্নের আশ্রয় নেয় ইগো তা না করে বাস্তব জগতের মোকাবেলা করে। ইগো প্রাথমিক বা মৌলিক প্রক্রিয়া যেমন চিন্তা, কল্পনা ইত্যাদি প্রয়োগ করে না বরং ইগো গৌণ চিন্তনপ্রক্রিয়া যেমন পরিকল্পনাকরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করে এবং বাস্তবতার নীতি (Reality Principle) অনুসরণ করে এবং ঈদ্ যেসব প্রেষণার তাৎক্ষণিক তৃপ্তি চায় সেগুলোর সাথে বাস্তব পরিস্থিতির সমঝোতা করে। মনের বিকাশের শেষ ধাপে সুপার ইগো বা অতি অহং-এর উদ্ভব ঘটে– যা আমাদের বিবেক হিসাবে কাজ করে। সুপার ইগো কোনো একটি মুহূর্তে সৃষ্টি হয় না, এটি সমস্ত শৈশবকাল জুড়ে বিকাশ লাভ করে। শিশু যখন বুঝতে শেখে যে তাদের অনেকগুলো আকাঙ্ক্ষা (Impulse) যেমন কামড় দেয়া বা বিছানায় প্রস্রাব করা পিতামাতার কাছে গ্রহণযোগ্য নয় তখন তারা তাদের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য তাদের মূল্যবোধগুলোকে আত্মস্থ করতে শুরু করে। এভাবেই তাদের মধ্যে অতি অহং বা বিবেক তৈরি হয়। ফ্রয়েডের তত্ত্বে দেখানো হয়েছে যে মানুষের আচরণ মনের উল্লিখিত তিনটি উপাদানের বা অংশের পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

চেতনার স্তরঃ ফ্রয়েড মানবমনের তিনটি স্তর আবিষ্কার করেছিলেন। যথা সচেতন স্তর (Conscious Mind), প্রাকচেতন স্তর (Pre-Conscious Mind) এবং অচেতন স্তর (Unconscious Mind)। মনের এই তিনটি স্তর প্রকৃতপক্ষে আমাদের অবহিতির মাত্রা নির্দেশ করে। অচেতন মনকে নির্জ্ঞান মন বলা হয়। যা কিছু কালো, অন্ধকার, লজ্জাজনক এবং গোপনীয় তা মনের এই স্তরে লুকিয়ে রাখা হয়। আমাদের অচেতন মনগুলো ঈদ্ বা আদিম সত্তার আধার। পক্ষান্তরে সচেতন মন ইগো বা অহংবোধকে ধারণ করে। আর বিবেক বা অধিসত্তা অবচেতন ও সচেতন মনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে অবচেতন মনের কামনা-বাসনাগুলো বা সহজাত প্রবৃত্তিগুলো যাতে প্রকাশিত হতে না পারে তার জন্য বিবেক প্রহরীর ভূমিকা পালন করে।

ফ্রয়েড মনে করেন চেতন ও অচেতন বা অবচেতন মন আলাদা নিয়মে কাজ করে। অবচেতন মন পরিচালিত হয় কতকগুলো নিয়মের দ্বারা যেগুলোকে ফ্রয়েড বলেছেন প্রাথমিক প্রক্রিয়া (Primary Process) যেমন চিন্ড়া করা, কল্পনা করা। আর চেতন মন পরিচালিত হয় গৌণ প্রক্রিয়া দ্বারা (Secondary Process) যেমন পরিকল্পনাকরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। প্রাথমিক প্রক্রিয়াসমূহের কার্যপ্রণালী বুঝবার জন্য স্বপ্নের প্রক্রিয়াগুলো লক্ষ্য করা যেতে পারে। স্বপ্নে যেসব প্রক্রিয়া ঘটে সেগুলোর একটি হল অনেকগুলো চিন্তা ঘনীভূত হয়ে একটি মাত্র সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া। যেমন একজন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখতে পারে যে সে তার প্রেমিকাকে নিয়ে সাঁতার কাটছে। এটা হতে পারে প্রেমিকার সাথে কাম-ক্রীড়ার একটি সাংকেতিক বহিঃপ্রকাশ। ঠিক তেমনিভাবে স্বপ্নের আরেকটি প্রক্রিয়া হল একটি আবেগ একটি উদ্দীপক বা সংকেত থেকে স্থানচ্যুত হয়ে অন্য একটি সংকেতের প্রতি সংযুক্ত হওয়া। স্বপ্নের অযৌক্তিক বিন্যাস সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক চিন্তাপ্রক্রিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য।

তিন

ফ্রয়েডের তত্ত্বে মানবমনের বিকাশ একটি জটিল প্রক্রিয়া যা কয়েকটি স্তরের মাধ্যমে ঘটে। এ স্তরগুলোর প্রথমটি হল মুখ কামস্তর (Oral Stage), দ্বিতীয়টি হল পায়ুস্তর (Anal Stage) এবং তৃতীয়টি হল লৈঙ্গিক স্তর (Phallic Stage) এবং সর্বশেষ হল যৌনস্তর (Genital Stage)। আদিম কামনা এসব স্তরে বিভিন্ন উপায়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং এগুলোর প্রকাশভঙ্গিও নির্ধারিত হয় সচেতন ও অবচেতন মনের কার্যাবলীর দ্বারা। এসব প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে দ্বন্দ্ব ও হতাশা এবং দ্বন্দ্বের অবসানকল্পে গৃহীত বিকল্প পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া। ফ্রয়েডের তত্ত্বে মানসিক প্রক্রিয়ার একটি প্রধান উৎস হল দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় আদিম সত্তা (Id) অহংসত্তা (Ego) এবং বিবেকের পরস্পরবিরোধী চাহিদার কারণে। ঈদের কামনাগুলো যেগুলোর বেশিরভাগই যৌনধর্মী বা অন্যান্য জৈবিক চাহিদা যখন পূর্ণতা পেতে চায় তখনই বিবেকের সাথে, অথবা অন্য কথায়, সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধের সাথে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই মূল্যবোধগুলোর অবস্থান হল আমাদের মনের অধিসত্তা বা বিবেকের মধ্যে। সুতরাং আদিম কামনার সঙ্গে অধিসত্তার দ্বন্দ্ব একটি প্রায় অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। কিন্তু দ্বন্দ্ব ও এর পরিণতি হল হতাশা যার অনুভূতি বেদনাদায়ক, তা থেকে আমাদের অহংবোধকে বা আত্মমর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সচেতন প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয় তখন অবচেতন মন কতকগুলো আত্মরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এগুলো হল অবদমন, স্থানচ্যুতি, রূপক বা বঞ্চনার আশ্রয় নেয়া, অপরকে দোষ দেওয়া, যুক্তাভ্যাস (Rationalization) ইত্যাদি। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে অবদমন প্রক্রিয়া হল মানবিক দ্বন্দ্ব ও হতাশাকে ভুলে যাবার একটি অবচেতন প্রয়াস। ফ্রয়েডতত্ত্বে উদ্বেগ (Anxiety), হিস্টিরিয়া, অমূলক ভয়, বিভ্রম ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মানসিক ব্যাধির

জন্য অবদমন প্রক্রিয়াই প্রধানত দায়ী। উল্লেখিত ধরনের ব্যাধিগুলোর কারণগুলো অবদমিত দ্বন্দ্বের ছদ্মবেশীর বহিঃপ্রকাশ।

চার

সুতরাং ফ্রয়েডের তত্ত্বে অবদমন বলতে বুঝায় কোনো অগৃহীতকর অভিজ্ঞতাকে মনের নির্জন স্তরে প্রেরণ করা যাতে উক্ত অভিজ্ঞতাটি মনের সচেতন স্তরে উপস্থিত হয়ে বেদনার কারণ না ঘটাতে পারে। এটা হল বেদনাদায়ক স্মৃতিকে ভুলে যাবার একটি প্রক্রিয়া। পরবর্তীকালের মনোবিজ্ঞানীরা এ ধারণাকে ফ্রয়েডের বিস্মৃতির কারণ ব্যাখ্যায় ব্যবহার করেছেন। নাওভিল সাপেক্ষণের অবলুপ্তিকে বুঝাতে গিয়ে Inhibition বা অবদমনের ধারণাটিকে ব্যবহার করেছেন এবং এটিকে একটি শাররবৃত্তীয় প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। একটি কুকুরকে যদি শেখানো যায় একটি ঘণ্টাধ্বনি বাজানোর এক মিনিট পরে খাবার দেওয়া হবে তাহলে ঘণ্টা বাজার ঠিক এক মিনিট পর তার মুখ থেকে লালা ক্ষরণ শুরু হবে। কিন্তু এভাবে বেশ কিছুদিন অভ্যাসের পর যদি ঘণ্টা বাজার এক মিনিট পর খাবার না দিয়ে পাঁচ মিনিট পরে খাবার দেওয়া হয় তাহলে প্রথমদিকে আগের মতই কুকুর ঘণ্টা বাজার ১ মিনিট পর লালা ক্ষরণ করবে কিন্তু কালক্রমে সে ঘণ্টা বাজার পর লালা ক্ষরণ করবেনা। অর্থাৎ কুকুরটি প্রথম কয়েক মিনিট লালা ক্ষরণ অবদমন করতে শিখবে। এটা হল ঘণ্টা শুনে লালা ক্ষরণ না-করতে শেখা। কুকুরটি হয়তো ঠিক পাঁচ মিনিট পর আবার লালা ক্ষরণ করতে শিখবে। এটি একটি শারীরিক প্রক্রিয়া এবং এটা কুকুর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মানবসমাজ ও সভ্যতার নির্মাণে সভ্যতার আচরণ করার পেছনে বহুসংখ্যক কামনা-বাসনাকে যথাসময়ে অবদমন করতে শিখতে হয়। যেমন কোনো অনুষ্ঠানে খাবার দেয়ার সাথে সাথে আমরা খেতে শুরু করি না। প্রধান অতিথি না-আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি। এভাবে আমরা বহু অযাচিত আচরণকে অবদমন করে অবদমন নামক পশুটিকে আমাদের ভিতরে লুকিয়ে রাখতে শিখি। তা না হলে আদিম গুহামানবের সাথে আমাদের তেমন পার্থক্য থাকত না। তবে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অবদমনের খেসারত দিতে হয়। অবদমিত কামনা-বাসনা অনেক সময় বিকৃতভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং মানসিক ব্যাধি সৃষ্টি করে। ফ্রয়েড নিউরোসিস নামক মানসিক ব্যাধির জন্য অবদমন প্রক্রিয়াকে দায়ী করেছেন। সেজন্য রোগীকে ভালো করার জন্য সচেতন মনের লুকায়িত দ্বন্দ্ব ও হতাশাগুলো আবিষ্কার করার উপর তিনি গুরুত্ব দিতেন। মনোসমীক্ষণবাদীদের নিকট এটি এখনো একটি নির্ভরযোগ্য কৌশল।

অবদমনের স্বরূপ

অ জ য় রা য়

মনের কোনো ইচ্ছাকে চেপে রেখে প্রকাশ করতে চাই না, বা এই ইচ্ছাটাকে বাস্তবায়ন করা থেকে সজ্ঞানে বিরত থাকার এই প্রক্রিয়াকেই আমি মনে করি 'অবদমন'। রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকায়' এ শব্দের উল্লেখ নেই, একটু আশ্চর্য হলাম বই কি! সংসদ বাংলা অভিধান (বাংলা ১৩৭৮ সন) খুলে দেখলাম সেখানে বলা হচ্ছে– "নিজের অজ্ঞাতসারে অন্তরের কোনো স্বাভাবিক বাসনার দমন" বিশেষণে 'অবদমিত' 'অবদমন' করা হইয়াছে এমন; সংস্কৃত: অব+দমন" এর ইংরেজী প্রতিশব্দ দেয়া হয়েছে যথাক্রমে: 'repression' এবং 'repressed'। সংসদের Bengali-English Dictionary-তে বলা হয়েছে 'অবদমন' repression, অবদমন করা to repress, অবদমিত repressed। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত (ডিসেম্বর ২০০০) ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে সংসদ-অভিধানে লিখিত বাক্যটি হুবহু তুলে দেয়া হয়েছে। তবে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত (১৯৭৫) প্রশাসনিক পরিভাষাকোষে 'repression' ও 'repressed'-এর বাংলা করা হয়েছে যথাক্রমে 'অবদমন' ও 'অবদমিত'। এ. টি. দেবের 'Students Favourite Dictionary (১৯৯৮)' তে এর বাংলা করা হয়েছে অবদমন, দমন আর repress- এর বাংলা করা হয়েছে দমন করা, নিবারণ করা, নিষ্পিষ্ট করা ইত্যাদি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শুধু মানসিকভাবে কোনো অভিলাষ বা বাসনাকে দমিয়ে রাখাই অবদমন নয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে ভৌতভাবে বা শারীরিকভাবে নিষ্পেষণ– 'নিপীড়ন, দমন ও নিবারণ'-কেও 'অবদমন' আখ্যা দেয়া যায়। আমরা বিজ্ঞানীরা আবার অবদমন বা দমন শব্দটিকে ইংরেজি 'damp' বা 'damping'– এর পরিভাষা হিসেবেও ব্যবহার করে থাকি। ইংরেজি এই শব্দটির অনেক অর্থের একটি হল 'নিরুৎসাহিত করা', স্তিমিত হওয়া, বা চাপিয়ে রাখার চেষ্টা। এই অর্থে 'স্তিমিত' ও 'অবদমন' প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। আর সমার্থক শব্দাবলীর সাথে তুলনা করে দেখা যায় অবদমন শব্দের সাথে জয় বা জেতা, বিপর্যস্ত, পর্যুদস্ত, বিদলন, পরাস্ত ইত্যাদি

সমার্থক ভাবা যেতে পারে। অবদমিত, দমিত, প্রদমিত এরা সবাই সমার্থক– বিজিত, পরাভূত, পরাহত, দলিত... ইত্যাদি।

দুই

উপরের সংজ্ঞার্থক আলোচনার ভিত্তিতে এটি স্পষ্ট যে অবদমনের নানা দিক রয়েছে, রয়েছে এর শ্রেণীভেদ। আমরা অবদমনের এই নানা চরিত্র ও দিক নিয়ে আলোচনা তুলব।

আমরা এর আগেই ইঙ্গিত দিয়েছি যে, বিজ্ঞানীরা, বিশেষ করে পদার্থবিদরা ইংরেজি 'damping' প্রতিভাসকে বোঝাতে বাংলায় অবদমন বা শুধু দমন কথাটি ব্যবহার করে থাকেন। আমরা বলেছি যে কোনো ঘটনাকে নিরুৎসাহিত বা স্তিমিতকরণকে বোঝাতে 'damping' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সেই অর্থে অবদমন বা প্রদমন শব্দটি যথাযথ অর্থবাহী। খুব সরল ভাষায় এই প্রতিভাসটিকে বোঝানোর চেষ্টা করা যাক। আমরা ঘড়ির দোলক বা পেন্ডুলামের দোলনের সাথে বা বাচ্চাদের দোলনার আসা-যাওয়া গতির সাথে পরিচিত। আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে, মা বা বাবা যদি শিশুর দোলনার পেছনে দাঁড়িয়ে সঠিক মুহূর্তে তালে তালে ধাক্কা না দেয় তাহলে দোলনাটির দোলনের বিস্তার ক্রমশ হ্রাস পেতে পেতে একসময় থেমে যাবে– উলম্ব দোলনরেখা বরাবর। ধরুন, শুরুতে দোলনরেখার উভয় দিকে (বাম ও ডাইনে) ৪ ফুট বিস্তারে অর্থাৎ মোট ৮ ফুট ব্যাপী দূরত্বে দোলনাটি দুলতে শুরু করল। দেখা যাবে সময়ের সাথে এই বিস্তার ৪ ফুট থেকে ৩ ফুট, ২ ফুট ... এভাবে কমতে কমতে শূন্য বিস্তারে এসে পৌঁছাবে অর্থাৎ দোলনাটি থেমে যাবে। দোলনের এই বিস্তারের ক্রমহ্রাসমান প্রক্রিয়াটিকেই বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় অবদমন বা 'damping'। এর কারণ নিয়ে এখানে বিস্তারণে যাওয়ার অবকাশ আমাদের নেই। শুধু এটুকু বলি দোলনাটি চাইছে তার ৪ফুট বিস্তার রক্ষা করতে কিন্তু একটি 'অবদমন বল' (damping force) এর ওপর বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে বিস্তারকে কমিয়ে দিচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। এই অবদমন বল কোথা থেকে আসল? এ প্রশ্নের জবাব এখানে বিশদভাবে দেয়া যাবে না। শুধু বলি– বাতাসের বাধা রয়েছে ও দোলনাটি যে দড়ি দিয়ে আনুভূমিক দণ্ডটির সাথে ঝোলানো হয়েছে সেই ঝুলনবিন্দুতে ঘর্ষণজনিত বাধারও সৃষ্টি হয়– এই দুয়ে মিলে, দোলনটির বিস্তারকে কমিয়ে দেয়। এ ধরনের ক্রমশ ক্ষীয়মাণ বিস্তারসম্পন্ন দোলনকে বলা হয়ে থাকে অবদমিত দোলন (damped oscillation)। এই দুটি বাধাকে নির্মূল করতে পারলে দোলনটি অনন্তকাল ধরে দুলতে থাকবে। বাবা বা মা পেছন থেকে সঠিক মুহূর্তে দোলনাটিকে ঠেলা দিয়ে এই অপশক্তিকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছেন। প্রশ্ন করতে পারেন যে ঘড়ির পেন্ডুলাম বা বাচ্চাদের দোলনা কেন আসা-যাওয়া (to and fro) করতে থাকে। সবটা বলব না, শুধু বলি যে ধরিত্রীর অভিকর্ষ শক্তিই এই দোলনের পেছনে ক্রিয়াশীল; বাকিটা, পাঠকের ঔৎসুক্য থাকলে মাধ্যমিক স্তরের পদার্থবিদ্যার যে কোনো বই দেখে নিন। আর একটি উদাহরণ দিই– ছোটবেলায় আমরা সবাই কেরাম খেলেছি, হয়তো সুযোগ পেলে এখনও খেলি। লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয় যে কেরামের একটি গুটিকে আঘাত করলে সেটি কিছুদূর গিয়ে থেমে যায়। অথচ নিউটনের বলবিদ্যার নিয়ম অনুসারে গতিশীল

গুটিটি অনন্তকাল ধরে অনন্ত পথে চলতে থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না, ওটি কিছুদূর গিয়ে থেমে যায়। এর পেছনেও রয়েছে গতির বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল একটি অবদমন বল। এর উৎস হল কেরাম বোর্ডের পৃষ্ঠটির ঘর্ষণবল। নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে কেরাম খেলার সময় আমরা পাউডার ব্যবহার করে থাকি, আর তা করে থাকি ঘুটি ও বোর্ডপৃষ্ঠের মধ্যে ঘর্ষণবাধাকে কমিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ পৃষ্ঠটিকে মসৃণ করে তুলি। দেখা যাচ্ছে যে ঘুটিটির যাওয়ার কথা ছিল অনন্ত দূরে কিন্তু অবদমন বল তাকে থামিয়ে দিল নির্দিষ্ট দূরত্বে গিয়ে। তাহলে অবদমন হল কোনো কিছুকে বাধা দিয়ে স্তিমিত করা। সুতরাং অবদমন ভৌতবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হতে পারে, ঘটতে পারে মনোজগতের কোনো বাসনা প্রকাশের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষেত্রে– ব্যক্তিজীবনে যেমন সমষ্টিজীবনেও তেমন।

তিন

মনোজগৎ সম্পর্কিত অনুশীলন ও চর্চা জ্ঞানের যে শাখাটি করে থাকে তাকে আমরা বলে থাকি মনোবিদ্যা (Psychology)। মনোবিদ্যার নানা শাখা-প্রশাখা রয়েছে, যেমন মানসিক বৈকল্য নিয়ে যে শাখাটি অনুশীলন করে তাকে বলা হয়ে থাকে 'চিকিৎসা মনোবিদ্যা' বা Clinical psychology। এরই আর-একটি শাখা, যা মূলত মানসিক রোগ নিরাময়ের শাস্ত্র হিসেবে গড়ে উঠেছে, মনোরোগবিদ্যা বা মানসিক রোগ চিকিৎসা শাস্ত্র (Psychiatry)।

মানুষের কোনো গূঢ় বাসনাকে প্রবলভাবে মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে তাকে চরিতার্থ না করার মানসিক প্রক্রিয়াকে আমরা বলেছি অবদমন। মানুষের এই অবদমন প্রক্রিয়া শিশুকাল থেকে শতবর্ষের বৃদ্ধের মনে ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। শিশুকালে শিশুমন বর্হিজগতের সাথে পরিচিত হওয়ার সাথে সে যাই দেখে বা শোনে তাই তার ভালো লাগে, তখন সে আকাশের চাঁদ থেকে লাল-টুকটুকে পুতুল সবই বাবা-মার কাছ থেকে পাবার জন্য বায়না ধরে। বাবা-মা সাধ্যের মধ্যে থাকলে শিশুর চাহিদা মেটায়। আর না পারলেই মা-বাবার পক্ষ থেকে শুরু হয় শিশুর চাহিদার বিরুদ্ধে অবদমন, তার বায়নাকে স্তিমিতকরণের চেষ্টা। কখনও আদর করে ভুলিয়ে ভালিয়ে, আবার কখনও ভয় দেখিয়ে। শিশু-মনে এর প্রভাব নানা ভাবে পড়তে পারে, নানা বৈচিত্র্যেও এর প্রকাশ হতে পারে। মনোবিজ্ঞানীরা এটি আরও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে থাকেন। না-পাওয়ার অতৃপ্তিতে শিশু হয়তো দীর্ঘক্ষণ ধরে কান্নাকাটি করতে পারে। এটা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া; অবচেতন মনে সুদূরপ্রসারী কী ছাপ রাখতে পারে তা ভবিষ্যতেই হয়তো ভালোভাবে প্রকাশ পাবে। তবে একথা নিশ্চিত যে বার বার অবদমনের প্রক্রিয়া শিশুর সুস্থ মানসিক গড়নের ওপর প্রভাব ফেললে আশ্চর্য হবার কিছু হয়তো না-ও থাকতে পারে।

কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিক্ষণে তাদের চাহিদা নানা বৈচিত্র্যময় হতে পারে যা মা-বাবার পক্ষে বা পরিবারের পক্ষে মেটানো সম্ভব নয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। অনেকের সাথে তুলনা করে, পরিবারের বাইরের পারিপার্শ্বিকতা থেকে, আত্মীয়স্বজন,

স্কুলকলেজের সহপাঠীদের সাথে তুলনা করে, কিশোর মনে নানা চাহিদার উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এই সময়কালটাতে ওদের যেমন বুদ্ধির পরিপক্কতা আসে, কিন্তু জন্ম নেয় স্পর্শকাতরতা, রোমান্টিকতা, অজানাকে জানার অদম্য কৌতূহল এবং তৈরি হয় একটি জিজ্ঞাসু মন। ওদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দেখা যায় যৌনচেতনা ও বিপরীত লিঙ্গের প্রতি প্রবল যৌন-আকর্ষণ। পিতা-মাতা, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, সর্বোপরি পারিপার্শ্বিক সমাজ যদি পরিস্থিতি সামাল না দিতে পারে তবে কিশোর-কিশোরীদের পরবর্তী জীবন বিষময় হতে পারে। সামাজিক ও পারিবারিক প্রবল অবদমনের ফলে তাদের মধ্যে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়ার দেখা দিতে পারে যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করতে পারে। কাজেই অবদমন প্রক্রিয়া প্রয়োগ হতে হবে মনোবৈজ্ঞানিক, সহানুভূতিময় ও স্নেহ-ভালোবাসায় অভিষিক্ত, শুধু কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা, আর শাসন নয়। অবদমন প্রক্রিয়ার অপপ্রয়োগের কারণে ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের মধ্যে নেমে আসে নানা ধরনের মনোবৈকল্য, চিত্তবৈকল্য ও মানসিক জড়তা, এমনকি সৃষ্টি হতে পারে জটিল মানসিক ব্যাধি। এসব মানসিক বিপর্যয়ের (Psychological hazards) মধ্যে রয়েছে কথা বলার অসুবিধা (Speech disorder), আবেগজনিত বিপর্যয় (Emotional hazards), সামাজিক বিপর্যয় (Social hazards), ধারণাগত বিশৃঙ্খলা (Conceptual disorder), নৈতিক বিপর্যয় (Moral hazards), লৈঙ্গিক বা যৌন-সম্পর্কিত সমস্যা (Sex related problems), কোনো বিষয়ে এমনকি জীবন সম্পর্কে আগ্রহহীনতা (Disinterest about world affairs including ones own life), স্বচ্ছ চিন্ড়া করায় অপারগতা (Disorder in thought process)...। এর মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল আবেগজনিত, ধারণাগত, নৈতিক ও যৌন-সম্পর্কিত উপাদানগুলো। এই ধরনের বিপর্যয়ের পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ যদি না নিবারণমূলক সতর্কতা গ্রহণ করা হয়। কাম্য বিষয়গুলোর চাহিদা মেটানো না হলে বা স্বীকৃতি না পেলে অর্থাৎ প্রবল ইচ্ছেগুলো অবদমিত হলে সে নিজের ওপর অসন্তুষ্ট হতে পারে, হীনমন্যতায় ভুগতে পারে এবং তার মনে পরিচিতজন, বন্ধুবান্ধবদের ওপর হিংসার উদ্রেক হতে পারে। এবং ক্রমেই সে নিজেকে সকলের কাছ থেকে গুটিয়ে নেয় ও নিঃসঙ্গ জীবনকে বেছে নেয়। চরমতম ক্ষেত্রে সে নিজেকে নিয়ে মনের মধ্যে একটি নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করে নেয়, যার স্বার্থে বহির্জগৎ ও পরিবেশের সাথে আর সম্পর্ক থাকে না। ঐ জগৎ থেকে সে বেরিয়েও আসতে চায় না। এ ধরনের মনোবৈকল্যের চরমতম রূপকেই বোধ হয় মনোবিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন 'সিজোফ্রেনিয়া' (Schizophrenia) বা বাংলায় আমরা বলতে পারি অসংলগ্ন মানসিকতা। এ রোগের অবশ্য নানা শ্রেণীভেদ রয়েছে – তবে এর মূল লক্ষণ হল রোগীর আমিত্ববোধ (Ego function) সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়। মৃগীরোগও একটি অতি পরিচিত মানসিক ব্যাধি। এছাড়াও মনোরোগ বিশারদরা নানা ধরনের মনোরোগ চিহ্নিত করেছেন এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে এ রোগসমূহের উন্নত চিকিৎসাপদ্ধতি উদ্ভাবিত হচ্ছে যার সাহায্যে মানসিক রোগীরা বৃহত্তর হারে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে।

সব মানসিক রোগ বা মনো বা চিত্তবৈকল্য যে অবদমন থেকেই জাত হয় এমনটি নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই থাকে, পারিবারিক, সামাজিক বিপর্যয় এর পেছনে। আমি মনোবৈজ্ঞানিক নই, নই মানসিক চিকিৎসাবিশারদ। উপরের কথাগুলো মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কতটা গ্রহণীয় হবে আমি বলতে পারি না। সাধারণ জ্ঞান থেকেই এসব কথা বলা। তবে একথা বোধ হয় নির্দ্বিধায়ে বলা যায় যে অনেক মানসিক ও সামাজিক ব্যাধির মূলে রয়েছে অতিমাত্রিক অবদমন প্রক্রিয়ার অবৈজ্ঞানিক ও অসংবেদনশীল প্রয়োগ। জোর করে স্বাভাবিকতার বিপরীতে কোনো কিছুর অবদমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে বাধ্য তবে তা সব সময় অশুভ হবে তাও নয়।

চার

আমরা প্রায় প্রত্যেকে সংসার ও সমাজে, জীবনে, রোগ-ব্যাধিতে, কর্মক্ষেত্রে, লেখাপড়ার জগতে, রাষ্ট্রীয় জীবনে কোনো-না-কোনো ভাবে মানসিক চাপে ভুগি। কখনও তা অসহনীয় পর্যায়ে উপনীত হয়। পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে নানা প্রক্রিয়ায় এই চাপ প্রশমিত বা অবদমিত করার প্রয়াস পাই। প্রচলিত পদ্ধতি ব্যর্থ হলে আমরা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করি, যেমন আমার কোনো প্রিয়ভাজন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগলে তার নিরাময়ের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে আমরা তুকতাক করি, মাদুলি ধারণ করি, পীরের বা ওঝার পানিপড়া খাই। প্রমোশন বা অন্য জাতের কর্মক্ষেত্রের মানসিক চাপ কমাতে কেউ কেউ মদ্যপান বা অন্য কোনো ধরনের ড্রাগ নিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এ ধরনের দমনপ্রক্রিয়া যে আখেরে ভালো হয় না এর উদাহরণ যথেষ্ঠ রয়েছে। এভাবে পরিস্থিতির শিকার হলে আমাদের অবশ্যই সুষ্ঠু ও কার্যকর অবদমন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। আর সেটি আমরা গ্রহণ করব পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানীদের পরামর্শ ও নির্দেশক্রমে। হঠকারিতার আশ্রয় কেবল নতুন বিপদই ডেকে আনতে পারে। মানসিক চাপ সইতে না পেরে অনেকে আত্মহত্যার পথও বেছে নেন। এ প্রসঙ্গে আমার এক প্রিয় ব্যক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এককালের বিভাগীয় প্রধান এবং বাংলাভাষার ধ্বনিতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আবদুল হাই তাঁর বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগের মানসিক চাপ সইতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন নিজের সম্মান বাঁচাতে; অথচ কোনো কিছুই প্রমাণিত হওয়া তো দূরের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো অভিযোগও উত্থাপিত হয়নি। মানসিক চাপের প্রভাবে পড়লে অনেকেই শরণাপন্ন হয় পেশাদার ব্যক্তির যেমন মনোরোগ-চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী, ধর্মযাজক, পীর, মৌলানা। তাদের সাহায্য কামনা করেন। এদের পরামর্শ বা চিকিৎসা ফলপ্রসূ না হলে কেউ জীবনকে প্রায় ধ্বংসের প্রান্তে এনে ফেলেন। বস্তুত পাপ প্রশমনের পথ নিজেকেই বেছে নিতে হয়। চাপ থেকেই মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় পীড়ন। চাপের ফলে মানসিক বৈকল্য থেকে নানা শারীরিক রোগেরও সৃষ্টি হয়– যেমন তীব্র মাথাব্যথা বা মাইগ্রেন, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি। এগুলো আসলে মনের ওপর তীব্র চাপের লক্ষণ বা বহিঃপ্রকাশ। মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে এগুলো বিপদ সংকেত পাঠাচ্ছে যে 'তোমার মন সুস্থ

নয়'। দেখা গেছে মনের ওপর চাপ স্তিমিত হলে এসব রোগবালাই দূর হয়ে যায়। অনেকে এই সংকেতকে পাত্তা না দিয়ে মন থেকে চাপ কমানোর জন্য ঘুমের ওষুধ, মদ্যপান, মাদকদ্রব্য সেবন, নিজেকে আমোদ-প্রমোদে ভাসিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য এসব পদ্ধতি কোনো স্থায়ী সমাধান তো দিতেই পারে না, বরং জীবন ক্রমেই জটিলতর হয়ে ওঠে। চাপ কমানোর জন্য অনেক উত্তম পন্থা রয়েছে যা বেছে নিতে হবে চাপের তীব্রতা, রকম ও উৎসের প্রকারভেদের ওপর নির্ভর করে মনোবিজ্ঞানীদের পরামর্শে। চাপ কী? মনোবিজ্ঞানীরা এর একটি সরল সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন, 'চাপ হল শরীরের প্রতি যে কোনো হুকুম চাপিয়ে দেয়ার ফলে এর একটি অনির্দিষ্ট সাড়া প্রদান...।' এটি কোনো স্নায়বিক উত্তেজনা নয়, কিন্তু ডেকে আনতে পারে জীবনের ক্ষয় এবং ধ্বংস। যে উৎস থেকে চাপের সৃষ্টি হয় যা মনে পীড়ন রূপে দেখা দেয়, সেই উৎসকে মনোচিকিৎসকরা নাম দিয়েছেন 'পীড়নক'(Stresser or stress force)। এই উৎসটি শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে রোগভোগের কারণে যেমন মনে চিত্তবৈকল্য দেখা দিতে পারে, তেমনি সামাজিক কারণেও, যেমন দ্রব্যমূল্যের আকাশছোঁয়া সীমার কারণে দরিদ্র চাকুরীজীবী সংসারযন্ত্রণায় তীব্র চাপের মুখে পড়ে। এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যেতে পারে জীবনের নানা ক্ষেত্র থেকে।

পাঁচ

আমরা সামাজিক বলতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকেও অবশ্য অন্তর্ভুক্ত করব। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবদমন যে কত নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন ও অমানবিক হতে পারে ইতিহাসে এর ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে। ইহুদি দমনের নামে হিটলারের নাজী জার্মানির নারকীয় কর্মকাণ্ড, এবং পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার নামে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের কালো রাত্রে 'অপারেশন সার্চলাইট'- এর মাধ্যমে বাঙালি জাতির ওপর যে গণহত্যা চালিয়েছিল ৯ মাস ধরে–এর উদাহরণ ইতিহাসে খুব একটা মিলবে না, কাম্পুচিয়া আর বসনিয়ার নির্মম গণহত্যার কথা মনে রেখেও।

গত বিএনপি-জামাত সরকারের আমলে রাষ্ট্রযন্ত্র কী ভাবে আইন ও শৃঙ্খলা বাহিনীকে ব্যবহার করে বিরুদ্ধপক্ষীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীসহ সাধারণ মানুষের (নিজেদের আখের গুছানোর তাগিদে ও রাষ্ট্রক্ষমতাকে চিরকাল কুক্ষিগত রাখার উদ্দেশ্যে) ওপর যে অবদমনের স্টিমরোলার চালিয়েছিল তা উদাহরণ হিসেবে বেঁচে থাকবে রাষ্ট্রকে কত নিষ্ঠুর অবদমন প্রক্রিয়ার যন্ত্র হিসেবে ক্ষমতাসীনরা ব্যবহার করতে সক্ষম। রাষ্ট্র তখন হয়ে দাঁড়ায় জনগণের বিরুদ্ধচারী অবদমনের প্রতীক। দেশের স্বার্থ রক্ষার নামে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় ক্ষমতাসীনরা জনগণের বিরুদ্ধে পুলিশকে ব্যবহার করেছে, আন্দোলন দমানোর নামে মহিলা রাজনৈতিক কর্মীদের, সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষকে নিপীড়ন করেছে যথেচ্ছভাবে। কয়েক বছর আগে চট্টগ্রাম স্টেডিয়ামে বিদেশী ক্রিকেটারদের সামনে বৃদ্ধ ফটো-সাংবাদিককে নির্মমভাবে প্রহার করতে পুলিশের

বিবেকে বাধেনি। আমরা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে সব ধরনের শালীনতাকে বিসর্জন দিয়েছি।

১৯৫২ সালে ভাষার দাবীকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রাষ্ট্রভাষা শহীদবৃন্দ ও ভাষাসৈনিকেরা পাকিস্তানী রাষ্ট্রযন্ত্রের যে ধরনের অবদমনের মুখোমুখি হয়েছিল তাকে আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক অবদমনের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। পাকিস্তানীরা চেয়েছিল আমাদের ভাষা-সংস্কৃতি-সাহিত্যের ওপর 'এক ও অখণ্ড পাকিস্তানের' নামে উর্দু এবং ইসলামী তমদ্দুনের নামে পাঞ্জাবি সংস্কৃতি আরোপ করতে।

সামাজিক অবদমনও আমাদের দেশে নিষ্ঠুর প্রকৃতির হতে পারে– এর উদাহরণ সংবাদপত্রের পাতাগুলো উল্টালেই দেখা যাবে। ফতোয়াবাজীর নামে এক শ্রেণীর বিকৃত রুচির মোল্লাদের নির্দেশিত সামাজিক ও ধর্মীয় অবদমন, বিশেষ করে নারীদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, মধ্যযুগীয় চিন্তার প্রকাশকেই তুলে ধরে। অপরাধী ঘোষণা করে নারীকে দোররা মারা, মাথা মুণ্ডন করে প্রকাশ্যে শোভাযাত্রা করানো, তথাকথিত অপরাধীর মা-বাবা-পরিবারকে একঘরে ও সামাজিকভাবে বয়কট করা– অবদমনের ব্যাপ্তি, মাত্রা ও নিষ্ঠুরতার উজ্জ্বল উদাহরণ। ভাবতে অবাক লাগে একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও টেকনোলজিতে আলোকিত বিশ্বেও এ ধরনের নিপীড়ন সংঘটিত হতে পারে? এবং তা ঘটে আমাদের সমাজে– ধর্মের নামে, নৈতিকতার নামে। অসহায় নারীকে যখন তখন খেয়ালখুশি মতো তালাক দেয়া এবং পরবর্তীকালে হিল্লা সরা বিবাহপদ্ধতির কথা নাই-বা তুললাম। নারীর যে কোনো ব্যক্তিসত্তা নেই, হৃদয় নেই, ভালোবাসা নেই; পুরুষশাসিত সমাজের সে একটি সামগ্রী মাত্র। মনোরোগ বা পাগলামী সারানোর নামে পীরসাহেবদের নিষ্ঠুর অবদমন প্রক্রিয়াও সকলের জানা আছে।

ছয়

যদিও বলা হয় ইসলাম শান্তির ধর্ম ও সনাতন হিন্দুধর্ম সহিষ্ণুতার প্রতীক, তবুও নিজের অধিপত্য বজায় রাখতে, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ করতে গিয়ে এমন কি স্বীয় স্বার্থ কায়েম করতে মৌলবাদীরা সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, বাড়ীঘর ধ্বংসসাধন, হত্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাসহ বিচিত্র ধরনের অবদমন প্রক্রিয়া চালু করতে পিছপা হয় না। আমি এখানে দুটি উদাহরণ দেব। ২০০১ সালে বাংলাদেশে অক্টোবর নির্বাচন-উত্তর কালে এদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগণের ওপর নেমে আসা সাম্প্রদায়িক অবদমন– যার মধ্যে ছিল, হত্যা, লুণ্ঠন, বাসাবাড়ি বহ্নিস্যাৎ, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি। সারা দক্ষিণবঙ্গে হিন্দু-অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে নেমে আসে মনুষ্যসৃষ্ট সাম্প্রদায়িক অবদমন। এদের অপরাধ এরা হিন্দু এবং একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের কথিত সমর্থক। আমরা কি কোনোদিন মৌলবাদীদের শিকার পূর্ণিমার, রীতার, শেফালীর, রাধারানীর..... ওপর নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতনের কথা ভুলতে পারব? প্রায় একই সময় ভারতে গুজরাট রাজ্যের রাজধানী আহমদাবাদে ও অন্যত্র মুসলমানদের ওপর নেমে আসে সাম্প্রদায়িক অবদমন সব ধরনের নিষ্ঠুরতাকে সঙ্গে নিয়ে। কতশত

মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, কত রমণী ধর্ষিতা হয়েছে এর প্রকৃত সংখ্যা হয়তো কোনোদিনই জানা যাবে না। কেবল স্মৃতি হয়ে থাকবে– বেঁচে থাকা হতভাগ্যদের অন্তরে।

সাত

অবদমন যে সবসময় কেবল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা কিন্তু নয়। রাষ্ট্র যখন বাক-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, কলমের বিরুদ্ধে, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অবদমনরূপ শোষণ ও নিপীড়নের অস্ত্র রূপে আবির্ভূত হয়, তখন ঐ স্বৈর রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে জনগণ বিদ্রোহ করে। পাকিস্তানী সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে বাঙালির অস্ত্রধারণ ইতিহাসের সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। অবদমনকালে বা তৎপরবর্তীকালে জন্ম নেয় সৃষ্টিসুখের উল্লাস। দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে বিশ্বসাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে কালজয়ী চমৎকার সাহিত্যকর্ম। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন পরবর্তীকালে তখনকার পূর্ববাংলায় সৃষ্টি হয়েছিল নতুন ধারার সাহিত্য। ষাটের ও সত্তরের দশকে আইউবশাহী ও পাকিস্তানী সামরিক জান্তার অবদমনের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় আমাদের সাহিত্য ও কবিতার জগতে নেমে আসে নয়া সৃষ্টিশীলতা। রাজনৈতিক প্রতিরোধের পাশাপাশি সংস্কৃতির জগৎ নতুন চেতনায় দীপ্ত হয় যার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে আমাদের সুকুমার চিত্রশিল্পে, কবিতা আবৃত্তিতে ও গ্রুপ থিয়েটারভিত্তিক নাট্যআন্দোলনে। বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় ঘটে এক চমৎকার পালাবদল। শামসুর রাহমানের কলম থেকে বেরিয়ে-আসা স্বৈরাচার-বিরোধী 'আসাদের শার্ট, মওলানা ভাসানী, স্বাধীনতা.. .. ' নামের অপূর্ব কবিতাগুচ্ছ।

অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর সাথে রবীন্দ্রনাথের ছিল গভীর ও নিবিড় স্নেহসিক্ত ভলোবাসার সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথের যে কোনো কবিতার প্রথম শ্রোতা পাঠক হতেন কাদম্বরী দেবী। কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যুতে কবি মনের দুঃখ ও শোকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর এই তৎকালীন চিত্তবৈকল্যকে প্রশমিত করতে রচনা করলেন অপূর্ব এক কালজয়ী কবিতা 'ছবি' যার মধ্যদিয়ে বৌদির প্রতি কবির অন্তর্নিহিত গভীর অবদমিত ভালোবাসার প্রকাশ পেল অনুপম ছন্দে। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন সেই শতবর্ষ আগে কাদম্বরী দেবীকে স্মরণ করে:

তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা?
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়,
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও?
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি?
.. .. ..

তার পর কবিতার শেষদিকে কাদম্বরী দেবীকে স্মরণ করে লিখেছেন:

নাহি জানি, কেহ নাহি জানে–
তব সুর বাজে মোর গানে,
কবির অন্তরে তুমি কবি–
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি॥

অপূর্ব এক শাশ্বত কালজয়ী কবিতা বেরিয়ে এল কবির কলম থেকে আপন অজানায়। তাই বলছিলাম অবদমন থেকে বেরিয়ে আসতে হলে পথ খুঁজতে হবে সৃষ্টিশীলতার মাঝে। অবদমনের কাছে আত্মসমর্পণ করলে চলবে না।
কবি আবার অন্যত্র অবদমন ও অবরুদ্ধের বিরুদ্ধে বলেছেন আপনার মতো করে–

অবরুদ্ধ ছিল বায়ু, দৈত্যসম পুঞ্জমেঘভার
ছায়ার প্রহরীব্যূহে ঘিরে ছিল সূর্যের দুয়ার;
অভিভূত আলোকের মূর্ছাতুর ম্লান অসম্মানে
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল। .. .. .. শূন্যে হেনকালে
জয়শঙ্খ উঠিল বাজিয়া। চন্দনতিলক ভালে,
শরৎ উঠিল হেসে চমকিত গগনপ্রাঙ্গণে;
পল্লবে পল্লবে কাঁপি বনলক্ষ্মী কিঙ্কিনীকঙ্কণে
বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা
(অবরুদ্ধ ছিল বায়ু)
তাই বলছিলাম অবদমন থেকে বেরিয়ে আসতে হলে পথ খুঁজতে হবে সৃষ্টিশীলতার মাঝে। অবদমনের কাছে আত্মসমর্পণ চলবে না।

টীকা

1.Chamber's *Twentieth Century Dictionary-তে* To Repress-*এর অর্থ করা হয়েছে* To Restrain', To keep Under's ; To put down *ইত্যাদি।*

দমন ও অবদমন

হা সা ন আ জি জু ল হ ক

[হাসান আজিজুল হকের জন্ম ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯। যবগ্রাম, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গে। অবসর নিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ থেকে। গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ৪০টি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আত্মজা ও একটি করবী গাছ (গল্প ১৯৬৭), জীবন ঘষে আগুন (গল্প ১৯৭৩), নামহীন গোত্রহীন (গল্প ১৯৭৫), বৃত্তায়ন (উপন্যাস ১৯৯১), কথা সাহিত্যের কথকতা (প্রবন্ধ ১৯৮১), অপ্রকাশের ভার (প্রবন্ধ ১৯৮৮)। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান দর্শন– শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের মুক্তি ঘটানো।]

হালখাতা

আজ ২৮ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখ। দেশের অন্যতম কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের মুখোমুখি হয়েছি, বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা'র পক্ষ থেকে 'অবদমন' বিষয়ে কিছু কথা জানবার জন্য। অবদমন শব্দটির কাছাকাছি আরেকটি শব্দ দমন; শব্দ দুটির সঙ্গে আমরা কম-বেশি পরিচিত । আপনার কাছে জানতে চাই, দমন (Supression) ও অবদমন (Repression) বিষয় দু-টির মধ্যে সম্পর্ক ও পার্থক্য আসলে কী?

হাসান আজিজুল হক

দমন বা Repression এবং অবদমন বা Supression এই বিষয় দু-টির শব্দগত অর্থ ধরতে গেলে আসল বিষয়-কে কি বোঝা যাবে? তা কিন্তু যাবে না। আমরা জানি যে, 'দমন' ও 'অবদমন' এ দুটি প্রায় কাছাকাছি শব্দ। 'অ' দিয়ে হয়তো আরেকটু বেশি বোঝানো হয়। 'অ' দিয়ে যেমন বুঝি 'অবমূল্যায়ন'– 'মূল্যায়ন'-এর খারাপ মূল্যায়নই হলো 'অবমূল্যায়ন'। 'দমন' একটি অত্যন্ত খারাপ বিষয়, তার থেকেই আমরা করেছি 'অবদমন'। আমাদের ভেতরে অনেক বিষয় আছে যেগুলোকে এমনভাবে অবদমিত করে রেখেছি যাতে সেগুলো মাথাচাড়া দিতে না পারে। অনেক আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে দেখা দেয়, যেগুলোকে আমরা অবদমিত অবস্থায় রাখি। কিন্তু সেটা ব্যাখ্যা করলে তোমাদের যে অভীষ্ট আলোচনা– 'হালখাতা' পত্রিকার যে লক্ষ্য তা কিন্তু পূরণ হবে না। আলোচনাকে শুধুমাত্র শব্দগত পার্থক্যের মধ্যে রেখে দিলেই চলবে না। ইংরেজি

Supression, Opression, Repression এসব শব্দের অজস্র রকম অর্থ করা যায়। Repression-এর একরকম মানে হতে পারে যেমন আমরা আমাদের মনের মধ্যে যে ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে জোর করে চেপে রাখি সেই চেপে-রাখা। আবার Repression-এর এক রকম অর্থ হতে পারে, মানুষের মধ্যে নয় অর্থাৎ যা কিছু চোখে দেখা যায় সে রকম জায়গা থেকে প্রভাব খাটিয়ে, প্রেসার ক্রিয়েট করে কখনো সরাসরিও হতে পারে– এভাবে যে দমন করা হয় সেটা। কিন্তু এভাবে শব্দ নিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করতে থাকলে আলোচনা কিন্তু নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হবে না।

হালখাতা

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে 'ফ্রয়েডীয় অবদমন তত্ত্ব' নিয়ে কিছু বলুন। আজকের পৃথিবীর মানুষের যে জীবনধারা তার সঙ্গে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বলার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।

হাসান আজিজুল হক

আমি আজকাল হিসাব করি, ফ্রয়েড তো মারা গেছেন, কিন্তু কতবার মারা গেছেন– ফ্রয়েড তো মারা গেছেনই, তার যে ভূত হয়েছিল সেই ভূতও মারা গেছে। এখন দেখি সেই ভূতের আবার ভূত হয়েছে। আজকের পৃথিবীতে ফ্রয়েড আর চলে না। আজকের সভ্যতা নতুন নতুন চিন্তা, নতুন আবিষ্কার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। ফ্রয়েড আজ বাতিল অকেজো বলেই আমার মনে হয়। পোস্ট-মর্ডানিজম-এর কথাই যদি বলি কিংবা পোস্ট কলোনিয়ালিজম বা ম্যাজিক রিয়ালিজম-এর কথা যদি বলি সাহিত্যের ক্ষেত্রে– এরকম নতুন নতুন চিন্তা ও শাস্ত্র এসেছে। তবে তোমাকে একটা কথা বলি, সেটা হল পৃথিবীতে ২(দুই) জন মানুষ আমাদের চিন্তা-জগতে বড় রকমের প্রভাব ফেলেছিলেন। তার মধ্যে ফ্রয়েড-এর প্রভাব মানুষ অনেক আগেই কাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু অন্য জন –কার্ল মার্কসের দর্শন আজও মানুষের চিন্তাজগতে প্রভাব ফেলতে সক্ষম। কার্ল মার্কস কী করেছিলেন– তিনি তার চিন্তায় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে, মানুষের ব্যবহারিক জীবনকে সঙ্গে মিলিয়ে বাস্তব একটা জায়গাকে প্রবলভাবে স্থান দিয়েছেন। সে কারণে আমি মনে করি মার্কসের উপযোগিতা এখনো ফুরিয়ে যায়নি, এমনকি কোনো-দিনও যাবে না। পক্ষান্তরে ফ্রয়েড-এর দর্শন কখনোই আমার কাছে গ্রহণীয় মনে হয়নি। যদিও আমি সাইক্লোজির ছাত্র ছিলাম না, আমি দর্শনের ছাত্র ছিলাম।

হালখাতা

কিন্তু সাইক্লোজি তো দর্শনের-ই একটি অংশ।

হাসান আজিজুল হক

হ্যাঁ, তখন অবশ্য আলাদা করে সাইক্লোজি সাবজেক্ট ছিল না। দর্শনের অংশ হিসাবে সাইক্লোজি পড়ানো হতো। সে কারণে ফ্রয়েড আমাদের পড়তে হতো; তখন থেকেই

ফ্রয়েড-এর চিন্তার প্রতি আমি কোনো ধরনের আকর্ষণ বোধ করিনি। কিন্তু আউটার যে ওয়ার্ল্ড সেই বাইরের পৃথিবীটা যেখানে মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে লড়াই করতে হয়– সেই পৃথিবীর সুস্থতার জন্য সেই পৃথিবী উপযুক্তরূপে নির্মাণের জন্য যাকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তিনি হলেন মার্কস– এটা কিন্তু আমার তখন থেকেই মনে হল।

হালখাতা

আমি আপনার কথার রেশ ধরে বলছি, সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর পতন এবং পরে চীনে আজকের এই অবস্থার পরও কিন্তু সারা পৃথিবীর মানুষের চিন্তা চর্চার জায়গা দখল করে আছে এই ধারাটিই। আপনার কী মনে হয়?

হাসান আজিজুল হক

হ্যাঁ, আমি সে কথাই বলতে চাচ্ছি। আমি তোমার কথার সঙ্গে সম্পর্ণূভাবে একমত। কথা হল, মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্র কীভাবে চালিত হতে পারে তার তো শত-সহস্র প্রক্রিয়া বা উপায় নেই। উপায় যা আছে সেটা দুই বা তিন রকমের বেশি নয়। আদিকালে সাম্য ছিল কি-না সেই বিতর্কে না গিয়ে কিংবা কী ধরনের সাম্য ছিল সেই আলাপে না গিয়ে যদি তার পরের সময় থেকে হিসাব করি তাহলে কী পাই? একসময় তো দাসপ্রথা ছিল, সেই দাসপ্রথারই একটু উন্নত সংস্করণ– আসলো সামন্তবাদ বা 'জমিদার প্রথা' যার মধ্যদিয়ে দাসপদ্ধতি পরিবর্তিত হল কিন্তু 'মালিক ও দাস' বিষয়টি থেকেই গেল। এরপর যখন সামন্তবাদকে বিদায় দিয়ে পুঁজিবাদ আসলো তখনও তার যে মর্মার্থ দাঁড়াল, সেটা ঐ দাসপ্রথারই আরও চতুর সংস্করণ আমাদের সামনে হাজির হল। কাজেই সত্যি বলতে কি আমরা এখনো সেই দাস আমলেই বসবাস করছি।

হালখাতা

কিন্তু এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে অবদমন বিষয়টি কীভাবে যুক্ত? এর থেকে মুক্ত হওয়ার পথই বা কী বলে আপনি মনে করেন?

হাসান আজিজুল হক

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব আমি আগে দেই। যদি সোজাসাপটাভাবে বলি, তাহলে যেটা দাঁড়ায় সেটা শুনতে খুবই খারাপ এবং হতাশাজনক শোনাবে। তা হল দাসপ্রথা থেকে সামন্তপ্রথা এবং সামন্তপ্রথা থেকে পুঁজির যে সর্বগ্রাসী আগ্রাসন– এখান থেকে অর্থাৎ এই প্রক্রিয়া থেকে কোনো মুক্তির পথ আমি দেখি না। এটা যেন চিরন্তন একটা রূপ নিয়েছে। তবে একটা সরল হিসাবে আছে যে, পুঁজিতন্ত্রের পরে পৃথিবীতে সাম্যবাদ আসবে– কিন্তু এই হিসাবকে অতি সরল হিসাবই মনে হয়। আর প্রথম প্রশ্নের জবাব তুমি যেভাবে নেবে সেভাবেই পেতে পার। এটা তোমার চিন্তার কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। আমি তো বলেছি-ই ফ্রয়েডীয় দর্শন কখনো আমাকে টানেনি। আমি

মনে করি মানুষের অবদমনের পেছনে এক বা একাধিক দমনপ্রক্রিয়া জড়িত। দমনের সঙ্গে অবদমনেরও গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

হালখাতা

ফ্রয়েড সম্পর্কে জানতে চাওয়াতে আপনি জানালেন যে ফ্রয়েড আপনাকে কখনও টানেনি, পাশাপাশি আপনি কার্ল মার্কস–এর কথা বললেন। কথা হল ফ্রয়েড মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছেন, আর কার্ল মার্কস করেছেন রাজনীতি অর্থনীতি নিয়ে। ফ্রয়েড প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কার্ল মার্কসকে টানলেন কেন?

হাসান আজিজুল হক

টানলাম এ জন্যে, এরা দু'জন আলাদা ধরনের চিন্তাবিদ হলেও ওদের উদ্দেশ্য তো এক। তা হল মানবমুক্তি। মানুষের মুক্তি যদি আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হয় তাহলে ফ্রয়েড প্রসঙ্গে কার্ল মার্কসকে কেন টানলাম তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ। এক্ষেত্রে আমার মূলকথা হল ফ্রয়েড তার যে দর্শন দিয়ে মানুষের মুক্তির কথা ভেবেছেন আমার কাছে সেটা কখনও গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। পক্ষান্তরে, কার্ল মার্কসের দর্শনকে অনেকে বাতিল মনে করলেও আমি তা মনে করি না। আমি মনে করি মার্কসীয় দর্শনের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমেই পৃথিবীর মানুষের মুক্তি আনা সম্ভব।

হালখাতা

কিন্তু অবদমন প্রসঙ্গে কার্ল মার্কসকে আপনি কিভাবে বিচার করবেন?

হাসান আজিজুল হক

আমরা তো কার্ল মার্কসের 'ডাচ ক্যাপিটাল' বইটির কথাই বেশি করে জানি যেখানে তিনি পুঁজির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন; এছাড়াও তার আরো গ্রন্থ রয়েছে। আমরা যদি তার সমস্ত লেখালেখির কথা বাদও দেই, শুধু পুঁজিকে তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সেই ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কার্ল মার্কসকে মানুষের মনস্তত্ত্ব বুঝতে হয়েছে। মনস্তত্ত্ব শুধু বুঝতেই হয়নি বলতে হবে অংক কষে বুঝতে হয়েছে। কাজেই দর্শন তো আর মনস্তত্ত্বের মধ্যেই বাস করে না; তার প্রভাব আমাদের দৃশ্যগত যে জীবন তার ওপরও প্রভাব ফেলে। আর দৃশ্যগত প্রভাবের মধ্যে প্রধান দুটি বিষয় হল রাজনীতি ও অর্থনীতি। কাজেই অবদমন প্রসঙ্গে কার্ল মার্কসকে অবশ্যই সম্পর্কিত করে দেখতে হবে।

হালখাতা

তা হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীনে সমাজতন্ত্রের যে পরিণতি, সে সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী, এ পরিণতির জন্য 'অবদমন' কীভাবে কাজ করছে?

হাসান আজিজুল হক

আমার বক্তব্য হল, সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদ তথা কার্ল মার্কসের দর্শন একটি চিন্তার মুখ খুলে দিয়েছে মাত্র। এই চিন্তা-মুখকে প্রায়োগিকভাবে কাজে লাগাতে হবে সংশ্লিষ্টদেশের মানুষের বৈশিষ্ট্য অনুসারে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীনে সমাজতন্ত্রের যে পরিণতি তার জন্যে আমি কার্ল মার্কসের দর্শনকে দায়ী করি না। আমি এই দর্শনের প্রয়োগপদ্ধতিকে দায়ী করি। সমাজতন্ত্র তো মানুষকে অবদমন থেকে মুক্তি দেবে। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখলাম সমাজতন্ত্রের নামে মানুষকে আরো বেশি করে অবদমিত করে রাখা হচ্ছে। সে কারণে পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে।

হালখাতা

আপনার কাছ থেকে নির্দিষ্ট করে জানতে চাই, সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পেছনে কোন বিষয়টিকে আপনি সর্বপ্রথম দায়ী করবেন?

হাসান আজিজুল হক

আমার যেটা মনে হয়, শুধু মনেই হয় না আমার ধারণা সবাই এ ব্যাপারে একমত হবে; সেটা হল একটি রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে রাষ্ট্রের চেয়ে যদি দল বড় হয়ে যায় সেই রাষ্ট্র আর টেকে না। সোভিয়েত ইউনিয়নে হয়েছে সেটাই। রাষ্ট্র মানে তো সেই রাষ্ট্রের সকল জনগণ আর দল মানে তো শুধুমাত্র সেই দলের জনগণকে বোঝাবে। তাহলে একটি দল বা পার্টি যদি রাষ্ট্রের চেয়ে বড় হয়ে যায় তাহলে দলের জনগণের স্বার্থ কীভাবে রক্ষিত হবে। কোনো কিছুর উত্থান আর পতন এমনিতে তো আর হয় না। উত্থানের পেছনে যেমন কারণ থাকে, পতনের পেছনেও তেমনি কারণ রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পেছনে আরো বহু কারণ রয়েছে কিন্তু প্রথম ও প্রধান কারণ হল রাষ্ট্রের চেয়ে দল বা পার্টি বড় হয়ে ওঠা।

হালখাতা

সিগমুন্ড ফ্রয়েড-এর পরে অবদমন (Repression) নিয়ে আরো যে অন্যান্য দার্শনিক কথা বলেছেন, সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

হাসান আজিজুল হক

কার্ল মার্কস এবং সিগমুন্ড ফ্রয়েড প্রায় সমসাময়িককালের মানুষ। তা সত্ত্বেও কার্ল মার্কস আমাকে যেভাবে টেনেছে ফ্রয়েড আমাকে সেভাবে টানেনি। যে কথা আমি পূর্বেও বলেছি। যে কারণে ফ্রয়েডের পরে আরো অন্যান্য দার্শনিক ফ্রয়েডকে নিয়ে কী বলেছেন আমি সেই বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। তবে ফ্রয়েড-পরবর্তী সময়ে অবদমন (Repression) তত্ত্ব নিয়ে যারা নানা দিক থেকে কথা বলেছেন তাদের মধ্যে এরিখ বার্ন, ইয়ুং ও পাবলভ, ফুকো, দেরিদা, লাঁকা অন্যতম।

হালখাতা

অবদমন (Repression)- এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যেমন আছে– আবার তত্ত্বের বাইরে সামাজিকভাবেও এর এক ধরনের অর্থ রয়েছে। আপনার কাছে জানতে চাই অবদমন শব্দটি আমাদের সমাজে কী ধরনের হেজিমোনি তৈরি করেছে?

হাসান আজিজুল হক

অবদমনের হেজিমোনি সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের সমাজে 'অবদমন' শব্দটি সম্পর্কে কোন শ্রেণীর মানুষ অবগত তাদের কথা আমাদের মাথায় নিতে হবে। এরপর যে বিষয়টি ভাবতে হবে সেটা হল, এর আক্ষরিক ব্যাখ্যা করলে চলবেনা। আমার তো মনে হয় অবদমন নিয়ে ফ্রয়েড কী বলেছেন তার থেকে আমাদের সমাজে এর যে প্রতিষ্ঠিত অর্থ এ দুয়ের মধ্যে বিস্তার ব্যবধান রয়েছে। আমাদের সমাজে অবদমন দমনেরই কাছাকাছি একটি শব্দ। তবে দমন হল সরাসরি চাপ প্রয়োগ করে কোনো কিছুতে বাধ্য করা আর অবদমন হল পরোক্ষভাবে মনোস্তাত্ত্বিকভাবে কৌশল প্রয়োগ করে কোনো কিছুতে বাধ্য করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজে এ শব্দ দুটি প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

হালখাতা

অবদমন যেহেতু মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার সেহেতু মানুষের মনোজগৎ যেসকল কারণে কৌশল দ্বারা অবদমন করা হয়, সে সকল বিষয়গুলো কী বা সে কৌশলগুলো তৈরি হয় কীভাবে?

হাসান আজিজুল হক

রাষ্ট্র ও সমাজ যারা চালায় তারা অনেক সময় বা সবসময় গণমানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়, কারণ নিয়ন্ত্রণে না রাখা গেলে কিংবা গণমানুষকে বশে আনতে না পারলে রাষ্ট্র ও সমাজের কর্তাব্যক্তিদের শোষণমূলক সিদ্ধান্ত জনগণের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবে না। এটা করতে গিয়ে যখন দেখা যায় জনগণ সরাসরি কোনো সিদ্ধান্ত বা কোনো বিধান মেনে নেবে না, তখন কর্তাব্যক্তিগণ কৌশল প্রয়োগ করে থাকেন। এবং এই কৌশল প্রয়োগের কারণে জনগণের মনোজগতের ভেতর অবদমন তৈরি হয়। এ ধরনের কৌশলগুলো জনগণ মেনে না-ও নিতে পারে কিংবা মেনে নেবেই না– এ রকম একটি ভয় থেকে রাষ্ট্র কৌশলসমূহ প্রয়োগ করে থাকে।

হালখাতা

কিন্তু প্রশ্ন হল, যে ধরনের বিধান জনগণের স্বার্থ রক্ষা করবে না বা জনগণের স্বার্থ বিরোধী সেসব কৌশল জনগণের ওপর প্রয়োগ করা হলে জনগণ সেগুলো অনেক সময় বুঝতে পারে না– এর পেছনে কারণ কী?

হাসান আজিজুল হক

আসলে সকল মানুষ তো এক রকম নয়। পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে যেমন কমন কিছু ব্যাপার আছে, আবার পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই কিন্তু একজন থেকে অন্যজন আলাদা। এর কারণ হল একই ঘটনা একেক মানুষ একেকভাবে নেয়। এর মূল কারণ হচ্ছে মানুষের গ্রহণক্ষমতা সকলের এক রকম নয়। তার এই গ্রহণ-ক্ষমতার ভিন্নতার কারণে মানুষও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। আসলে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই অতি সাধারণ। এরা সুস্থভাবে বেঁচে থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদির বাইরে জীবন ও জগৎ নিয়ে ভাবে না। পক্ষান্তরে রাষ্ট্র ও সমাজ যাদের হাতে পরিচালিত হয় তাদের সংখ্যা হাতেগোনা। এরা অধিকাংশ সময়েই অতি বেশি ধূর্ত বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে। এরা অধিকাংশ সময়েই চায় ঐ সাধারণ মানুষদের শাসন-এর নামে শোষণ করতে। যে কারণে এদের ধূর্ততার সঙ্গে সাধারণ মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তা পেরে ওঠে না।

হালখাতা

মানুষের যে গ্রহণের ক্ষমতা বা বৈশিষ্ট্য তা প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত নাকি জন্মের পর তার পারিপার্শ্বিক প্রভাবের দ্বারা তৈরি হয়?

হাসান আজিজুল হক

আমি মনে করি একই রকম গ্রহণক্ষমতা বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর পারিপার্শ্বিক প্রভাবে মানুষের গ্রহণক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য আলাদা হয়ে যায়। যেমন কেউ যদি উচ্চবিত্তের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তার এক রকম বৈশিষ্ট্য হবে, আবার কেউ নিম্নবিত্তের মধ্যে জন্মগ্রহণ করলে তার আলাদা বৈশিষ্ট্য হয়। কাজেই আমরা তো বলতে পারি না কারুর মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য তার জন্মের আগেই তৈরি হয়েছিল। বরং যে ধরনের পরিপার্শ্বের মধ্যে তার জন্ম এবং বেড়ে-ওঠা সেটাই তার মধ্যে শ্রেণী বৈষম্যমূলক আচরণ তৈরি করে দেয়ে।

হালখাতা

কিন্তু উচ্চবিত্তের মধ্যে জন্ম নিয়েও দেখা গেছে যে কেউ কেউ তার শ্রেণীবৈষম্যের উর্ধ্বে থেকে কাজ করছেন?

হাসান আজিজুল হক

সে রকম অবশ্য আছে। তার পেছনেও কিন্তু পারিপার্শ্বিক প্রভাবই কাজ করে। সে ক্ষেত্রে উচ্চবিত্তের মধ্যে জন্ম নিলেও নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনোভাবে ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ওপর শ্রেণীচেতনা প্রভাব ফেলে। যে কারণে উচ্চবিত্তের মানসিকতাকে পরাজিত করে শ্রেণীহীন সমাজের চেতনা তার বা তাদের ভেতর প্রতিষ্ঠা পায়। কিন্তু

সেটা কোনোভাবেই পারিপার্শ্বিক প্রভাব ব্যতীত সম্ভব নয়। জন লক বলেছেন, Human as like as plain sheet of paper .

হালখাতা

এবার ভিন্ন দিক থেকে একটা প্রশ্ন রাখব। নারীবাদীদের তীব্র অভিযোগ রয়েছে যে, পুরুষ কর্তৃক নারী মারাত্মকভাবে অবদমিত। এ ব্যাপারে একজন পুরুষ হিসেবে আপনার বক্তব্য কী?

হাসান আজিজুল হক

অভিযোগটি নিঃসন্দেহে যথার্থ। পুরুষ কর্তৃক নারী অবদমিত হচ্ছেই। এই অবদমন বহুকাল ধরে চলে এসেছে। এর পেছনে কারণ হল পুরুষশাষিত সমাজ-ব্যবস্থা। যে কারণে নারী পুরুষের অবদমনের শিকার হয়।

হালখাতা

কিন্তু আপনি বলবেন, মানবসভ্যতার শুরু থেকেই সমাজ-ব্যবস্থা পুরুষ-শাসিত না হয়ে নারী-শাসিত হল না কেন? এমনকি আজকে আমাদের যে সমাজ-ব্যবস্থা সেটাই বা নারী-শাসিত না হওয়ার পেছনে কোন কারণটিকে আপনি চিহ্নিত করবেন। এক্ষেত্রে নারীর কি কোনো দুর্বলতা বা ঘাটতি রয়েছে?

হাসান আজিজুল হক

সভ্যতার একেবারেই আদিতে কাল্পনিক হোক বা বাস্তবই হোক এক ধরনের সাম্য সমাজ ছিলই হয়তো। তখনও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মানুষের মালিকানা সৃষ্টি হয়নি। তখন কিন্তু নারী-পুরুষের মধ্যে আজকের মতো ভেদাভেদ ছিলো না। যার দৃষ্টান্ত আজকের আদিবাসী সমাজেও কিছু কিছু পাওয়া যাবে। আদি যুগের সে অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিজের মালিকানা স্থাপন করল। মানুষ জমির মালিক হল, পানির মালিক হল, ইত্যাদি। এরপরে নানান রকম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ যখন পরিবারপ্রথা আবিষ্কার করল তখন থেকেই নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য তৈরি হতে শুরু করে। নারী সন্তান জন্ম দিতে পারে, এই যোগ্যতাই নারীর কাল হিসাবে পুরুষ সামনে নিয়ে আসে। ধীরে ধীরে শিশুসন্তানকে গর্ভে ধারণ, জন্মদান এবং লালন-পালন– এই সব কাজের কারণে নারী অনেকটা নিজের কাছে নিজেই যেন বন্দি হতে লাগল। পক্ষান্তরে পশু শিকার, জমি দখল ইত্যাদির ক্ষেত্রে পুরুষকে কোনোই বাধার মুখে পড়তে হল না।

একসময় লড়াই করে নারীকেও নানা পুরুষ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দখল করতে নেমে যায়। আর নারী ধীরে ধীরে হয়ে পড়ে ভূমির মতোই ভোগ-দখলের বিষয়। তারই ধারাবাহিকতা আজকের পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা। যে অবস্থা থেকে আমরা মুক্তির লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে আশা করি, নারীর সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা নিজের যোগ্যতা হিসেবে স্বীকৃতি পাবেই, যে যোগ্যতা পুরুষের নেই। এটা তার 'কাল' নয়। পুরুষশাসিত এই সমাজের চেহারা সেদিন পাল্টে যাবে এবং এমন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে দমন অবদমন বিষয়গুলো তথা শ্রেণী-বৈষম্য এতটা প্রকটভাবে আর থাকবে না।

নারীর অবদমনে রাষ্ট্র এবং পুরুষ

সে লি না হো সে ন

[জন্ম ১৪ জুন ১৯৪৭, রাজশাহীতে। অবসর নিয়েছেন বাংলা একাডেমীর পরিচালক পদ থেকে। লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ। বইয়ের সংখ্যা ষাট। রচনায় প্রধানত দেশপ্রেম, রাজনীতি, নারীমুক্তির কথা উঠে এসেছে। উল্লেখযোগ্য বই হাঙর নদী গ্রেনেড (উপন্যাস ১৯৭৬), পোকামাকড়ের ঘরবসতি (উপন্যাস ১৯৮৬), যুদ্ধ (উপন্যাস ১৯৯৮), গায়ত্রী সন্ধ্যা ১, ২, ৩ (উপন্যাস ১৯৯৪, ১৯৯৫, ১৯৯৬)। প্রতিষ্ঠা করেছেন 'লারা ফাউন্ডেশন'।]

হালখাতা

দমন (সাপরেশন) ও অবদমন (রিপরেশন)-এর মধ্যে আসলে মৌল পার্থক্য বা সম্পর্কটা কী?

সেলিনা হোসেন

দমন ও অবদমনের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় অবশ্যই খানিকটা পার্থক্য আছে। কিন্তু খুব বড় ধরনের পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। ইংরেজি-বাংলা অভিধানে দমন (Suppression) শব্দের অর্থ নিগ্রহ, নিগ্রহণ, গোপন ইত্যাদি। ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে

Suppression of the passion হচ্ছে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। এমন কয়েকটি ব্যাখ্যা আছে। অন্যদিকে অবদমন (Repression)-এর দুটি অর্থ আছে। ১. দমননীতি ২. অবচেতন মনের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার অবদমন; অবদমিত কামনা-বাসনা।

এসব অর্থের চেয়ে বড় কথা হল দমন ও অবদমনের একটি সুনির্দিষ্ট সামাজিক প্রেক্ষাপট আছে। যে কার্যকারণের ভিত্তিতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়, ব্যক্তি সেখানে কোনো একক সত্তা নয়। ব্যক্তির সত্তার বিকাশের সামাজিক প্রেক্ষাপট থাকতেই হয়।

এখন যদি বলি দমন-অবদমনের সামাজিক প্রেক্ষাপট এক, তা হলে কি ভুল বলা হবে? একজন মানুষ কখন ইন্দ্রিয় দমন করে? নিশ্চয়ই তার পারিপার্শ্বিক কারণে। যে কাজটি সে করতে চায়– সে কাজটি করার সামাজিক, পারিবারিক বা রাষ্ট্রীয় পরিবেশ অনুকূলে নয়। তখন সে ব্যক্তি অবদমনের অবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়। পুরুষশাসিত সমাজে এই অবদমনের ঘটনা পুরুষের চেয়ে নারীর ক্ষেত্রে বেশি ঘটে। অবচেতনে মনের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে নারী বেশি দমন করে। কারণ পুরুষের পৃথিবীতে নারীর চলাচল অনেক বেশি সীমিত। কখনো কখনো পুরুষকেও নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা দমন করতে হয়, পুরুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দমন করে পুরুষেরই আধিপত্যের কারণে। এক্ষেত্রে সামাজিক বাধার চেয়ে বড় হয় আধিপত্যের দম্ভ।

ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের ব্যাখ্যায় দমন ও অবদমনের মৌল পার্থক্যটি বেশ বড় পরিসর দাবি করে। কারণ এই ব্যাখ্যার সঙ্গে পরিবার ও সমাজকাঠামো, মনস্তত্ত্ব এবং মনোবিজ্ঞানের পর্যালোচনা আছে। ফ্রয়েড মানসিক অসুস্থতা থেকে মনঃসমীক্ষণের মতবাদ গড়ে তোলেন। এই মতবাদ দমনের আভিধানিক অর্থ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। অন্যদিকে মানুষের আকাঙ্ক্ষার অবদমন মানসিক অসুস্থতার একটি বড় দিক। আর দমন মূলত বাহ্যিক, যা ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয় ক্ষেত্রের সার্বিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

হালখাতা

আপনি আপনার উপন্যাসে নানা রকম চরিত্র সৃষ্টি করে থাকেন, সেদিক থেকে ব্যক্তি মানুষের অবদমন যে শুধু সেক্সুয়াল ব্যাপার নয়, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চয় একমত হবেন। তাহলে ফ্রয়েডীয় দর্শনের আলোকে আজকের সমাজকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

সেলিনা হোসেন

প্রথমেই বলি আমি ফ্রয়েডীয় দর্শনের আলোকে আজকের সমাজকে ব্যাখ্যা করতে চাই না। এই দর্শন আমার কাছে আজ তেমনভাবে অর্থবহ নয়। আমার উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টিতে আমি অবদমনের বিষয়টিকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখতে চাই। যেমন নারী-পুরুষ নানা কারণে দমিত হয় এবং এই দমন যে অবদমনের সৃষ্টি করে তা এককভাবে একজন ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে না। এবং একই সঙ্গে জীবন

সম্পর্কের নানা জটিলতা এবং অনুষঙ্গ জড়িত থাকে। মানুষ সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতে পারে না। সমাজের ভালোমন্দ বোধের সঙ্গে সে জড়িত থাকে। যৌন অবদমনের বিষয়টিকেও আমি মনে করি সামাজিক আরও নানা দমিত কাজের একটি। এই অবদমন ধর্ষণ-গণধর্ষণের মতো প্রতিহিংসামূলক কাজকেও উস্কে দেয়। একটি মেয়ে ধর্ষণের শিকার হলে তা শুধুই আর ব্যক্তিগত থাকে না। তা পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা পর্যন্ত গড়ায়। যৌন অবদমনের কারণে ধর্ষণের ঘটনা না ঘটালেও, বিষয়টি ব্যক্তিগত থাকে তখনই– যতদিন ব্যক্তি নিজের যৌন আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে রাখতে পারে। যদি দমিয়ে রাখার কারণে সে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন সেটা আর ব্যক্তিগত থাকে না। কারণ তাকে ডাক্তারের কাছে মুখ খুলতে হয়। পুরুষ হলে সে যদি পতিতালয়ে যায় তবে তা আর ব্যক্তিগত থাকে না। পুরুষটি রাষ্ট্রের একটি সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। ব্যক্তিটি নারী হলে সে যদি অবচেতনে যৌন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটায় তখনো সে একটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। ব্যক্তিগত বিষয়টি প্রকাশ্য হয়, অন্যের সঙ্গে সংযুক্তি ঘটায়। বিষয়টিকে আমি এভাবে দেখি। অবদমন তো কোনো অর্থেই শুধু সেক্সুয়াল ব্যাপার নয়। এটি সামাজিক এবং রাজনৈতিকও।

হালখাতা

ব্যক্তিপর্যায়ের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় অবদমন বলতে আমরা কী বুঝব?

সেলিনা হোসেন

ব্যক্তি তো রাষ্ট্রের বাইরের বা রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। ব্যক্তির অবদমনের কারণ ব্যাখ্যা করলে রাষ্ট্রকে দায়ী করার বহু দিক বের হয়ে আসবে। রাষ্ট্র একটি দেশের জনগণের সংগঠন, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে যারা নিয়োজিত থাকে তারা কতটা জনকল্যাণ বা জনস্বার্থ রক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করছে তার ওপর ব্যক্তির অবদমন অনেকখানি নির্ভর করে। তারচেয়ে বড় কথা হল রাষ্ট্র কোন পদ্ধতিতে চলবে– রাষ্ট্র কি এমন পদ্ধতিতে চলবে যার ভেতর দিয়ে গুটিকয় মানুষের স্বার্থ রক্ষিত হবে? নাকি রাষ্ট্র এমন পদ্ধতিতে চলবে যার ভেতর দিয়ে সকল মানুষের কল্যাণ হবে? কাজেই অবদমন ব্যক্তির ওপর নির্ভর করলেও ব্যক্তি তো রাষ্ট্রে বসবাসকারী একজন মানুষ, তার সমস্যার সঙ্গে অবশ্যই আমরা রাষ্ট্রের ভূমিকাকে যুক্ত করে দেখব।

এছাড়া রাষ্ট্রীয় অবদমন নানা সংস্থার মাধ্যমেও সংঘটিত হতে পারে। যেমন পুলিশ কাউকে সন্দেহজনিত কারণে গ্রেফতার করে কিন্তু সে যদি পরবর্তী সময়ে নির্দোষ প্রমাণিত হয় তাহলে সে ব্যক্তি অবদমনের শিকার হয়। বিনা বিচারে আটকে থাকাও রাষ্ট্রীয় অবদমন। বিচার না পাওয়াও রাষ্ট্রীয় অবদমন। বিভিন্ন সরকারি ও আধা-সরকারি কর্মচারী-কর্মকর্তার পদোন্নতি, পদায়নের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার না পাওয়ার মাধ্যমে অবদমন সৃষ্টি হয়। সংসদ-সদস্য বা মন্ত্রীদের মতো জনপ্রতিনিধিরা ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে অন্যকে অধিকারবঞ্চিত করলে রাষ্ট্রীয় অবদমন হয়। নারীর বিরুদ্ধেও

রাষ্ট্রীয় অবদমন নানাভাবে তৈরি হয়। এমন অনেক উদাহরণ আছে। রাষ্ট্রের অবদমন প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোনো-না-কোনোভাবে মানুষকে অবদমিত করে। পার্থ সাহা নামের একটি ছেলেকে আটক ও নির্যাতনের ঘটনা বেশিদিন আগের কথা নয়। এটি রাষ্ট্রের অবদমনের ন্যক্কারজনক ঘটনা। পার্থ কি কোনোদিন মুক্তি পাবে এই অবদমন থেকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে স্বজনহারা পরিবারেরা রাষ্ট্রীয় অবদমনের শিকার হয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করার কারণে। হতদরিদ্র মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপারে সঠিক দায়িত্ব পালন না করাও রাষ্ট্রীয় অবদমন।

হালখাতা

আপনি দীর্ঘ সময় ব্যয় করে জেন্ডার বিশ্বকোষ-এর কাজ করেছেন। আপনি কি বলবেন, নারীকে দমন করার ক্ষেত্রে পুরুষ অবশ্যই দায়ী কিন্তু নারীকে অবদমন করার ক্ষেত্রে পুরুষ কতটা ও কীভাবে দায়ী?

সেলিনা হোসেন

নারীর অবদমন ব্যাপকভাবে তৈরি করেছে পুরুষ। যেমন, অবমাননা, অমর্যাদা, বঞ্চনা, নিপীড়ন, নির্যাতন পুরুষের অবদমনের নানা দিক। যেমন ধরুন বহুবিবাহ; প্রত্যেক বউকে অর্থ-বিত্তে ভরিয়ে দেয়ার পরও সপত্নী নারীর অবমাননার অন্যতম দিক। মৌখিক তালাক এক সময় ছিল নারীর অপমানের ক্ষেত্র। কথায় কথায় তালাক দিয়ে নারীকে ভীষণভাবে অবদমনের পথ সৃষ্টি করা হতো। পুরুষ প্রকাশ্য পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে নারীকে অবদমন করে। এটি গেল একটি দিক। অন্যদিকটি হল পারিবারিক অধঃস্তনতা, সামাজিকভাবে কোণঠাসা করে রাখা। সবচেয়ে বড় কথা রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরুষ নীতি-নির্ধারণের জায়গা থেকে নারীর অবদমন তৈরি করে। সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে এইসব অবদমন নারীর পারিবারিক জীবনে নির্মমতা নিয়ে আসে, যেখান থেকে নারীর মুক্তি খুবই কঠিন। কারণ এই অবদমন চর্মচোখের অন্তরালে অত্যন্ত সংগোপনে সংঘটিত হয়।

হালখাতা

নারীর অবদমনের জন্য নারী নিজে কতটা দায়ী?

সেলিনা হোসেন

যে নারী নিজের গণ্ডি ভাঙতে পারে না সেতো নিজেই নিজের কারণে অবদমনের শিকার হয়। কিন্তু আমাদের মতো রাষ্ট্রে ও সমাজে গণ্ডি ভাঙতে পারার মানসিক শক্তি এবং পারিপার্শ্বিক সহযোগিতা লাভ নারীর জন্য খুব সহজ হয় না। সেজন্য নারী তার নিজের অবদমনের জন্য একমাত্র নিজেই এককভাবে দায়ী একথা বলা যাবে না।

হালখাতা

নারী তো অবশ্যই এককভাবে দায়ী নয়, কিন্তু দেখা যায় কোনো কোনো নারীবাদী লেখক নারীর দোষটা একেবারেই আমলে নিতে চান না। আপনি এরকম দৃষ্টিভঙ্গিকে কীভাবে দেখেন?

সেলিনা হোসেন

পুরুষের ওপর প্রচণ্ড ক্ষোভ থেকে কোনো কোনো নারী লেখক বা সমাজকর্মী এটা করে থাকে। খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করলে এধরনের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই নিরপেক্ষতা দাবি করে না কিন্তু এ-ধরনের ক্ষোভের দৃষ্টিভঙ্গি কেন তৈরি হয় তার কারণও তলিয়ে দেখা দরকার। একজন মানুষ যে রাগ হয়, ভাঙচুর করে, খুন করে– এসবের গভীরে পৌঁছে রাষ্ট্র, সমাজ, আইন তো ঘেঁটে দেখে না যে– এমন আচরণের পেছনে আসলে কী রয়েছে। আসল সত্যটা হল নারীর ওপর পুরুষের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার মধ্যেই সমস্যা আর রাষ্ট্র তো চালায় পুরুষ! সংসার চালায় পুরুষ! কেন পুরুষে চালায়, তারও গভীর কারণ রয়েছে। মানুষ যেদিন থেকে প্রকৃতিকে নিজেদের মালিকানায় নিয়ে আসতে শুরু করল, সেদিন থেকেই জমির মতো নারীকেও ভোগের বস্তুতে পরিণত করল পুরুষ। শত শত বছরের এই-যে দমন ও অবদমন, এটা জানার পর সে নারীবাদী হোক আর মানবতাবাদীই হোক, তার মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষোভ তৈরি হতে পারে। একে বাঁকা চোখে দেখার কোনো কারণ নেই।

হালখাতা

আপনি যে বললেন রাষ্ট্র চালায় পুরুষ কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী, শেখ হাসিনা, বেনজির ভুট্টো, খালেদা জিয়া– এঁরা তো সরকারপ্রধান ছিলেন?

সেলিনা হোসেন

হ্যাঁ, এঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন সেটা সত্যি। কিন্তু তার আগে দেখতে হবে যে কোন পরিস্থিতিতে এঁরা ক্ষমতায় এসেছেন। যে চারজনের নাম তোমরা করলে তার মধ্যে ইন্দিরা গান্ধী কিন্তু বাবা বা স্বামীর মৃত্যুর কারণে ক্ষমতায় যাননি। অন্য তিনজনকে তাঁদের দল রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে। উত্তরাধিকার হিসেবে পার্টি ভাঙনকে রক্ষা করার জন্য তাঁদেরকে তারা দলের প্রধান পদে নিয়ে এসেছে। এখানেই পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়। তারা দলের লোক হয়ে নিজেরাই গণতান্ত্রিক ধারায় দলের মূল্যবোধ রক্ষা করেনি অথচ দোষ চাপায় নারীর ঘাড়ে– তাদেরকে বাবা বা স্বামীর উত্তরাধিকার হিসেবে উপহাস করা হয়। শুধু উপহাস নয়, অন্তরালে থেকে তারাই নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতার জায়গা। নীতিনির্ধারণী জায়গাগুলো পুরুষ নিয়ন্ত্রণ করে বলে ক্ষমতায় থেকেও নারীর ইস্যুতে নারী সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। পুরুষ নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় নারী অবদমনের শিকার হয় এভাবে। আর এই অবদমন থেকেই নারী প্রবেশ করে পুরুষশাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থায়। নারীর অবচেতনে

পুরুষতান্ত্রিক ধারণাগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। নারীকে নারীর প্রান্তিকতা অস্বীকার করতে শেখানো হয়। নারীর অবদমন নারীকে নিজের অবস্থান বুঝতে সহায়তা করে না। সেজন্য রাষ্ট্র-ক্ষমতায় গিয়েও নারী নারী-ইস্যুতে এমন পুরুষতান্ত্রিক ভাবনা গলাধঃকরণ করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৪ সালে উপমহাদেশে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন। এভাবেই ক্ষমতার প্রদর্শন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে করে।

হালখাতা

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় কম। এর পিছনে নারীর দমিত ও অবদমিত হওয়ার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণ বলবেন কি?

সেলিনা হোসেন

প্রথম কারণ পুরুষতন্ত্র। নারীকে নানা অজুহাতে ঘরে আটকানো হয়েছে– এর মধ্যে অন্যতম হল বংশরক্ষা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসেবে পুত্র-সন্তানের আকাঙ্ক্ষা। সতীদাহ। ধর্মের অজুহাতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা। ঘরগেরস্থালির কাজকে স্বীকৃতি না দেয়া। নারীর উদ্যমকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা। খনা একটি উদাহরণ। কৃষিবিদ্যায় খনার রচনাগুলো যখন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তখন খনার শ্বশুর বরাহ পুত্রকে নির্দেশ দেন স্ত্রীর জিহ্বা কর্তন করার জন্য। পুত্র অবলীলায় পিতার নির্দেশ পালন করে। মৃত্যু হয় খনার। এ ধরনের উদাহরণ সেই সময় যদি অন্য নারীদের ভীত করে তোলে তাহলে নিঃসন্দেহে লোকায়ত জ্ঞানচর্চায় নারীর যে অবদমন হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

হালখাতা

নারীকে বেশ্যা বলা হয়, কিন্তু একই কারণে পুরুষকে কোনো অপবাদের শিকার হতে হয় না; আবার একজন অন্যজনকে গালি দিতে গেলে মাকে গালি দেয়া হচ্ছে বাবার নাম করে গালি দেয়া হচ্ছে না। এর পেছনে কারণটা কী?

সেলিনা হোসেন

আমি বারবারই বলছি পুরুষশাসিত সমাজ নারীকে দমিয়ে রেখেছে নিজের স্বার্থে। যে শাসন করে সে তো অপবাদের দায় নেবে না এটাই স্বাভাবিক। কারণ শাসিতের দায় দেয়ার সাহস থাকে না, এদিক থেকে সে দুর্বল থাকে। শাসিত যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণবিদ্রোহ করে তখনই শাসকের টনক নড়ে। এটা ইতিহাসের আলোকে দেখা প্রমাণিত সত্য। বাংলা ভাষার দিকে তাকালে দেখা যায় নারীকে দমন করার জন্য ভাষার কত বিচিত্র ব্যবহার আছে। অজস্র উদাহরণ দেয়া যাবে। যেমন গালির ব্যাপারটিতেও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়ে। এটা রুচিহীন বিকৃত সাংস্কৃতিক নির্মাণ। এই নির্মাণের দ্বারা পুরুষ নারীকে দমন করেছে প্রবল আধিপত্যের

মাধ্যমে। সে নিজেও যখন কোনো পুরুষকে 'খানকির পুত' বলে গালি দেয়, সে নিজেও জানে না এর অর্থ কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, কার বিরুদ্ধে কী বলা হচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরে পুরুষ নারীকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করার জন্য তৈরি করেছে। গালি এই দমনপ্রক্রিয়ারই একটি অংশ।

হালখাতা

বিশেষ করে বাংলাদেশের নারীদের একটা অংশ অতিরিক্ত সাজসজ্জায় মনোযোগী এবং এটা করতে গিয়ে সে তার কাছের পুরুষটির কাছে নিজের সবকিছু বন্দি রাখে; এর জন্য নারীর ঐতিহাসিক কোনো অবদমনকে দায়ী করা যায়? নাকি এটাও পুরুষ কর্তৃক নারীর দমনপ্রক্রিয়ার ফল?

সেলিনা হোসেন

আদিমকাল থেকেই নারী নানাভাবে প্রসাধনী চর্চা, অলঙ্কার, পোশাক ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেকে সজ্জিত করেছে। বাংলা ভাষার আদি-নিদর্শন 'চর্যাপদ'-এ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। পাশাপাশি অন্যান্য অনেক রচনাতেও এর প্রমাণ মেলে। এই রূপচর্চায় আবার শ্রেণীবৈষম্যের চিত্রটি প্রকট। কারণ তৃণমূল পর্যায়ের নারীর সঙ্গতি ছিল না রূপচর্চায় নিজেকে চর্চিত করে দিনযাপনের। তারাই প্রকট রূপচর্চায় আগ্রহী হয়েছে যাদের অন্যকিছু করার ছিল না, নিজেদের শুধুই পুরুষের শয্যাসঙ্গী হিসেবে চিন্তা করা ছাড়া। এটি ছিল পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ। এর বাইরে তার সামনে আর কোনো দরজা খোলা ছিল না। তবে আস্তে আস্তে হলেও পরিবর্তন এসেছে। নারী তার পুরুষ-বন্দনার খোলস ছেড়েছে। নারীর ব্যক্তিত্বের সামনে পুরুষকে হার মানতে হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গি বদলে নারীকে শ্রদ্ধা করা শিখতে হয়েছে। সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা রোধ হয়েছে, বিধবাবিবাহ প্রথা চালু হয়েছে। একদল নারী প্রসাধনকে প্রত্যাখ্যান করেছে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে– জেন্ডার সমতার জায়গা অর্জনের লক্ষ্যে। অন্যদল আবার ঠিকই বাণিজ্যিক মুনাফার কাছে নিজেকে পণ্য করেছে, হয়তো কখনো নিতান্ত জীবিকার প্রয়োজনেও। এখানে দমন-অবদমনের ব্যাপারটি মুখ্য নয়।

হালখাতা

সিগমুন্ড ফ্রয়েড মানুষের যৌন অবদমনের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, সেই আলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর যৌন-স্বাধীনতা বলতে আমরা কী বুঝব? এ অঞ্চলে নারীরা কিভাবে অবদমিত হচ্ছেন? এজন্য রাষ্ট্র কতখানি দায়ী?

সেলিনা হোসেন

তৃণমূল পর্যায় থেকে উচ্চবিত্ত নারীর জীবনচর্চায় বৈবাহিক ধর্ষণ যেমন আছে, যৌন উপভোগের স্বাধীনতাও আছে। এটা যার যার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এটা যার যার ব্যক্তিস্বাধীনতা। দেখেছি, নারী-পুরুষ ইচ্ছে করলে গোপনে

অথবা কখনো প্রকাশ্যে স্বেচ্ছায় একে অপরের যৌনসঙ্গী হতে পারে। অবশ্যই সমাজের দিকে লক্ষ্য রেখে কিংবা পরিবার-বহির্ভূত আচরণকে গোপন রেখে। এ দেশে বিবাহ-বহির্ভূত জীবনযাপনের উদাহরণ যে নেই তাতো নয়। এ অঞ্চলের নারীরা বরং বৈবাহিক ধর্ষণের শিকারই বেশি হয়। বেশিরভাগ নারীই উপায়হীনভাবে এটা মেনেও নেয়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সন্তানের সুখের দিকে তাকিয়ে, কিংবা সমাজের। এসব ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্য একচেটিয়া । নারীর যৌন-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। এ রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র নয়।

হালখাতা

নারীর মা হওয়ার ক্ষমতাকে আমাদের সমাজ নারীর পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসাবে দেখে। যেমন বলা হয়ে থাকে, গর্ভধারণ অবস্থায় কর্মজীবনে নারী অংশগ্রহণ করতে পারে না ইত্যাদি। আপনি এ ধরনের দৃষ্টিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? এভাবে কেন দেখা হয়?

সেলিনা হোসেন

এটিও নারীকে দমনের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ পুরুষ বংশরক্ষার জন্য সন্তান চায়, কিন্তু নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা স্বীকার করতে চায় না। সন্তান উৎপাদন যেমন নারীর একক দায়িত্ব নয়, সন্তানের পরিচর্যাও তার একার দায় নয়। এ ব্যাপারে নারী-পুরুষের সমান অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে রাষ্ট্রই পারে। তাহলে নারীর ঘরের বাইরে, বিভিন্ন অফিস বা প্রতিষ্ঠানে কর্মজীবন নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না। দু'টি সন্তান হওয়ার পরে নারী সন্তান গ্রহণ না করলে সে নির্বিঘ্নে বাকি সময় কর্মজীবী নারী হিসেবে কাটিয়ে দিতে পারে। বারবারই বলছি দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা এখনো আমাদের চারপাশে প্রবল। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির নতুন ব্যাখ্যা নেই। প্রয়োজন পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

হালখাতা

ঘরের ভিতরের কাজ নারীর মজুরিহীন শ্রম। এক অর্থে তাঁরাও কর্মজীবী নারী কিন্তু মজুরিহীন শ্রমদানের কারণে সেসব নারী কর্মজীবী নারীর অভিধায় চিহ্নিত হন না। তাঁদের অভিধা শ্রমবাজারে মূল্যায়িত হয় না। তবে সমাজ-কাঠামো রক্ষার ব্যাপারে এইসব নারী অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন। যে সমাজ-কাঠামো ধরে না রাখলে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে এবং পরবর্তী প্রজন্ম ঠিকমতো বেড়ে ওঠার সুযোগ পাবে না। এই বড় অবদানের কারণে তাঁরা পুরো নারীসমাজের প্রতিভূ অথচ এই অবদান মূল্যায়িত হয় না। বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখেন?

সেলিনা হোসেন

আসলে আমার মনের কথাটিই তুমি বললে। আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একমত। আর আমি যে কথাটি ব্যবহার করলাম, সেটা আমার বিশ্বাসের জায়গা থেকে বলিনি, ওটা বরং সমাজের প্রচলিত কথা, যার বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াইটা। পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে যেখানে সংসারের রান্না, ঘর গোছানো, সন্তান পালন ইত্যাদি কাজের অর্থমূল্য হিসাব করে জাতীয় বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশেও এটা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

হালখাতা

এদেশে নারী ধর্ষিত হয় কিন্তু পশ্চিমা দেশে নারী কর্তৃক পুরুষও ধর্ষিত হয়। প্রশ্ন হল ধর্ষণ কি অবদমনের ফল?

সেলিনা হোসেন

ধর্ষণ অবশ্যই যৌন অবদমনের ফল। কখনো তা দমননীতির বহিঃপ্রকাশ। আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে না পারার আক্রোশ। তবে সব ধর্ষণকে অবদমনের ফল বলা যাবে না, কারণ পশ্চিমা দেশে সেক্স মুক্ত ও অবাধ হওয়ার পরও সেখানে ধর্ষণ বেশি হয়ে থাকে। কাজেই অন্যান্য বিষয়ের মতো সেক্সকেও নির্দিষ্ট পরিসরে স্বাধীন করে দেয়ার পর একে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। প্রসঙ্গত বলা দরকার, দমন বা অবদমনের বিপরীত জায়গা কিন্তু কখনই বল্গাহীন স্বেচ্ছাচারিতা বা যা ইচ্ছা তাই করা নয়।

হালখাতা

এদেশে বয়স্কদের আনন্দ দেয়ার বা নেয়ার কোনো মাধ্যম নেই। বয়স্ক মা-বাবা আর্থিক ও অন্যান্য দিক থেকে সন্তানের ওপর নির্ভর করতে চায়। কিন্তু সেটা আমাদের আইন দ্বারা সিদ্ধ নয়। সন্তান তো বৃদ্ধ মা-বাবার দায়িত্ব না-ও নিতে পারে– বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখেন?

সেলিনা হোসেন

আমার মনে হয় সময় এসেছে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার। বাবা-মাকে সন্তানের ওপর নির্ভরশীল না হওয়ার চিন্তা করতে হবে। কারণ সন্তানের ওপর নির্ভর করার বিষয়টি আইন দিয়ে বিবেচনা করা যাবে না। বিবেচনা করতে হবে সম্পর্কের বন্ধন দিয়ে। আমাদের সমাজে এখন পর্যন্ত এ জায়গাটি শিথিল হয়নি। অক্ষম সন্তান বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দায়িত্ব না-ও নিতে পারে। কিন্তু সক্ষম সন্তানেরা কেন বাবা-মায়ের দায়িত্ব নেবে না? ব্যাপারটিকে একদমই ব্যক্তিগত বলে উড়িয়ে দেয়া ঠিক নয়। এর সঙ্গে মানবাধিকারের বিষয়টি জড়িত। সামাজিক মূল্যবোধের প্রশ্ন জড়িত। রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্বের প্রশ্ন জড়িত। এত কিছুর পরও বলব বৃদ্ধ বাবা-মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

থাকা দরকার। বয়স যেন সম্পর্কের দূরত্ব তৈরি না করে। তাহলেই বয়স্কদের আনন্দে থাকা-না-থাকার বিষয় কষ্টদায়ক হবে না। সেটা শুধু আইন করে হবে না, তবে সন্তানের সম্পদের ওপর বাবা-মা'র অধিকার-সংক্রান্ত আইন থাকতে পারে। একইসঙ্গে এজন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ থাকা দরকার, মানুষের আবেগ, ভালোবাসা সর্বোপরি এ-জাতীয় সম্পর্ককে আরও নিবিড় করার জন্য নানা রকম উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

হালখাতা

আপনার 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসের বুড়ি চরিত্রে আমরা দেখতে পাই বুড়ির অবচেতনে স্বাধীনতার স্বপ্ন ছিল। তাই হয়তো প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাকে বাঁচানোর জন্য বুড়ি নিজের বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ছেলেটিকে পাকসেনাদের হাতে তুলে দেয়। নারীর এই অবদমিত আকাঙ্ক্ষা কি আসলে তার নিজের জীবনেরও স্বাধীনতা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা?

সেলিনা হোসেন

বুড়ির অবচেতনের আকাঙ্ক্ষা থেকেই উঠে এসেছে তার স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ স্বীকারের আকাঙ্ক্ষা। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। এই বৃদ্ধা তার দেশের পরিস্থিতি থেকে, উদ্ভূত পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে অর্জন করে অভিজ্ঞতা। নারীর নিজস্ব স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেহেতু অবদমিত থাকে, বুড়ির বড় আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন তার ব্যক্তিজীবনের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এখানে মিলে গেছে। নারীর এই অবদমিত ইচ্ছা পুরুষতন্ত্রের কাছে উপেক্ষিত। সুযোগ পেলে নারীর অবচেতন আকাঙ্ক্ষাকে নারীই তার শক্তি দিয়ে রূপায়িত করতে পারে। সেটিই এই উপন্যাসের বুড়ি চরিত্রে দেখিয়েছি।

হালখাতা

'গায়ত্রী সন্ধ্যা' উপন্যাসের পুষ্পিতা চরিত্রটিতে মনে হয়েছে আপনি বেশ সূক্ষ্মভাবে তার মধ্যে অবদমনের ছাপ রেখেছেন। বিশেষ এ চরিত্রটি সম্পর্কে কিছু বলুন।

সেলিনা হোসেন

এ চরিত্রের মধ্যে বড় ধরনের অবদমন হয়েছে। পুষ্পিতা জেনেশুনে স্বামীর মৃদু পরকীয়া হজম করেছে। উপন্যাসের পটভূমি পঞ্চাশ এবং ষাটের দশক। সে সময়ে নারী ইস্যু এত প্রবলভাবে প্রত্যক্ষ ছিল না বলে আমি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতের কারণে সূক্ষ্মভাবে চরিত্রের চিত্রায়ণ করেছি। উপন্যাসের সময়ের কারণটা এখানে প্রধান ছিল। পুষ্পিতা অবদমিত হয়েছে পরিবারে এবং রাষ্ট্রীয় ভাবনার কাছে। বুড়ির মতো পুষ্পিতা নিজের বেড়ি ভাঙতে পারেনি। আমি জোর করে তা করতেও চাইনি– কারণ সমাজে এখনও এমন অজস্র নারী আছে, যারা নিজেদের জায়গা খুঁজে পায় না। শুধু গুমরে মরে।

ফ্রয়েডের আবিষ্কার: দমন ও বাসনা

স লি মু ল্লা হ খা ন

ফ্রয়েড নিজেই বলিয়াছেন তাঁহার আবিস্কৃত মতিবিভাজন (বা মনোবিশ্লেষণ) শাস্ত্রের ভিত্তি গড়া হইয়াছে 'দমন' ধারণার পাথর দিয়া। স্বভাবতই প্রশ্ন হইতেছে 'দমন' জিনিসটা কী? আর কে কাহাকে দমন করিতেছে সেই প্রশ্নও পরিহার করিবেন কী করিয়া? এই বিষয়ে প্রথমে আমরা খোদ আবিষ্কর্তা ফ্রয়েডের প্রস্তাব বিচার করিয়া দেখিব। তাহার সঙ্গে বিচার করিব জাক লাকাঁর ব্যাখ্যা। কারণ লাকাঁই যাহাকে 'ফরাসিভাষী ফ্রয়েড' বলিয়া সম্মান জানাইতে হইবে। ফ্রয়েডের সর্বাধিক যোগ্য ভাষ্যকার।

এক

বাংলা 'দমন' কথাটি আমরা 'ইংরেজি' (repression) রিপ্রেশন কথাটির অনুবাদ স্বরূপ ব্যবহার করিতেছি। ইহার অনুবাদ আমার পূর্বসূরিগণ কেন 'অবদমন' করিয়াছিলেন তা সহজে বুঝিতে পারি নাই বলিয়া আমি 'দমন' কথায় ফিরিয়া যাইতেছি।

ফ্রয়েডের প্রস্তাব মোতাবেক কোন চিন্তা বা স্মৃতিকে যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এলাকায় ঠাঁই না দিয়া অজ্ঞানের এলাকায় ঠেলিয়া দেওয়া হয় তখন দমন করা হয়। এখানে দমন মানে তাড়াইয়া দেওয়া মাত্র হত্যা করা নয়। যাহাকে দমন করা হইতেছে তাহা চিন্তা বা স্মৃতি মাত্র আসল বস্তু নহে। হিস্টিরিয়া রোগীর চিকিৎসা উপলক্ষে ফ্রয়েড প্রথম নজর করিয়াছিলেন রোগি কোনো কোনো কথা একেবারেই স্মরণ করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু একবার মনে করাইয়া দেওয়ার পর গড় গড় করিয়া সবই তাহার স্মরণপথে উদিত হইতেছে। ইহা হইতেই ফ্রয়েড ধারণা করিলেন কিছু একটা দমন করা ছিল, মারা যায় নাই। তাহাই এখন সুযোগ করিয়া দেওয়ার ফলে পথ পাইয়াছে আর পথ পাইবার ফলে আসিয়া হাজির হইতেছে। এই ঘটনার নামই ফ্রয়েড রাখিলেন ফেরড্রেংগুংগ (Verdraengung) বা দমন। ইহা ফ্রয়েডের আবিষ্কারের প্রথম পর্যায়।

পরে ফ্রয়েড দেখিলেন দমন দুই প্রকারের হইয়া থাকে। একদা যাহা জ্ঞানে ছিল, তাহাকে বিরাগবশত আমরা যদি অজ্ঞানের এলাকায় ঠেলিয়া পাঠাই তাহাতে দমন ঘটে। উপরে ইহার কথাই বলা হইয়াছে। পরে ফ্রয়েড এই দমনের নাম রাখিলেন 'দুই নম্বর দমন'। ইংরেজি ভাষায় বলে 'সেকেন্ডারি রিপ্রেশন'।

পরের বার ফ্রয়েড আর এক ধরনের দমন কাহিনী বয়ান করিলেন যাহার নাম রাখা হইয়াছে আদ্যের দমন বা এক নম্বর দমন। ইংরেজিতে 'প্রাইমারি রিপ্রেশন'। ইহার মর্ম এই যে, যাহা আদপেই কোনো দিন জ্ঞানের এলাকায় প্রবেশ করে নাই তাহাকে দমন করিয়া অজ্ঞানেই রাখিয়া দেওয়া হয়। এই আদ্যদমন এক ধরনের গল্পকাহিনীর মতো হইলেও ইহা অসত্য নহে। একটু চিন্তা করিলেই ইহা বোঝা যাইবে।

ফ্রয়েড মানুষের মনকে যে জ্ঞান ও অজ্ঞান এই দুই কাণ্ডে বিভক্ত করিলেন তাহার পক্ষে যুক্তি কী? অজ্ঞান সৃষ্টির আগে একটা-না-একটা কাণ্ড তো দরকার। দমনই সেই কাণ্ড। অর্থাৎ যে দমনের মধ্যবর্তিতায় অজ্ঞান তৈরি হইল তাহাই আদ্যদমন বা প্রাইমারি রিপ্রেশন। আদ্যদমন না হইলে অজ্ঞানেরই জন্ম হইত না।

মনে রাখা দরকার প্রাণী মাত্রেরই জ্ঞান (বা 'সাড়া', বা 'বশ') থাকে। কিন্তু সকল প্রাণীর অজ্ঞান থাকে না। অজ্ঞান থাকে কেবল ভাষাবলা প্রাণী ওরফে মনুষ্যসন্তানের। অবলার নয়। অর্থাৎ অজ্ঞান অনাদি নয়, তাহারও আদি আছে। এই আদিকাণ্ডেরই অপর নাম আদ্যদমন।

প্রথম প্রথম একটু খটকা লাগিলেও লাগিতে পারে। কিন্তু একটু ভাবনাচিন্তা করিলেই দেখিবেন যাহা কোনোদিন হাজির ছিল না তাহাও হাজির হইতে পারে 'শূন্য' আকারে। অবশ্য যদি সংখ্যাতন্ত্র (number system) থাকে। 'এক' সংখ্যাটি তৈরির আগে 'শূন্য' বলিয়া কোনো সংখ্যার কথা আমরা জানিতাম কি? অথচ 'এক' যখন তৈরি করিলাম তখন দেখিলাম তাহার স্থান প্রথম নহে, দ্বিতীয়। কারণ প্রথম স্থানটি শূন্যকেই ছাড়িয়া দিতে হইবে।

ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইতেছে প্রথমেই কিছু একটা দমন করা হইয়াছে। নহিলে আদপে অজ্ঞানই গঠিত হইত না। অজ্ঞান আবিষ্কার করার পর ফ্রয়েড বুঝিতে পারিলেন দমন দুই প্রকারেরআদ্য ও অন্তিম। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি।

দুই

ফ্রয়েডের প্রস্তাব অনুসারে বলিতে হইবে দমনকাণ্ডের ফলে চিন্তা, ধারণা, বা স্মৃতি ধ্বংস হয় না, অন্য কোথাও ঠাঁই লয়। এখানে জাক লাকাঁর কথা তুলিতেই হইবে। তিনি ভাষ্য করিয়াছেন, যাহা দমন করা হয় তাহা আসলে ভাষাই। তাই দমিত শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশ অন্য শব্দ, অন্য ভাষা বা অন্য রূপক আকারে প্রকাশ পায়, ফিরিয়া আসে। এই আবিষ্কারটাও ফ্রয়েডেরই। লাকাঁ ইহার কথা নতুন করিয়া বলিয়াছেন। রোগের উপসর্গ বা লক্ষণ, স্বপ্ন, কথার ভুল, পরিহাস ইতি আদি ফ্রয়েডের দৃষ্টিতে দমন করা ভাষারই ফিরে আসা মাত্র (return of the repressed)। কিন্তু সমস্যার কথা একটাই। যাহা যে আকারে দমন করা হয় তাহা হুবহু সেই আকারে ফেরে না। ফেরে নতুন বেশে, নতুন আকারে। এই আকার বা বেশ পরিবর্তন বুঝিবার উপায় কী?

ইহা বুঝিতে হইলে মনের কাঠামো বা গঠন (structure) সম্পর্কে পূর্বসিদ্ধান্ড় করিতে হইবে। এইখানে আমরা আলোচনা সংক্ষেপে করিবার খাতিরে শুদ্ধ জাক লাকাঁর প্রস্ড়াব বয়ান করিব। লাকাঁর বয়ান মোতাবেক বলিতেছি যেখানে দমন সফলভাবে করা সম্ভব হয় সেখানে মনের গঠন হয় নিউরোসিস (বা স্নায়ুরোগ) আকারে। আর যে সকল জায়গায় তাহা সম্ভব হয় না সেখানে অন্য গঠনের মন ধরিয়া লইতে হইবে। সাইকোসিস বা উন্মাদনারোগে দমন ঘটে না, সেখানে ঘটে ক্রোক বা ফোরক্লোজার (foreclosure)। আর পারভার্সন বা বিকাররোগে ঘটে অস্বীকার বা ডিস্য়েভাউয়াল (disavowal)।

এইখানে মনে রাখিবার কথা একটাই। যাহাকে দমন করা হইতেছে তাহা ভাষা বা প্রতিনিধি মাত্র। ইহার পরিচয় আমরা এতক্ষণ দিয়াছি চিন্তা, ধারণা বা স্মৃতি আকারে। ফ্রয়েড নিজেই বলিয়াছেন আবেগ বা আসল বস্তুর কোনো ধ্বংস নাই, কজেই তাহার কোনো দমনও নাই। তাহার ঘটে কেবল স্থানচ্যুতি বা রূপান্তর। দমন কথাটি প্রযোজ্য কেবল তাড়নার (দরজা পাহারাদারের) ক্ষেত্রে। দমন কেবল বাহিরের বা রূপেরঅন্ত রের বা স্বরূপের নহে।

ফ্রয়েডের আবিষ্কারের তাৎপর্য জাক লাকাঁ সবচেয়ে ভালোভাবে আমল করিয়াছেন। তাঁহার বিচার অনুসারে আদ্যদমন মানে আর কিছু নয়—খোদ ভাষা শিক্ষা। শিশুর প্রয়োজন (need) যখন চাহিদা (demand) আকারে ভাষায় ব্যক্ত হয় তখনই আদ্যদমন ঘটে। শিশু যখন 'মা' শব্দটি উচ্চারণ করে তখন কিছু একটার বিনিময়ে মা শব্দটি তার মুখে উঠে আসে। ঐ কিছু একটাবা শূন্যদমনের নামই আদ্যদমন। ইহা অনেকটা 'ঈশ্বর' শব্দের বেলায়ও প্রযোজ্য। সবকিছুর একজন স্রষ্টা থাকিতে হইবে তাই একজন স্রষ্টা ছাড়া এই বিশ্ব হইতে পারে না। এহেন কথা যখন বলি তখন প্রশ্ন হয় স্রষ্টা ছাড়া কিছু থাকিতে না পারিলে খোদ স্রষ্টা কি করিয়া থাকিতেছেন? তখন আমাদের বলা হয় এই প্রশ্ন করা যাইবে না। এই অপারগতারই অপর নাম লাকাঁ কহিতেছেন আদ্যদমন। সত্যের সত্য কী তাহা বলা যাইবে না। অর্থাৎ ভাষার সেই ক্ষমতা নাই। ইহা মন গঠনের আগের বিষয়।

কিন্তু মন গঠনের পর যাহা দমন করা হয় তাহা আমাদের অপেক্ষাকৃত বেশি পরিচিত। এখানেই স্বপ্ন, এখানেই ঠাট্টা, এখানেই ভুলভ্রান্তি। এখানে দমন আর দমনের পর দমিতের প্রত্যাবর্তন (return of the repressed) একই কথা। দমন মানে এখানে রূপক 'এটা তোর জন্মদাতা জনকের জীবনের রুগ্ন রূপান্তর'। এটা রূপক পাখির নীড়ের মতন কাহারও চোখ। পৃথিবীর তিনভাগ জলের সমান কাহারও কান্নাভেজা চোখ।

বাসনা অনন্ত বলিয়া দমনেরও অন্ত নাই। কারণ দমন ছাড়া বাসনা নাই। বাসনাই তাই বার বার ফিরিয়া আসে। কারণ আমরা জানি দমন ও বাসনা সমার্থক শব্দ।

কিন্তু দমন করে কে? জ্ঞান না অজ্ঞান? ইহার উত্তর অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। এখানে নিতান্ত সময়াভাবে লেখা শেষ করিতে হইতেছে। পাঠক-পাঠিকাগণ অসীম ক্ষমায় আমাকে দেখিতে পারিবেন বলিয়াই আশা রাখি।

অবদমন: অবয়ব বিশ্লেষণ

ফ রী দু ল আ ল ম

জন্মের পর মানুষ যখন তার নিজের সত্তা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়, তখন সে পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধকে উপভোগ করার স্পৃহা নিয়ে এগিয়ে চলে। আবার নানা কারণে তার এগিয়ে চলার স্বাভাবিক গতি ব্যাহতও হয়। শারীরিক অসুস্থতা, সামাজিক বাধানিষেধ, নিজের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি বিষয় প্রার্থিত বা ঈপ্সিত বস্তু লাভের ক্ষেত্রে তাকে বঞ্চিত হতে হয়। এছাড়া কখনো কখনো তার মানসিক অসুস্থতা এ-পৃথিবীতে তার সুস্থভাবে চলার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার অক্ষমতা, অহেতুক আতঙ্ক, ভ্রান্ত বিশ্বাস, আজেবাজে চিন্তা এবং বাস্তবতার সাথে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলা প্রভৃতি কারণ তার স্বাভাবিক জীবনের অবাধ চলার পথকে পিচ্ছিল করে তোলে। কারণগুলোর জন্য আমাদের বাহ্যিক আচরণ ও ব্যবহারে যে পরিবর্তন দেখা দেয়, তাকেই আমরা স্বাভাবিক ও সুস্থ মানুষের অস্বাভাবিকতা হিসেবে গণ্য করে থাকি।

মানুষের অস্বাভাবিক ব্যবহারের এ ধরনের মূল্যায়ন উপলব্ধি করতে অনেক সময় লেগেছে। অনেক পথ পেরিয়ে, অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে, অনেক বিরূপ মনোভাবকে সপক্ষে এনে আমরা মানুষের অস্বাভাবিক আচরণকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করতে পারছি।

সেদিক থেকে পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত এসব অস্বাভাবিক ব্যবহারের মানুষদের অবস্থা খুব শোচনীয় অবস্থায় ছিল। বিশেষ করে মানসিক রোগে আক্রান্ত মহিলাদের ডাইনি হিসাবে আখ্যায়িত করে প্রকাশ্য আদালতে বিচারের মাধ্যমে পুড়িয়ে কিংবা বিভিন্ন যন্ত্রণাকর পদ্ধতিতে মেরে ফেলা হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফরাসি চিকিৎসক ফিলিপ পিনেল (PHILIPPE PINEL) মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের চিকিৎসায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সরকারী মহলকে তিনি বোঝাতে সক্ষম হন যে, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা যেহেতু কোনো ধরনের দোষের কারণে অপরাধী নয় সেহেতু তাদের আটকাবস্থা থেকে মুক্ত করে নিরাময়ের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় হবে। এই মানবদরদী চিকিৎসকের এ ধরনের উদ্যোগে অনেক মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে তাদের নিজ নিজ পরিবারে ফিরে যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের রোগ নিরাময়ের লক্ষ্যে অনেক কিছুর ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু সেগুলো তাদের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না। পরবর্তীকালে মানসিক ব্যাধির সুষ্ঠু চিকিৎসার জন্য মানসিক ব্যাধির বিশ্লেষণসহ ব্যাখ্যা প্রদান করা শুরু হল। বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের প্রথম ধাপ ছিল রোগের শ্রেণীবিন্যাস করা। রোগের লক্ষণ অনুযায়ী মানসিক ব্যাধির শ্রেণীবিন্যাস করার প্রয়োজনে মনোচিকিৎসকগণ বিভিন্ন প্রকল্পের সাহায্য গ্রহণ করতে শুরু করেন।

এ সময়কালে শারীরবৃত্ত বিজ্ঞান হিসেবে খুব উন্নত হয়নি এবং মানুষের মস্তিষ্ক ও শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ তখনও সম্ভব হয়নি। চলমান সময়ের চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতি রেখে এ সময়ের মনোচিকিৎসকরা যে কোনো মানসিক ব্যাধির কারণ হিসেবে কেন্দ্রীয় স্নায়বিকতন্ত্রে গোলযোগ আছে কিনা তা-ই খুঁজতে সচেষ্ট হতেন। জার্মান মনোচিকিৎসক গ্রেইসিঙ্গার (GRIESINGER, ১৮১৭-১৮৬৮) ১৮৪৫ সালে তাঁর বিখ্যাত 'মানসিক ব্যাধি ও তার চিকিৎসা' গ্রন্থে বিশেষ জোরের সাথে উল্লেখ করেন যে সকল ধরনের মানসিক ব্যাধি-ই হচ্ছে শারীরিক ব্যাধি এবং মস্তিষ্কবিকৃতির ফলেই এ সকল ব্যাধির সূচনা হয়ে থাকে। ফরাসি মনোচিকিৎসক ম্যাগনান (MAGNAN, ১৮৩৫-১৯১৬) এবং মোরেল (MOREL, ১৮০৯-১৮৭৩) উল্লিখিত গ্রন্থের বক্তব্য সমর্থন করেন। কিন্তু গ্রেইসিঙ্গার-এর এই বক্তব্য কোনো প্রমাণসাপেক্ষ উপাত্তের দ্বারা সমর্থিত হয়নি। অনেকটা বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যান্য উপাত্তের সাথে তুলনা করে গ্রেইসিঙ্গার তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

এ পর্যায়ে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা যখন বেশ প্রচারণা পেতে শুরু করল তখন মনোচিকিৎসকরা বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে

আসতে লাগলেন। শারীরবৃত্তীয় ঘটনা ছাড়াও মানুষের বিফলতা, আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপর্যস্ততা প্রভৃতি মনোবৃত্তীয় (PSYCHOLOGICAL) ঘটনাগুলো যে মানসিক রোগের কারণ হতে পারে– মনোচিকিৎসকরা এ বিষয়গুলো ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে লাগলেন।

১৮৫৬ সালের ৬ মে তৎকালীন অস্ট্রিয়ার মোরাভিয়া নামক স্থানে {বর্তমানে চেক প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত} সিগমুন্ড ফ্রয়েড (SIGMUND FREUD) জন্মগ্রহণ করেন। বিজ্ঞানী হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে গিয়ে শেষপর্যন্ত তিনি স্নায়ুতত্ত্ব (NEUROLOGY) বিষয়ে আগ্রহী হয়ে পড়েন এবং শিক্ষা সমাপ্ত হলে স্নায়ুবিদ হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন। স্নায়ুতত্ত্বের প্রতি আগ্রহ-ই শেষপর্যন্ত তাঁকে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় উদ্বুদ্ধ করে। মানসিক চিকিৎসায় প্রযৌক্তিক দক্ষতা অর্জন করার জন্য ফ্রয়েড ফ্রান্সের মনোচিকিৎসক জিন এম. চারকোট (ঔউঅঘ গ. ঈঐঅজঈঙঞ)-এর অধীনে শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং হিপনোসিস (HYPNOSIS) পদ্ধতি প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন করেন। ভিয়েনায় এসে তিনি মানসিক রোগ, বিশেষ করে হিস্টিরিয়া (HYSTERIA)-র চিকিৎসার জন্য হিপনোসিস পদ্ধতি প্রয়োগ করতে শুরু করেন।

ফ্রয়েড লক্ষ্য করেছিলেন, হিপনোসিস পদ্ধতির সাহায্যে কোনো কোনো রোগ নিরাময় করা সম্ভব হলেও সে রোগের সমস্ত লক্ষণগুলোর পরিপূর্ণ নিরাময় সম্ভব হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যান্য উপসর্গও দেখা দেয়। এ অবস্থায় ফ্রয়েড তাঁর রোগীদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করতে থাকেন যাতে তারা সজ্ঞানে তাদের আবেগময় অভিজ্ঞতাগুলো বর্ণনা করে। শান্ত-সমাহিত পরিবেশে নিরুদ্‌বিগ্ন রোগীরা যাতে তাদের মনের সকল অনুভূতি-অভিজ্ঞতা বলে যেতে পারে তার জন্য ফ্রয়েড বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এবং উদ্ভাবিত এ পদ্ধতিটির নাম 'ফ্রি এসোসিয়েশন' {FREE ASSOCIATION} প্রদান করে তিনি পর্যায়ক্রমে 'মনঃসমীক্ষণ' মতবাদ গড়ে তোলেন। মনঃসমীক্ষণ যদিও একটি চিকিৎসাপদ্ধতি হিসেবেই বিশেষভাবে পরিচিত কিন্তু এটি 'অস্বাভাবিক আচরণ' সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ। সহজ কথায় বলা যায়, মনঃসমীক্ষণ হচ্ছে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অনুসরণের একটি সুষ্ঠু চিন্তাধারা।

দুই

ফ্রি এসোসিয়েশন পদ্ধতির সাহায্যে রোগী যখন সবকিছু ব্যক্ত করতে থাকে তখন ফ্রয়েড লক্ষ্য করেন যে রোগী নির্বিবাদে সমস্ত কিছু বলতে পারে না। কোনো-এক অজ্ঞাত বাধা তার অভিজ্ঞতার অবাধ বর্ণনায় অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। এরূপ বাধাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়েই ফ্রয়েড অবদমন (REPRESSION) ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফ্রয়েডের মতে এরূপ অবদমনের সাহায্যেই রোগী তার ব্যক্তিত্বকে অসহনীয় বেদনার যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে। রোগীর অভিজ্ঞতায় এমন কিছু থাকে যা অন্যের কাছে সহজে প্রকাশ করা যায় না। ফ্রয়েড মনে করেন যে রোগীর এরূপ অভিজ্ঞতা হয়তো সমাজবিরোধী অথবা নৈতিকতা-বহির্ভূত। ব্যক্তির চাওয়ার সাথে পাওয়ার সঙ্গতি না থাকার কারণ এটা হতে পারে যে– এরূপ চাওয়া হয়তো সমাজ অনুমোদন করবে

না। এরূপ অনেক স্পৃহা ব্যক্তির ব্যবহারকে প্রভাবান্বিত করে। ফ্রয়েড এসব স্পৃহাকে 'অচেতন প্রেষণা' (UNCONSCIOUS MOTIVATION) আখ্যা প্রদান করেন। ফ্রয়েডের এই অবদমন তত্ত্ব ব্যক্তিত্বের মতবাদে এক বিরাট আলোড়ন জাগায়। ফ্রয়েডের এ তত্ত্ব তদানীন্তন নৈতিকতার ধারক-বাহক সমাজব্যবস্থায় বিশাল বিস্ফোরণ ঘটায়।

যখন কোনো একটি উত্তেজনা বা আবেগের সফল উদ্গতি সম্ভব হয় না তখন সেটি অবদমিত (REPRESSED) হয়। মানসিক সংঘাতকে এড়িয়ে যাবার একটা অবাঞ্ছিত উপায় হল অবদমন। তবে অবদমন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ (SUPRESSION) মোটেও এক জিনিস নয়, অনেকেই ভুলক্রমে দুটিকে এক করে দেখেন।

আত্মনিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সেই অবস্থা– যখন আমাদের মধ্যে যে আবেগ বা উত্তেজনা জেগেছে, এ সম্পর্কে আমরা সচেতন, যদিও এর প্রকাশকে আমরা অস্বীকার করি এবং আমাদের সচেতন চিন্তাধারার ওপর এর আধিপত্য বিস্তারে বাধা প্রদান করি।

অন্যদিকে, অবদমনের ক্ষেত্রে আমরা একটি অবাঞ্ছিত মনোভাব বা প্রবণতার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চাই। যখন আমরা কোনো আবেগ বা উত্তেজনা সম্পর্কে অবহিত হই– বিশেষ করে যেটি আমাদের আত্মমর্যাদার পক্ষে হানিকর, তখন আমরা এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করি এবং চেতনার সজ্ঞান স্তর থেকে একে বহিষ্কার করতে সচেষ্ট হই। যদি আমাদের প্রচেষ্টা সফল হয় তাহলে যে আবেগ বা উত্তেজনার অস্তিত্বকে আমি স্বীকার করতে চাইছি না, সেটি মনের নির্জ্ঞান স্তরে চলে যায়– সেটি মনের সজ্ঞান স্তরে উঠে আসে না।

উত্তেজনা, আবেগ, বিভিন্ন সেন্টিমেন্ট যেমন ঘৃণা, ঈর্ষা ইত্যাদি অবদমিত হতে পারে। অবদমিত সেন্টিমেন্টকে মনোবিজ্ঞানীরা কমপ্লেক্স (COMPLEX) নামে অভিহিত করেন।

কোনো অভিজ্ঞতা অপ্রীতিকর হলে সেই অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে আমরা অবদমিত করি না। কিন্তু যে অভিজ্ঞতা আত্মমর্যাদাহানিকর– সেগুলো স্মরণ করে কেউ আমাদের মধ্যে আনন্দ লাভ করে না। কোনো-এক পরিস্থিতিতে নিজের মূর্খতা প্রকাশিত হয়ে পড়া কিংবা কারও সাথে খারাপ আচরণ করা অথবা কোনো কাজে পর্যায়ক্রমিক ব্যর্থতা– এসব অপমানজনক অভিজ্ঞতার স্মৃতি আমরা অবদমন করতে চাই। আমরা সে-সব অভিজ্ঞতাগুলোকেও অবদমন করতে চাই যেগুলো বর্তমানের পক্ষে আনন্দজনক কিন্তু পরবর্তীকালে সেই অভিজ্ঞতাগুলোর স্মৃতি মনের মধ্যে লজ্জা জাগিয়ে তুলতে পারে। একইভাবে যেসব উত্তেজনা ও বাসনার পরিতৃপ্তি সম্ভব নয় কিংবা যেসব উত্তেজনা ও বাসনার পরিতৃপ্তি আসার কোনোই সম্ভাবনা নেই– সেগুলোকেও অবদমিত করি– কারণ সেগুলোর অনুভূতি আমাদের মনে লজ্জার ভাব জাগিয়ে তোলে। ফ্রয়েড অবদমন-কে অপরাধবোধের সাথে সংযুক্ত করেছেন– ফ্রয়েড যে-কোনো লজ্জার অনুভূতি, আত্মভর্ৎসনা বা ব্যক্তির অযোগ্যতাকে নির্দেশিত করতে যেয়ে 'অপরাধবোধ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

ফ্রয়েড বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে অধিকাংশ মানসিক রোগ-ই অবদমন থেকে সৃষ্ট। সেজন্য তিনি ব্যক্তির অচেতনের অবদমিত তথ্য ও চিন্তাগুলো আবিষ্কার করার জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। অচেতনের স্বরূপ নির্ণয়ের এ পদ্ধতিটির নাম দেওয়া হয়েছে সাইকো-এনালাইসিস (PSYCHO-ANALYSIS)। অচেতনের বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের উদ্ভাবিত পদ্ধতিগুলোর অন্যতম হল স্বপ্ন-বিশ্লেষণ। ফ্রয়েড-ই প্রথম আমাদের স্বপ্নের একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা দেন এবং প্রমাণ করেন যে, আমাদের অবদমিত চিন্তা ও কামনাগুলোই স্বপ্নরূপে দেখা দেয়। ফ্রয়েডের মতে, স্বপ্নগুলোর অন্তর্নিহিত রহস্য যদি জানা যায় তাহলে ব্যক্তিমানুষের মনের অজ্ঞাত চিন্তা ও কামনাগুলোর স্বরূপ জানা যাবে। ফ্রয়েড বলেছেন, স্বপ্ন হচ্ছে 'ROYAL ROAD TO THE UNCONSCIOUS– অচেতনে পৌঁছার সর্বাধিক প্রশস্ত পথ'। যার ওপর ভিত্তি করে এ পর্যায়ে মানসিক রোগ চিকিৎসায় স্বপ্ন-বিশ্লেষণের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়।

'পাছে লোকে কিছু বলে'– এ ভয় থেকেই অনেকে সমাজ-বিগর্হিত কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকে। এরূপ কোনো আকাঙ্ক্ষার চাপ মনে অনুভব করলে তাকে দমন করে সামাজিক অপবাদ থেকে রেহাই পেতে আমরা অনেকেই চেষ্টা করি। আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে লজ্জা থেকে নিজেকে বাঁচাবার তাগিদ থাকে– কিন্তু অবদমনের ক্ষেত্রে আমরা অন্য কোনো ব্যক্তি লজ্জা দেবে এই ভয়ে নয় বরং বিবেকের দংশন থেকে নিজেকে বাঁচাবার তাগিদ অনুভব করি। লোকচক্ষুর অন্তরালে সকলের অজ্ঞাতে এরূপ আকাঙ্ক্ষাপ্রসূত কোনো কাজ যদি করে ফেলে নিজেই বিবেকের দংশনে আমরা ক্ষত-বিক্ষত হই– এ ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি কথা মনে রাখতে হবে, যে-'বিবেক' শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটি অবশ্যই ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব পারিপার্শ্বিক ও নিজস্ব সমাজ-পরিমণ্ডলে গঠিত ও পরিপুষ্ট 'বিবেক', ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্থান-কাল-ভেদে এর মানদণ্ড কখনোই একরকম নয়। বিশেষ ধরনের আকাঙ্ক্ষা-যে নিজের ভেতর জন্ম নিয়েছে, সেটিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাবার একমাত্র পথ বলে সেই মুহূর্তে ব্যক্তির কাছে অনুভূত হয়।

জীবনে চলার পথে বিফলতা, আশঙ্কা, বঞ্চনা প্রভৃতি আমাদের নিত্য সহচর। এসব অপনোদনের জন্য আমরা এমন সব প্রতিক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করি যা আশঙ্কা-উৎপাদনকারী ঘটনা বা পরিস্থিতি থেকে আমাদের ব্যক্তিত্বকে সাময়িকভাবে রক্ষা করে। ব্যক্তিত্বকে রক্ষাকারী এসব প্রতিক্রিয়া বা প্রতিরক্ষা-কৌশলের মধ্যে অবদমন একটি প্রধান কৌশল। আমরা প্রত্যেকেই ব্যক্তি-জীবনে অনেক ক্ষেত্রে ও অনেক সময়েই এরূপ প্রতিরক্ষা-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকি। এ কারণে বর্তমান শতাব্দীর অনেক সমাজতাত্ত্বিকের মতে এ বর্ণনাটি পাওয়া যায় যে, বর্তমান সভ্যতা তথা মেকি ভদ্রতার মুখোশ-পরা মূল্যবোধবিশিষ্ট সমাজব্যবস্থা মূলত ব্যক্তির অবদমনের কারণেই টিকে রয়েছে। ব্যক্তির প্রতিরক্ষা-কৌশলের অন্যতম পন্থা অবদমন যদি হয় সাময়িক এবং পরবর্তীকালে ব্যক্তি যদি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে তাহলে তা কখনো অস্বাভাবিক ব্যবহার হিসেবে প্রতিভাত হয় না এবং অবদমনকারী

ব্যক্তি মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয় না। কিন্তু অবদমন যখন আমাদেরকে বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী-সম্বলিত মানসিকতা দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো দৃঢ়তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তখনই ব্যক্তির ব্যবহার অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে আর সে অবস্থায় তাকে মানসিক রোগী হিসেবে বিবেচনা করার যথেষ্ট কারণ মূর্ত হয়ে ওঠে।

শৈশব এবং শৈশবের স্মৃতি ব্যক্তির জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরনির্ভরশীলতা, বঞ্চনা এবং এর বিপরীতে আত্মনির্ভরশীলতা, নিয়মানুবর্তিতা শিশুর জন্য পরবর্তী জীবনের ব্যক্তিত্ব তৈরিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। কামপ্রেষণার বিকাশ ও সুষ্ঠু উত্তরণ, আক্রমণাত্মক মনোভাব এবং তার যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণ–এ ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু সমাধানের ভিতরেই নিহিত থাকে পরবর্তী জীবনের ব্যক্তিত্বের সার্থক বিকাশ। এ ঘটনাগুলোকে কার্যকরভাবে সমাধান না করতে পারলে ব্যক্তি পরবর্তী জীবনে গুরুতর অবদমনের দিকে চালিত হয়– যা পরিণতিতে তাকে মানসিক রোগীতে রূপান্তরিত করে।

শৈশবের কামপ্রেষণা শিশুর পরবর্তী জীবনের পথের নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে চালকের ভূমিকা গ্রহণ করে। ফ্রয়েডের মতে, শৈশব থেকেই কামপ্রেষণা দ্বারা মানুষের ব্যবহার প্রভাবান্বিত হয়। এর আগে সবার বিশ্বাস ছিল যে, বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছার আগ পর্যন্ত কারও ভিতরে কামপ্রেষণার উদ্ভব হয় না। যদি কখনও কারও ভিতর বয়ঃসন্ধির পূর্বেই কামপ্রেষণার বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হত– তাহলে তাকে অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের অধিকারী শিশু হিসেবে ধরে নেয়া হত। ফ্রয়েড এর বিশদ অনুসন্ধান করে দেখলেন যে, শৈশবে কামপ্রেষণা শিশুর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকে। শিশু প্রথম কামসুখ অনুভব করে তার মুখ এবং মুখ-গহবরকে উত্তেজিত করার মাধ্যমে। প্রথম বছরের শেষে শিশুর কামশক্তি তার পায়ুপথে স্থানান্তরিত হয়। চতুর্থ বছরে শিশু তার লিঙ্গ নিয়ে নাড়াচাড়া করে কামসুখ লাভ করে। শিশুর কামসুখ অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কামসুখের অনুরূপ নয় এবং কামোদ্দীপনার শেষে কোনো কর্মোদ্দীপক কামরসের নিঃসরণও শিশুর ক্ষেত্রে ঘটে না। [৬] থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর জীবনে কামপ্রেষণা সুপ্ত থাকে। ১২ বছরের পরে শিশু বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হয় আর তখনই তার কামপ্রেষণা সম্পূর্ণভাবে আপন প্রভাব বিস্তার করে।

শিশুর এই কামপ্রেষণা বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় যদি বিঘ্নিত হয় তা হলে শিশুটি পরবর্তী জীবনে নানাধরনের অবদমনের শিকার হয় ও তার মধ্যে অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের উদ্ভব হতে পারে। এ ধরনের শিশুর আদিসত্তা আনন্দ বা সুখনীতির দ্বারা অন্ধভাবে পরিচালিত হয়ে তার সব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চায়। আর আদিসত্তাজাত অনেক চাওয়া কিংবা আকাঙ্ক্ষা-ই সমাজের কাছে বাঞ্ছিত নয়। অবাঞ্ছিত চাওয়া-কে অবদমিত করা ছাড়া এ ধরনের ব্যক্তির অহমের আর কোনো গত্যন্তর থাকে না। অবদমনের প্রধান কাজই হল চেতন মন থেকে এরূপ চাওয়া-র নির্বাসন প্রদান করা। অবদমিত ইচ্ছা চেতন মন থেকে নির্বাসিত হলেও ব্যক্তিত্ব থেকে নির্বাসিত হয় না– অচেতনে তা বাসা বাঁধে। সময় এবং সুযোগ পেলেই তারা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অবদমন অনেক সময় দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদনে বিঘ্ন ঘটাতে পারে– যার কামপ্রবৃত্তি অবদমিত

হয়েছে, কামপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে তার উদ্বেগ অথবা আশঙ্কা এমন তীব্র হতে পারে যে, এক পর্যায়ে সে যৌনক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে।

শৈশবে কামপ্রেষণা-বিঘ্নিত শিশুর পরবর্তী জীবনে যখন বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ কোনো কারণে তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সাহায্যে তৃপ্তিসাধন অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন সে কোনো কোনো সময়ে ও ক্ষেত্রে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার মতো পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। তার প্রার্থিত বা আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটির অনুরূপ কোনো বস্তুর বা বিষয়ের সাহায্যে সে তার প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধনের চেষ্টা চালায়। অনুরূপ প্রথম বস্তু বা বিষয়টিতে পৌঁছার পথে সে প্রতিবন্ধকতা অনুভব করলে পরবর্তী অনুরূপ অর্থাৎ দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থ বস্তু বা বিষয়ের প্রতি তার মনোযোগ নিবদ্ধ করে। প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধনের অর্থই হল প্রবৃত্তিপ্রসূত উত্তেজনা বা অস্বস্তির উপশম। আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সাহায্যে উত্তেজনার উপশম যতখানি হতে পারত, অনুরূপ বস্তু বা বিষয়ের সাহায্যে উত্তেজনা ততটুকু উপশম না হওয়ায় এই পর্যায়ে সে একদফা অবদমনের শিকার হয়। আবার আকাঙ্ক্ষিত মূল বস্তু বা বিষয় থেকে সে যত বেশি দূরে সরে যেতে থাকবে (তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বস্তু বা বিষয়ের ক্ষেত্রে) তার উত্তেজনার উপশম ততই কম হয়ে যেতে থাকে– পরিণতিতে সে দফায় দফায় নিজের চাওয়া-কে অবদমন করতে থাকে। তবে এ ধরনের অবদমনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি মানসিকভাবে খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না কেননা যত কম পরিমাণেই হোক না কেন, অন্ততঃ আংশিকভাবে হলেও সে তার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের বক্তব্য হচ্ছে, উত্তেজনার উপশমে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বা বিষয়ের স্থলাভিষিক্তকরণ মানুষের পক্ষে সম্ভবপর বলেই বর্তমান সভ্যতা গড়ে উঠেছে ও টিকে রয়েছে। উত্তেজনার উপশমের ক্ষেত্রে এমন বস্তু বা বিষয় আকাঙ্ক্ষিত হতে পারে যা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অনুমোদিত নয়– এরূপ ক্ষেত্রে প্রচলিত সমাজ দ্বারা অনুমোদিত বস্তু বা বিষয়কে ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু বা বিষয়টির স্থলাভিষিক্ত করে নেয়। কিন্তু এত কিছুর পরেও কিছু-না-কিছু উত্তেজনা থেকেই যায়। এরূপ উত্তেজনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবদমনের পরিবর্তে স্নায়বিক দুর্বলতা বা চঞ্চলতার মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে। সমাজে কার্যকরভাবে বাস করতে হলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে আমাদের খাপ-খাইয়ে চলতে হয়। এরূপ খাপ-খাইয়ে চলা-কে অনেকেই আপোষকামিতা হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং বলে থাকেন যে, সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার দাবি মেটাতে গিয়ে ব্যক্তিকে সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে মানিয়ে চলতে হয়– এ অবস্থায় ব্যক্তিকে প্রতি পদে পদেই তার ইচ্ছাগুলোকে অবদমন করতে হয়। কিন্তু এ ধরনের সাধারণীকরণ অবশ্যই সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়– খাপ-খাইয়ে চলার ধারণাটিকে ব্যাপক অর্থে বিবেচনায় আনলে এ বিষয়টি এভাবে বিশ্লেষণ করা যায়– সমাজ ও পরিবেশের যেমন দাবি আছে ব্যক্তির ওপর, তেমনি ব্যক্তিরও দাবি আছে সমাজ ও পরিবেশের ওপর; শুধুমাত্র প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও কৃষ্টি ব্যক্তিকে প্রভাবান্বিত করে না, ব্যক্তিও সমাজ ও কৃষ্টির ভেতর পরিবর্তন আনতে পারে। ব্যক্তি প্রতিমুহূর্তে তার পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে আসে– এরূপ সংস্পর্শের ফলে ব্যক্তি যেমন পরিবেশের ও পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনজনিত কারণে পারিপার্শ্বিকের সাথে নিজেকে

খাপ-খাইয়ে নিচ্ছে তেমনি ব্যক্তির অনেক দাবির জন্য পারিপার্শ্বিকেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। পারিপার্শ্বিকের সাথে যে ব্যক্তি সর্বাধিক সুষ্ঠুভাবে নিজেকে খাপ-খাইয়ে নিতে পারে, সে ব্যক্তির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অবদমনের প্রয়োজন খুবই কম ক্ষেত্রে ঘটে থাকে।

তিন

মনোবিশ্লেষণের পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং অবদমনের বিষয়টি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে ফ্রয়েড সভ্য মানুষের এযাবৎ কালের সবচেয়ে বড় অহংকার হিসেবে গণ্য হওয়া বিষয়–'সচেতন যুক্তিবাদ'–এর অভ্রান্ততার মূলোচ্ছেদ করেছেন। সচেতন যুক্তিবাদ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিমানুষের সত্য গোপনের একটি উপকরণ মাত্র। সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখতে এই উপকরণটির গুরুত্ব অপরিসীম। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন– অবদমন জনিত মনোরোগের মূল বিষয়টি পারিবারিক ব্যবস্থার অসঙ্গতির মধ্যে নিহিত থাকে। আবার ব্যক্তিবিশেষের পরিবার নির্দিষ্ট একটি সমাজব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত– যা প্রত্যাশিত আচরণের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেয়। ব্যক্তিমানুষের নীতি প্রণয়নের কোনোই সুযোগ এক্ষেত্রে থাকে না– এ নীতিনির্ধারণ করে দেয় সমাজ ও পরিবারের ক্ষমতাশীল মানুষেরা। সেই নীতির সাথে ব্যক্তিমানুষের সংঘাত বাঁধলে ব্যক্তির পক্ষে বাইরের দিকে দমন ও ভিতরের দিকে অবদমন করা ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না। এ ধরনের দো'টানার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে, উভয় ধরনের শাসন মেনে নিয়ে যে ব্যক্তি সামাজিক প্রত্যাশা পূরণ করে যেতে পারে– সে-ই সুস্থ ব্যক্তি, আর এক্ষেত্রে অক্ষমতার পরিণতি হচ্ছে মানসিক অসুস্থতা। ফ্রয়েডের অবদমন তত্ত্ব মানুষকে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উৎসাহী করার চাইতে মানুষকে আরও বেশি 'মানিয়ে চলা'য় অভ্যস্ত করে তুলল।

মানবমনের বিকারক্লিষ্ট রূপ এবং মানুষের বিকারগ্রস্ত মনোভূমির রহস্যজটিল আচরণ উন্মোচনের ফ্রয়েডীয় উদ্ভাবন শিল্প-সাহিত্যকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই শিল্পে মনোবিশ্লেষণের ব্যবহার এবং অবদমনপ্রসূত ক্রিয়াকর্মের সাহায্য গ্রহণ করা স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকৃত হয়েছে। ১৯১০ সাল থেকেই সাহিত্য আলোচনায় ব্যক্তির অবদমনের বিশ্লেষণ শুরু হয়েছিল। একেবারে কাছাকাছি সময়ের সাহিত্যিকরা সাহিত্যে মনোবিশ্লেষণের ব্যবহার সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত ও সতর্ক ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও টমাস মান (১৮৭৫-১৯৫৫)-এর ১৯২৪ সালে প্রকাশিত উপন্যাস ('THE MAGIC MOUNTAIN') এবং ডি.এইচ.লরেন্স (১৮৮৫-১৯৩০)-এর ১৯১৩ সালে প্রকাশিত উপন্যাস ('SONS AND LOVERS') –এ মানবমনের অবদমিত চিন্ড়াভাবনার প্রত্যক্ষ ব্যবহার করা হয়েছে বলে সমালোচকরা লক্ষ্য করেছেন। পরবর্তীকালে ১৯৩১ সালে প্রকাশিত ইউজিন ও' নীল (১৮৮৮-১৯৫৩)-এর ('MOURNING BECOMES ELECTRA') নাটকে মনোবিশ্লেষণের সচেতন প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকেই নির্জ্ঞানের তথা অবদমিত চিন্তা-ভাবনার অনুভাবন ও স্বপ্নে-দেখা প্রতীকের সৃষ্টিশীল ব্যবহার সাহিত্যের

ভাষা, কাহিনী ও গঠনরীতিতে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন আনে। সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের সাথে জড়িত শিল্পী-সাহিত্যিকরা সাহিত্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধিতে সক্রিয়ভাবে মানবমনের অবদমিত চিন্তাগুলোকে তুলে ধরতে শুরু করেন। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস জেমস্ জয়েস (১৮৮২-১৯৪১)-এর ULYSSESEএবং FINNEGANS WAKE এ-ধরনের সাহিত্যকর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

বাংলাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) বিংশ শতাব্দীর আলোড়ন সৃষ্টিকারী মনোবিজ্ঞানীদের– বিশেষভাবে ফ্রয়েড-এর চিন্তা-চেতনা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। মানুষের অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের মূলে ফ্রয়েড-আবিস্কৃত অবদমন-তত্ত্বের ভূমিকাকে তিনি তাঁর প্রচুর ছোটগল্পে স্থান করে দিয়েছেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখায়– দর্শন থেকে সমাজতত্ত্ব পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ-তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। মানবমনের অবদমনের বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছে সমাজবিজ্ঞানীদের। ফ্রয়েড-এর অবদমন-তত্ত্ব সমালোচনার উর্ধ্বে না থাকলেও, মনোবিশ্লেষণের বিষয়টি আভ্যন্তরীণ মতদ্বৈধতার অধিকারী হলেও– এটি আলোচনার একটি বিশিষ্ট ধারার তথা ডিসকোর্সের জন্ম দিয়েছে। বস্তুত 'উত্তর-আধুনিকতা' বিষয়টি এই আলোচনা-ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল। উত্তর-আধুনিকতা'র সকল সূত্রকেই কোনো-না-কোনোভাবে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে আধৃত করা সম্ভবপর। উত্তর-আধুনিকতা ধারার প্রধান তিনটি স্তম্ভ হিসেবে বর্তমান বিশ্ববাসী ফুকো, দেরিদা ও লাঁকা-কে বিবেচনা করে থাকেন। লাঁকা-র মতে, মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্ঘাটিত মানবমনের অবদমিত চিন্তাগুলোর উপরে উঠে আসার বিষয়টি ভাষার সহজপ্রবৃত্তির বিশুদ্ধ রূপটি তুলে ধরতে সাহায্য করেছে। দেরিদা পেশাগতভাবে মনোবিশ্লেষক না হলেও তিনি ফ্রয়েডের অবদমন-তত্ত্বের অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যাতা হিসেবে স্বীকৃত। বিশেষত দেরিদা তাঁর প্রস্তাবিত 'ডেফারাল-তত্ত্বে' এ-ধরনের সাযুজ্য দেখিয়েছেন যে, মনোবিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তির অবদমিত চিন্তাভাবনা তথা মনের 'স্থগিত করে রাখা' কর্মের যে উদ্ঘাটন করা হয়ে থাকে তার সঙ্গে এগুলোর ব্যাখ্যা এবং পরবর্তীকালে ব্যক্তির অন্যকোনো ক্রিয়াসংঘটনের পরে তার কারণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের যোগসূত্র রয়েছে।

ফুকোর প্রথম দিকের লেখাগুলোতে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বসমূহের মধ্যে বিশেষ করে অবদমন-তত্ত্ব বিষয়ে সামান্য বিরূপতা লক্ষ্য করা গেছে। ক্রমশ তিনি ক্ষমতার অনুশীলনে সামাজিক প্রক্রিয়া ও জ্ঞানচর্চা-সংগঠনের পারস্পরিক সম্পর্কের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিতে শুরু করে নিজের অবস্থান বদলাতে থাকেন। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত THE ORDER OF THINGS গ্রন্থে প্রাক্-আধুনিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই সম্বন্ধের রূপান্তরের আলোচনা প্রসঙ্গে ফুকো বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যে দুটি শাখা পূর্ববর্তী জ্ঞানচর্চার ধারাটিকে আমূল বদলে দিয়েছে বলে দাবি করলেন– তার একটি হচ্ছে ফ্রয়েড-উদ্ভাবিত মনোবিশ্লেষণ এবং অপরটি হচ্ছে নৃতত্ত্ব। ফুকোর মতে, সমাজ এতদিন মানুষের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক আচরণের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য নির্দেশ করে এসেছে– ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতি তার ভিত্তিভূমিকেই আঘাত

করেছে। ফ্রয়েড তাঁর অবদমন-তত্ত্বে বলেছেন যে, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক আচরণের এ-দুটি পৃথক অবস্থার মধ্যে স্পষ্ট কোনো বিভাজন করা সম্ভব নয়– এরা একটি অবিচ্ছেদ্য পারম্পর্যসূত্রে গ্রথিত। ফুকো মনে করেন, মানবমনের স্থিতাবস্থার প্রতি অসন্তোষ এবং তাকে অনবরত প্রশ্নবিদ্ধ করে যাবার প্রবৃত্তি ফ্রয়েড-উদ্ভাবিত মনোবিশ্লেষণের সবচেয়ে বড় অবদান। ফুকোর জীবনের শেষ গবেষণাকর্ম THE HISTORY OF SEXUALITY-র প্রথম খণ্ডে ফ্রয়েডের এই অনুসন্ধান-পদ্ধতিকে ফুকো মনোবিশ্লেষণের প্রত্নতত্ত্ব নামে অভিহিত করেছেন।

ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণের অনেক তত্ত্ব-ই– বিশেষভাবে অবদমন-তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষাগারে অনেকভাবে প্রমাণ করা ও খণ্ডন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এসব পরীক্ষার ফলাফল-সম্বলিত বইপুস্তকও প্রচুর। এ ধরনের বইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পল ক্লাইনের লেখা ১৯৭২ সালে প্রকাশিত FACT AND FANTASY IN FREUDIAN THEORY এবং আইসেন্‌ক্‌ ও উইলসন সম্পাদিত ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত THE EXPERIMENTAL STUDY OF FREUDIAN THEORIES।

মনোবিশ্লেষণ তত্ত্বের আরও বেশি বিশ্লেষণের সম্ভাবনা, অবদমন প্রয়াসের আরও গভীরতর অনুশীলনের সম্ভাবনা কিন্তু এখনও সমসাময়িকতার দাবি রাখে। সুখ ও সভ্যতার মধ্যে বিরোধাভাস সৃষ্টি করে ফ্রয়েড বিংশ শতাব্দীর মানুষকে একটা গুরুতর দ্বিধার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। গোটা বিংশ শতাব্দী জুড়ে এ নিয়ে সীমাহীন তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা-সমালোচনা হলেও এর পক্ষে কিংবা বিপক্ষে স্থির কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। বিংশ শতাব্দী এ তত্ত্বের কোনো স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন দেখাতে পারেনি কিংবা তত্ত্বগুলোর নবীকরণ ও সংযোজনের বিরোধিতা করেনি। মনোবিশ্লেষণকে সঙ্গে নিয়ে, মনোবিশ্লেষণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার অবদমন-তত্ত্বকে অবলম্বন করেই হয়তো বর্তমান একবিংশ শতাব্দী এর পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণে এগিয়ে যাবে। ফ্রয়েডের নিঃসঙ্গ সেনানীর ভাবমূর্তির সঙ্গে মিশে যাবে আরও অনেক নিরাবেগ বিশ্লেষকের অনুভাবনের ভিত্তিতে অর্জিত গ্রহণ-বর্জন।

অবদমনের মনস্তাত্ত্বিক সূত্র

সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দার

A defense mechanism and process in which certain memories and motives are not permitted to enter awareness but are operative at an unconscious level; results in a failure of retrieval of anxiety-provoking material from long-term memory. ১

অবদমন-সংক্রান্ত এ ধরনের সংজ্ঞা বিশ্লেষণের আগে আমরা জেনে নেব মানবমনের অতি বিচিত্র কিছু আগ্রহ বা কামনার কথা। ডা. সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯)- এর কাছে একদিন ফ্রাউলিন এলিজাবেথ নামে এক রোগী এসে অদ্ভুত এক কথা বললেন। ফ্রাউলিনের অতি আদরের এক বোন দীর্ঘ অসুস্থ অবস্থা শেষে মৃত্যুবরণ করেছে। বোনের প্রতি তার ছিল অসীম ভালোবাসা। কিন্তু এই নিদারুণ কষ্টের মাঝেও তার মনের ভিতর আঁধার রাতের বিদ্যুৎ চমকের মতো আলোর একটা ঝিলিক খেলে গেল। বোনের স্বামী নিয়ে তার মনের ভিতর যে অসীম আগ্রহ পোষা ছিল তা যেন হঠাৎ করে জেগে উঠল; ভাবল ঐ ব্যক্তিটির স্ত্রী হতে হয়তো তার আর বাধা থাকল না।

মানবমনের একান্তে এ ধরনের গোপন ইচ্ছা প্রচলিত মূল্যবোধ-বিবর্জিত সন্দেহ নেই। কোনো সমাজের মাপকাঠিতেই হয়তো এর গ্রহণযোগ্যতা নেই। কিন্তু মনের গোপন প্রদেশে এ ধরনের লুকানো ইচ্ছার কথা কেউ অস্বীকার করলে তা হবে সত্যের অপলাপ। বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়া রাই বিয়ের পিঁড়িতে বসার পর পৃথিবীর কোনো সক্ষম পুরুষের হৃদয়ে একটুও রক্তক্ষরণ হয়নি, এটা ভাবা শক্ত। রামলোচন বাবুর সাথে সুরবালার বিয়ের অনেক পর একদিন হঠাৎ করে দেখা হল তার। সেদিন বাল্য প্রণয়ের সব স্মৃতি সামাজিক সকল বন্ধন অতিক্রম করতে চাইল। মনের একান্তে সুসজ্জিত সেই প্রণয়াকাঙ্ক্ষা সেদিন এভাবে প্রকাশিত হল–

'আমি মানব সমাজে নূতন নীতি প্রচার করিতে বসি নাই, সমাজ ভাঙ্গিতে আসি নাই, বন্ধন ছিঁড়িতে চাইনা। আমি আমার প্রকৃত ভাবটা ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। আপন-মনে যে-সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সবই বিবেচনাসংগত। রামলোচনের গৃহ ভিত্তির আড়ালে যে সুরবালা বিরাজ করিতেছিল সে যে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশি আমার, একথা আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না। এরূপ চিন্তা নিতান্ত অসংগত এবং অন্যায় স্বীকার করি কিন্তু অস্বাভাবিক নহে।' ২

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলোর অন্যতম অস্ট্রিয়ার মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড মানবমনের অজানা গহীন প্রদেশের নানা ধরনের ক্রিয়া–প্রক্রিয়া তথা মানসিক গঠনের

এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি ব্যক্তিত্বের গঠন, মানসিক ক্রিয়া-কলাপ সংক্রান্ত নানা অভিব্যক্তি এবং মানসিক রোগের চিকিৎসাপদ্ধতি তাঁর বিখ্যাত মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) তত্ত্বে আলোচনা করেছেন অতি নিখুঁতভাবে। ডারউইন যেমন জীববিজ্ঞানে, ফ্রয়েড তেমনি মনোবিজ্ঞানে যুগান্তকারী কিছু আবিষ্কার করেছেন যা মানব ইতিহাসের জন্য অতি দুর্লভ প্রাপ্তি। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন মানুষের নানা রকম সম্পর্ক, সভ্যতা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি কিংবা মানবিক সমগ্র মূল্যবোধ গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে মানুষের আদিম যৌনেচ্ছা ও জিঘাংসার অবদমন (Repression) ও তার ক্রম-উদ্‌বর্তন (Sublimation)। তিনি বলেন, আমাদের মনের নির্জ্ঞান স্তরের গভীর প্রকোষ্ঠে সমাজ ও মূল্যবোধ-অসমর্থিত ইচ্ছাগুলো চাপা পড়ে থাকে। সামাজিক মানদণ্ডে এগুলো উতরিয়ে উঠতে না পেরে স্থান পায় চেতনার নির্জ্ঞান প্রকোষ্ঠে। বাস্তবতার কঠিন চাপে সভ্যমানুষগুলো এধরনের একান্ত মৌলিক ইচ্ছাগুলোকে নৈতিকতার একটা মোটা চাদর দিয়ে আচ্ছাদন করে রাখে যেমনি শরীরের কোনো ক্ষতস্থানকে ব্যান্ডেজ দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। তবে ফ্রয়েড মনে করেন এই ধরনের অবদমিত পাশবিক ইচ্ছাগুলো ফিরে আসে স্বপ্নে, স্বপ্ন-দৃশ্যের মধ্যদিয়ে। আমরা এই নিবন্ধে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের ভিত্তি হিসাবে অবদমনের একটা মনঃদৈহিক (Psycho-physical) বিশ্লেষণের প্রয়াস পাব এবং দেখব সামাজিক বৃহত্তর পরিসীমায় এই পাশবিক ইচ্ছাগুলোর অর্ধ-হত্যার কোনো বিকল্প নেই।

দুই

প্রচলিত খ্রিস্টিয় নৈতিকতায় ফ্রয়েডীয় মতবাদ ছিল অত্যন্ত আপত্তিকর মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তা। অনেক অধ্যাপককে চাকরীচ্যুত করা হয়েছে ফ্রয়েডের মতবাদ প্রচার করার জন্য। আবার এই মতবাদ প্রয়োগ করার কারণে কাউকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বনন্দিত পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইন একদিন ফ্রয়েডকে লিখলেন...

'এ-যুগের অন্যতম শিক্ষকদের একজন হিসেবে এ-যুগের মানুষ আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারছে বলে আমি খুব আনন্দিত...। কিছু দিন আগে পর্যন্ত আমি শুধু আপনার চিন্তা-শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারতাম এবং বর্তমান যুগের বিশ্ব-বীক্ষার ওপর এর কত প্রচণ্ড প্রভাব আছে তা বুঝতে পারতাম;– এর মধ্যে কতটা সত্য লুকিয়ে আছে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম না। যা হোক বেশি দিন আগের কথা নয়, আমার কতগুলো সাধারণ কথা শোনার সুযোগ হয়েছিল। আমার মতে সেগুলোকে আপনার অবদমন-মতবাদ (Theory of repression) ভিন্ন অন্য কোনো উপায়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।[৩] আবার রাসেল বলেছেন, ... 'স্বীকারোক্তি করছি যে গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝছি, আগে ফ্রয়েডের মতবাদ যতটা সত্য মনে করতাম এখন দেখছি তার চেয়ে বেশি সত্য।'

আসলে ফ্রয়েডের মতবাদের বিশিষ্টতা কোথায় তা জানতে আমরা তার মনঃসমীক্ষণের মূল বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রাখব। আর এর মধ্য দিয়ে আমরা পাব

অবদমন-সংক্রান্ত যুগান্তকারী মতবাদের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে–

ক. ব্যক্তিত্বের কাঠামো সংক্রান্ত মতবাদ;
খ. ব্যক্তিত্বের চলমানতা সংক্রান্ত মতবাদ; ও
গ. মন-জৈবিক উন্নয়ন।

ফ্রয়েড ব্যক্তিত্বের কাঠামো ব্যাখ্যা করতে যেয়ে মানবমনের উদ্দেশ্যগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন– অদস্ (Id), অহং (Ego), এবং অধিশাস্তা বা অতি অহং (Super Ego)। যদিও তিনি মনকে এভাবে ভাগ করেছেন তথাপি এরা একে অন্যের সাথে অতি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

অদস্ মনের সবচেয়ে প্রাথমিক ও নিগূঢ়তম স্তর। এই স্তরকে বলা যেতে পারে জৈবিক আবেদনের সঞ্চিত ভাণ্ডার। অদস্ এতটাই শরীরবৃত্তীয় যে এটাকে কোনোভাবেই জৈবিক চাহিদার বাইরের কিছু হিসেবে ভাবা যায় না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘুম বিশেষ করে যৌনেচ্ছা মূলত অদসেরই ইচ্ছা। সহজাত প্রবৃত্তি বলতে আমরা যা বুঝি অদস্ ঠিক তাই। ফ্রয়েড মনে করেন অদস্-এর একমাত্র লক্ষ্যই হল সুখ প্রাপ্তি। তাই এটা সম্পূর্ণরূপে সুখনীতি (Pleasure principle) দ্বারা পরিচালিত হয়। এই নীতি অনুযায়ী অদস্ সেই সব কাজ করে যা তাকে তাৎক্ষণিকভাবে সুখ দেয়। দুঃখ বা বেদনাদায়ক কাজকে পরিহার করাও এর উদ্দেশ্য। আর এ কাজে তাকে সহযোগিতা করে প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action) ও প্রাথমিক ক্রিয়া (primary process)। শরীরের নানা রকম উত্তেজনাকে প্রশমন করার জন্য আমাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এবং সেগুলোকে প্রশমনের জন্য যে কাম্যবস্তুর দরকার পড়ে সেই কাম্যবস্তুর মানসিক প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার নামই প্রাথমিক ক্রিয়া। অদস্-এর যেহেতু যুক্তিজ্ঞান নেই তাই সে প্রকৃত কাম্যবস্তু এবং কাম্যবস্তুর মানসিক প্রতিচ্ছবির মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনা। এ কারণে মানসিক প্রতিচ্ছবির মধ্য দিয়েই অদস্ মানসিকভাবে তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে। অদস্-এর যৌনাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির ইচ্ছাকে লিবিডো (Libido) বলে। সে চায় কাম্য শক্তির তাৎক্ষণিক নিবৃত্তি। সে সম্পূর্ণ অন্ধ, সম্পূর্ণ বাস্তবতাহীন। অদসের কোনো নীতি নেই, নেই কোনো সম্পর্কবোধ। যুদ্ধফেরত অবসাদগ্রস্ত ক্লিফোর্ড চ্যাটর্লির স্ত্রী কনস্ট্যান্স সংক্ষেপে কনি। শরীরে কামনার উত্তাপ। দিনের পর দিন স্পর্শহীন কনির মূল্যবোধ একসময় ভেঙে পড়ে। স্বামীর প্রতি অসীম ভালোবাসা, শরীরের উদগ্র কামনার কাছে একদিন হেরে যায়। কনি একের পর এক কামনার বিস্তীর্ণ সাগরে ভেসে যেতে থাকে।[৪] জয়ী হয় অদসের অন্ধ আবেদন। বহির্জগতের নানা বস্তুর প্রতি তার এই আকর্ষণকে ফ্রয়েডীয় ভাষায় বলা যায় বিষয়াকর্ষণ বা Object-cathexis.

অহং-এর উৎপত্তি অদস্ থেকে। মনের যে অংশটুকু বাস্তব সেই অংশটুকুই অহং। অহং শেষমেশ অদসেরই অংশ। অদসের সাথে অহং-এর সম্পর্ক অনেকটা অশ্বের সাথে অশ্বারোহীর মতো। অহং-এর নিজস্ব কোনো শক্তি নেই, সে শক্তি ধার করে অদসের কাছ থেকে; অশ্ব যেমন অশ্বারোহীর শক্তি যোগায়।

ফ্রয়েড মনে করেন অবদমন ও প্রতিবন্ধক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অদস্ থেকে অহং জন্মলাভ করে। আসলে অবদমনের জন্ম হয় 'সুখভোগ নীতি' ও 'বাস্তবতা নীতি'র দ্বন্দ্বের ফলে। অহং-এর কাজকে ফ্রয়েডীয় ভাষায় বলা হয়, 'in the service of the reality principle'। অদসের সীমাহীন ইচ্ছা হয়তো অনেকটাই বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন এমনকি চরমভাবে রীতিবিরুদ্ধ। সেক্ষেত্রে ঐ অন্ধ আবেগ এবং আরো কিছু অহং জোর করে মনের চেতন স্তর থেকে নির্জ্ঞান স্তরে পাঠিয়ে দেয়। নির্জ্ঞান স্তরে এই ধরনের আবেদন তথা ইচ্ছার জোরপূর্বক ধাক্কা দিয়ে পাঠানোর নামই অবদমন। তবে নির্জ্ঞান স্তরে পাঠিয়ে দিলেই সেই সব আবেগগুলো ভদ্রমানুষের মতো বসে থাকবে এ ধারণা ভুল। এগুলো যেহেতু অদসের ইচ্ছা তাই কোনোভাবে ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। নিরন্তর এই চেষ্টা অবশেষে সফল হয় ঘুমন্ত অবস্থায়। দিনের বেলায় যখন প্রহরী সজাগ থাকে তখন কোনোক্রমেই অবদমিত ইচ্ছাগুলো বেরিয়ে আসতে পারে না কিন্তু রাতের বেলায় অর্থাৎ ঘুমন্ত অবস্থায় প্রহরীর বিশ্রামের সুযোগে স্বপ্ন হয়ে বেরিয়ে আসে। নির্জ্ঞান স্তর থেকে অদস্ বেরিয়ে আসার প্রধান বাধা যেহেতু অহং তাই এর নাম দিয়েছেন তিনি প্রতিবন্ধক।

ফ্রয়েডের মতে, অহং বাইরের জগতের সাথে সংঘাতে এসে আর-একটা নতুন জিনিস গঠন করে যার নাম অতি অহং বা অধিশাস্তা। অধিশাস্তা অহং-এর কাজের সমালোচনা করে এবং তা যদি কোনোরকম বিবেকবিরুদ্ধ হয় তাহলে তার মধ্যে অপরাধবোধ জেগে ওঠে।

অধিশাস্তা গড়ে ওঠে বাবা-মা'র অনুশাসনের ফলে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে, পুরস্কার বা তিরস্কারের ফলে। প্রকৃতপক্ষে অধিশাস্তা হল বিবেক। মায়ের প্রতি ছেলের যৌনাকর্ষণ বাধাগ্রস্ত হওয়ার ভিতর দিয়েই অধিশাস্তা তৈরি হয়। ফ্রয়েড এই ঘটনাকে ঈডিপাস গূঢ়ৈষা (Oedipus Complex) বলেছেন। বাবা–মার অবর্তমানে অধিশাস্তাই ব্যক্তির অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে। অদস এবং অধিশাস্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এজন্য অহং-এর কাজ হল বাস্তবতা, অদস্ এবং অধিশাস্তাকে সন্তুষ্ট করা। এই তিনটি জিনিসকে একসঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য অহংকে অতি বিচক্ষণ এক কূটনীতিকের ভূমিকা পালন করতে হয়।

ফ্রয়েড ব্যক্তিত্বের চলমানতা তথা চেতনার স্তরকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন–

ক. চেতন স্তর (Consciousness);

খ. অবচেতন স্তর (Sub/Pre consciousness) ; ও

গ. নির্জ্ঞান স্তর (Un consciousness)।

এগুলোর সাথে মনের তিনটি স্তর অদস্ (Id), অহং (Ego) এবং অধিশাস্ত (Super Ego) র সম্পর্ক বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। চেতন কিংবা অবচেতন নিয়ে ফ্রয়েড আলোচনা করলেও তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নির্জ্ঞান স্তর ।

অদসের পুরোটাই নির্জ্ঞান স্তরে জমা পড়ে থাকে। অন্যদিকে অহং কিছুটা নির্জ্ঞান স্তরে, বাকিটুকু থাকে অবচেতন ও চেতন স্তরে। বাইরের জগতের সাথে অহং-এর মাধ্যমে অদস্ যোগাযোগ রক্ষা করে। ফ্রয়েড সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন নির্জ্ঞান স্তরের ওপর। অবদমিত ইচ্ছা এই নির্জ্ঞান স্তরে চলে যায়। ফ্রয়েড মনকে হিমশৈলের সাথে তুলনা করেছেন। হিমশৈল পানির ওপর ভেসে থাকলেও এর বিপুল অংশ থাকে যেমন পানির নীচে তেমনি চেতনের বৃহত্তর অংশ থাকে নির্জ্ঞান মনের একান্ত গভীরে। ফ্রয়েডের অনেক সমালোচক নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি নির্জ্ঞান স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণে বেশ কিছু যুক্তি হাজির করেন যাকে অগ্রাহ্য করা কঠিন।

ক. আমরা দৈনন্দিন জীবনে কত না ভুল করি। লিখতে, বলতে, পড়তে অনেক রকম ভুল করে থাকি। 'Crown Prince' এর স্থলে 'Clown Prince' লিখে ফেলি। হঠাৎ খোঁজ নিলে দেখা যাবে হয়ত যুবরাজের প্রতি বিদ্বেষস্বরূপ মনের অজান্তে এ কাজটা হয়ে গেছে। ফ্রয়েড একবার এক চিঠিতে লিখেছেন একজন রোগীর 'Cold wave'-এর ভয় আছে ভীষণ কিন্তু কাগজে লিখে ফেলেছেন 'Cold wife'। ভদ্রলোকের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির কারণ খুঁজতে যেয়ে দেখেন তার স্ত্রীর সত্যিকার অর্থে 'Material frigidity' আছে। এ-সব থেকে ফ্রয়েড প্রমাণ করেন মনের নির্জ্ঞান স্তর বলে একটা কিছু অবশ্যই আছে যেখানে আমরা ধারণাগুলোকে অবদমন করে রাখি।

আমরা 'Slip of pen' কিংবা 'slip of tongue' বলে যে কথাগুলো বলে থাকি তার মূল কারণ কিন্তু নির্জ্ঞান স্তর। মনের ভুলে যা লিখি বা যা বলি তা কোনো-না-কোনো ভাবে আমাদের মনের অজ্ঞাতে জমে-থাকা ইচ্ছা।

খ. নির্জ্ঞান মনের অবদমিত বাসনাগুলো চেতন মনে বিকৃতভাবে প্রবেশ করলে মানুষ স্বপ্ন দেখে।

'আমরা জানি যে বিকৃত স্বপ্নের নিচে প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাগুলো হচ্ছে সেইসব কামনা যারা স্বপ্ন-সেন্সর (বা প্রহরা) ব্যবস্থা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত বা নিষিদ্ধ হয়েছে এবং ঐসব (নিষিদ্ধ) কামনার অস্তিত্ব আছে বলেই স্বপ্নে বিকৃতি এবং সেন্সর–ব্যবস্থার হস্তক্ষেপ ঘটে [৫]।' ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন হল আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা। বাস্তবতার প্রচণ্ড চাপে যে আকাঙ্ক্ষাগুলো পূর্ণতা পায়না, স্বপ্নের মধ্যদিয়ে তা পরিতৃপ্তি পেয়ে থাকে। সুতরাং নির্জ্ঞান স্তরকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

গ. উদ্‌বর্তন (Sublimation), অভিক্রান্তি (Displacement), বিপরীত গঠন (Reaction formation) ইত্যাদি নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কোনো নারীর অব্যাহত মাতৃত্বের কামনা থেকে সেবিকার পেশা গ্রহণ তার অবদমিত ইচ্ছার প্রকাশ হতে পারে। একে বলা হয় উদ্‌বর্তন।

ঘ. অনেক মানসিক রোগী ভয় বায়ুগ্রস্ত হয়। এর কারণ হিসেবে মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন শৈশবের কোনো অবদমিত অন্যায় কামনা নির্জ্ঞান মনে লুকিয়ে থেকে চেতন মনের আচরণকে প্রভাবিত করার দরুন এরকম ঘটনা ঘটে। শুচিবায়ুগ্রস্ততা (Touch mania), হিস্টিরিয়া অথবা চিত্তভ্রংশী পাগলামী অবদমিত কামনার ফলাফল।
আমরা এখন দেখব প্রকৃতপক্ষে অবদমনের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিটি কী? আলোচনার শুরুতে বলা হয়েছে এটা এক ধরনের প্রতিরক্ষার কৌশল। সেই কৌশলটা কী? আসলে কৌশলটা অহং-এর। বলা যায় এটা অহং-এর এমন একটা মৌলিক কৌশল যার দ্বারা আপত্তিকর প্রবৃত্তি বা তাড়নাগুলোকে সে সচেতন মন থেকে নির্জ্ঞান স্তর বা অবচেতন মনে পাঠিয়ে দেয়। অহং তার অপরাধবোধ বা আত্মগ্লানি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য এ কৌশল নিয়ে থাকে। R.D. Laing নামে একজন মনঃচিকিৎসক অবদমনের সুন্দর একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন– 'We forget and then forget that we forget'.

শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পর্যায়গুলোতে অবদমন হয়ে পড়ে অপরিহার্য ব্যাপার। শিশু বাহ্যজগতের সাথে যখন পরিচিত হতে থাকে, বিশেষ করে বাবা-মার কাছ থেকে যখন যৌন-নৈতিকতা (ঝর্বীধষ সড়ৎধষরঃু) শিক্ষা পেতে থাকে তখন সে ইচ্ছাগুলোকে অবদমন করতে থাকে। সে ভাবতে থাকে এই নিষিদ্ধ ইচ্ছাকে প্রকাশ করলে কিংবা প্রয়োগ করলে তার জীবনে মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসবে। তবে অবদমিত ইচ্ছা বেরিয়ে আসে নানাভাবে। "The unconscious memories or urges continue to seek expression and may emerge in the form of accidents, slips or 'neurotic symptoms" [৬]অবশ্য মজার ব্যাপার হল এই পুরো প্রক্রিয়াটা ঘটে থাকে তার মনের অজান্তে।

এরপর আমরা দেখতে চাই অবদমিত ইচ্ছাগুলো কিভাবে মানব-প্রজাতির জন্য নিষিদ্ধ ও অস্পৃশ্য হয়ে ওঠে।

তিন

ফ্রয়েডীয় চিন্তার মূল কেন্দ্রবিন্দু যৌনতা। মানুষের অগুণতি চিন্তার মধ্যে শুধুমাত্র যৌনেচ্ছাকেই তিনি অবদমনের বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এটা নিঃসন্দেহে একদেশদর্শী চিন্তার প্রকাশ। সমাজ-অসমর্থিত অনেক চিন্তাই তো মানুষ করে থাকে কিন্তু সেগুলোকে কেন তিনি বাদ দিয়ে যৌনেচ্ছাকেই অবদমনের কেন্দ্রে নিয়ে আসলেন সেটা অনেকের কাছে বোধগম্য নয়। এছাড়া মানুষের যাবতীয় চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু

হিসেবে তিনি যে যৌনতাকে টেনে এনেছেন সেটা সর্বাংশেই অস্পষ্ট। মানবসভ্যতার বিনির্মাণে যারা শুধু জ্ঞান দিয়ে জগতটাকে এ জায়গায় এনেছেন তাদের মূল কর্মকাণ্ড কিভাবে যৌনতাকে স্পর্শ করেছে তার সদুত্তর তিনি দিয়ে যেতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের বিমান ওড়ানো কিংবা দার্শনিক কান্টের শর্তহীন আদেশ-এর চিন্তার মধ্যে যৌনতার স্পর্শ কোথায় তা ঠিক বোঝার মতো নয়। তবে এটা স্বীকার করতে হয়তো দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে মানবজীবনের জৈবিক প্রেষণাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হল কাম বা যৌনেচ্ছা। যে প্রাণীকুলের পদভারে পৃথিবীটা আজ এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে তার আবির্ভাব ঘটেছে নিছক এই আদিম যৌন কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে অতি নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর অন্যতম হল এই যৌনতা! যৌনতা-সম্পর্কিত কোনো তথ্যই ভদ্র মানুষদের কাছে সহজগম্য নয়। যৌনশিক্ষা বা যৌনতা-সংক্রান্ত সব বিষয় নিয়েই মানুষের মাঝে আছে লুকোচুরি। এ-বিষয়ে মানুষ প্রকাশ করতে চায় না তার মনের একান্ত গোপন ইচ্ছা। অথচ ক্ষুধা, ঘুম বা তৃষ্ণা নিয়ে মানুষের মাঝে কোনো গোপনীয়তা নেই। নেই কোনো অহেতুক চেপে রাখার প্রবণতা। অথচ শারীরবৃত্তীয় অতি সাধারণ একটা আবেদন হল যৌনেচ্ছা। রাসেল যথার্থই বলেছেন– 'Sex is a natural need, like food and drink'[৭]

অবদমনের সাথে যৌন-নৈতিকতার সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। অর্থাৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অহং-কে ইচ্ছার অবদমন করতে হয় এবং তা নির্ধারণ করে সম্ভবত প্রচলিত মূল্যবোধ ও বিদ্যমান সামাজিক রীতি। আর এক্ষেত্রে মূল চালকের ভূমিকা থাকে ধর্মের। যদিও সকল ধর্মের জন্য একটা সাধারণ যৌন-নৈতিকতা স্থাপন করা কষ্টসাধ্য হয়েছে তবুও অধিকাংশ মানুষ এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে যাওয়াকে পাপ মনে করেন। তবে মানবমনের বিচিত্র কামনা অনেক সময় সকল নিষেধাজ্ঞাকে অতিক্রম করে। নিষিদ্ধ সম্পর্ক স্থাপন, বিবাহপূর্ব যৌন-অভিজ্ঞতা (fornication) অর্জন কিংবা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বাইরে যৌনাচার কঠোরভাবে অননুমোদিত হলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যৌনকর্মীদের সরকার কর্তৃক একটা স্বীকৃতি আছে। বিবাহের মাধ্যমে যদিও বাধাহীন যৌনাচারের অনুমতি রয়েছে কিন্তু অনেকের সেই অবস্থায় পৌঁছানোর আগেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে অথবা বিবাহ-সম্পর্কের বিশ্বাসও নতুন স্পর্শের উন্মাদনায় ভঙ্গ হচ্ছে। মোটকথা বিচিত্রগামিতার ইচ্ছা মানুষের অতি সহজাত প্রবণতা। সুন্দর ফুলের সুবাস গ্রহণেচ্ছা মানুষের একান্ত কামনাগুলোর মধ্যে অতি তীব্র। তবে সেই অন্ধ আবেগের যদি লাগাম না থাকে তবে তা মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে; মনুষ্য-বিনির্মিত সমাজ পড়তে পারে মুখ থুবড়ে। কেননা স্থূল যৌনতার ওপর শিল্পীর দৃষ্টির কারণে যৌনতায় এসেছে নান্দনিকতা মানুষের– গর্ব এখানেই।

চার

ফ্রয়েড 'Civilization and Its Discontents' গ্রন্থে পশ্চিমা সংস্কৃতি নিয়ে আশংকা প্রকাশ করেছেন। তিনি দাবি করেছেন পশ্চিমা সংস্কৃতির বড্ড প্রয়োজন অবদমনের।

মানুষের জিঘাংসা-প্রবৃত্তি এতটা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে সামাজিক অশান্তি সেখানে প্রবল আকার ধারণ করেছে। এ কারণে যুদ্ধ ও সমর প্রতিযোগিতা মানুষের সুশীলবৃত্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী জর্জ সিমসন তাঁর 'Man in society' গ্রন্থে লিখছেন– 'মানুষের আচরণের মধ্যে যখন অযৌক্তিকতার অনুপ্রবেশ ঘটে তখন মানুষ বিপথগামী হয়। মানুষের মানসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে যে যৌক্তিকতা লক্ষ্য করা যায় তার সঙ্গে উক্ত অযৌক্তিকতার অনুপ্রবেশের প্রশ্নটি বিশেষভাবে জড়িত [৮]। সভ্যতা বিনির্মাণে মানুষের অশুভ প্রবৃত্তির অবদমনের গুরুত্ব ছিল মারাত্মকভাবে। আদতে ফ্রয়েডীয় অবদমনের ক্ষেত্র বেশ সীমিত। কিন্তু মানুষের চতুর্দিকে তার নানা রকম আপত্তিকর প্রবৃত্তি তাকে ধ্বংস করতে পারে, মানুষ হয়ে পড়তে পারে অর্থহীন পশু। কিন্তু তাই বলে সৃজনশীল, মঙ্গলকর, শুভ ও সুশীল ইচ্ছাকে অবদমন করলে মানুষ হারাতে পারে সৃষ্টিশীলতাকে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে জ্ঞানী মানুষরা বিপ্লবী হয়ে উঠেছে, অতিক্রম করেছে সামাজিক নিষেধাজ্ঞাকে। সত্যের প্রতি দুর্নিবার আগ্রহ তাদেরকে থামাতে পারেনি কখনও। সত্যের জন্য প্রাণ দিয়েছেন সক্রেটিস। বিতাড়িত হয়েছেন স্বদেশ থেকে স্পিনোজা। পুড়িয়ে মারা হয়েছে ব্রুনোকে। চাকুরীচ্যুৎ হতে হয়েছে রাসেলকে। তাই বলে সত্যকে তারা অবদমন করেননি। সত্য প্রকাশ করেছেন নির্ভয়ে। এ কারণে সেই জীবনকে আমরা সর্বাধিক কল্যাণকর জীবন বলব। এ ধরনের জীবনে প্রেমের প্রতি উদগ্র কামনা থাকবে ঠিকই কিন্তু তা যেন পরিচালিত হয় জ্ঞানের নির্ভীক প্রহরীর দ্বারা। রাসেলের এই উক্তি দিয়ে আমরা শেষ করতে চাই,'The good life is one inspired by love and guided by knowledge.'[৯]

তথ্যপঞ্জী

১. Introduction to Psychology – Morgan, King, Weisz, Schopler; Tata Mcgraw-Hill. Page – G- 20.

২. একরাত্রি– (ছোটগল্প)– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩. ১৯৩৬ সালের ২১ এপ্রিল আইনস্টাইন ফ্রয়েডের কাছে এক চিঠিতে এই কথাগুলো লেখেন
(ফ্রয়েড: সুনীল কুমার সরকার; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্ড়ক পর্ষদ (ভূমিকা)।

৪. লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার: ডি.এইচ. লরেন্স।

৫. Introductory Lectures on Psychoanalysis: Prof. Sigmund Freud. (অনুবাদ অপর"প রতন বসু; দীপায়ন, কোলকাতা)।

৬. Introduction to Psychology – Morgan, King, Weisz, Schopler; Tata Mcgraw-Hill. Page – 589.

৭. Basic Writings of Bertrand Russell: Routledge, (The place of sex among human values). Page – 351.

৮. Man in Society– George Simpson (অনুবাদ ড. রঙ্গলাল সেন, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, পাতা–৬৭)।

৯. Why I am not a Christian– Bertrand Russell, Routledge, Page – 68.

অবদমন: শরীর ও মনে

মে হ্ তা ব খা ন ম

[মেহতাব খানম। জন্ম ২২ জুলাই ভোলা শহরে। মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সিলর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক। দীর্ঘদিন ধরে কলাম, নিবন্ধ, প্রবন্ধ লিখছেন। ব্যক্তিগত অনিচ্ছার কারণে কোনো বই প্রকাশ হয়নি এ যাবত।]

হালখাতা

আমাদের সমাজে 'অবদমন' শব্দটিকে ঘিরে এক ধরনের রহস্য কাজ করে, যার কারণ সম্ভবত, বিষয়টিকে কেবল সেক্সুয়ালিটির সঙ্গে যুক্ত করে অনেকে সহজ ফুরফুরে হাওয়ায় অবগাহন করে থাকেন। আমাদের সমাজের প্রেক্ষাপটে ইংরেজি 'সাপরেশন', 'রিপরেশন' ইত্যাদি শব্দের পাশে অবদমন শব্দটিকে রেখে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

মেহতাব খানম

সিগমুন্ড ফ্রয়েড অবদমন বিষয়টিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সেখানে সেক্সকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। হতে পারে যে, সে জন্য অনেক মানুষই মনে করেন অবদমন মানেই যৌন অবদমন। কিন্তু ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার পরবর্তীকালে এই তত্ত্ব নিয়ে অনেকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। ফ্রয়েডের সঙ্গে কিছুটা মিলিয়ে কেউ কেউ ব্যাখ্যা দিয়েছেন আবার কেউ কেউ ফ্রয়েডীয় তত্ত্বেরও একেবারে বিপরীত জায়গা থেকেও বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন। এখন প্রথম কথা হল, ফ্রয়েডের মতে অবদমন বিষয়টি কী? আসলে মানুষের মনকে ফ্রয়েড তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। ১মটি হল 'কনশাস মন'। ব্যবহারিক জীবনে আমরা সচেতনভাবে যে সব কথা বলি, কাজ করি সেগুলো হল কনশাস মনের কাজ। ২য়টি হল 'প্রি-কনশাস মন'; এটা হল এমন যে, একটি বিষয় হয়তো একজন মনে করতে পারছে না তখন অন্য কেউ হয়তো সেটা মনে করিয়ে দিল কোনো কিছুর মাধ্যমে। যেমন, একটি লোকের পরিচয় মনে করতে গিয়ে ঐ লোকটি যে রুশ দেশের মানুষ এইটুকু মনে হওয়া মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে মনে হল ঐ লোকটির নামের শেষাংশে দস্তয়ভস্কি শব্দটি রয়েছে– কাজেই নামটি কী হতে পারে, এ ব্যাপারে হয়তো

পাশ থেকে অন্য একজন মনে করিয়ে দিয়ে বলল ঐ লোকটির নাম 'নিকোলাই দস্ত য়ভস্কি' ইত্যাদি। প্রি-কনশাস মন এভাবে কাজ করে থাকে। আর ৩য়টি হল, 'আনকনশাস মন'। যা মানুষের মনের সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে থাকে; যা আসলে আমাদের সচেতন স্তরের বাইরে থেকে কাজ করে। মানুষ তার জীবনের দুঃখ, ব্যথা, বঞ্চনা কিংবা এমন সব ঘটনা যা অনাকাঙ্ক্ষিত, সেটা সে তার এই আনকনশাস স্তরে পাঠিয়ে দেয়। যেমন, ছোটবেলায় হয়তো আমার বাবা আমাকে খুব মারধর করত, যেটা আমাকে ভীষণ পীড়া দিত, বড় হয়ে দেখা গেল ঐ যন্ত্রণাদায়ক বিষয়টি আমার মনের আনকনশাস স্তরে রয়ে গেল এবং ঐ একই আচরণ আমি আমার সন্তানের সঙ্গেও করছি। এই যে মনের অধিকটা জুড়ে আনকনশাস স্তরে যা কিছু থেকে গেল এটাই হল অবদমন। কাজেই অবদমন মানেই সেক্সুয়াল অবদমন, এই বিষয়টি ঠিক নয়। বরং সেটা নানা বিষয়ের হতে পারে।

হালখাতা

অবদমন ও সেক্সকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

মেহতাব খানম

আসলে অবদমন বিষয়টির মধ্যে অনেক কিছু জড়িয়ে আছে। ধরা যাক, আমি যদি বলি অবদমিত হওয়ার জন্যই বুশ ইরাক আক্রমণ করেছে তাহলে বিষয়টিকে একেবারেই সাধারণীকৃত করে ফেলা হবে। আসলে আমি অবদমন শব্দটিকে জেনারালাইজড্ করার পক্ষপাতী নই। কেননা একেকটা মানুষের চিন্তাধারা কিন্তু একেক রকম। প্রত্যেকেরই নেবার ক্ষমতা একেক রকম। একেক মানুষ একেকটা বিষয় একেকভাবে অবদমন করছে। একজনের জন্য যেটা পেইনফুল, আরেকজনের জন্য সেটা না-ও হতে পারে। যেমন সেক্সুয়ালিটির ক্ষেত্রে যদি বলি যে কোনো একটি মেয়ে ছোটবেলায় রেইপড্ হয়েছে, আবার কোনো একটি মেয়েকে খারাপভাবে স্পর্শ করা হয়েছে। এখন দুটো মেয়ে কিন্তু একইভাবে রি-অ্যাক্ট করবে না। কেননা দুজনেরই নেবার ক্ষমতা ভিন্নরকম হতে পারে। কেননা এ-ঘটনা কে করেছে, তার বাড়ির কেউ কিনা? তার পরিচিত কেউ কিনা, ঘটনাটা ঘটার পর কারো সাথে সে এ নিয়ে আলোচনা করতে পেরেছে কিনা? যার সাথে আলোচনা করেছে সে তাকে সাপোর্ট করেছে কিনা? তার কাছ থেকেই-বা কতটুকু সাইক্লোজিকাল সাপোর্ট পেয়েছে ইত্যাদি অনেক কিছু কিন্তু নির্ভর করবে তার স্মৃতিটাকে সে কতটুকু অবদমিত করেছে তার ওপর। কাজেই আমরা যদি এটা বলি যে ব্যক্তি তার স্মৃতিকে যত বেশি অবদমন করছে সে ততবেশি অবদমিত এটা বলা একেবারেই ঠিক হবে না।

হালখাতা

অবদমনের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায় নিয়ে যদি খানিকটা ব্যাখ্যা করেন?

মেহতাব খানম

এটুকু বলতে পারি যে ব্যক্তিগত পর্যায়, পারিবারিক পর্যায়, সামাজিক পর্যায়, রাষ্ট্রীয় পর্যায় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোনো ব্যক্তির অস্বাভাবিক আচরণগুলো যখন আমরা দেখি তখন আমরা বলতে পারি হয়তো সে ব্যক্তির প্রয়োজনগুলো ফুলফিল হয়নি। এখন একজন মানুষ কেন দুর্নীতি করছে? কেন সে তার প্রয়োজনগুলোকে প্রখরভাবে ফিল করছে? কেন সে আবারও দুর্নীতি করতে যাচ্ছে? এরকম অনেকগুলো কেন এসে যাচ্ছে তো আমরা বলতে পারি যে কিছু মানুষের ভিন্ন ভিন্ন জায়গাগুলো কাজ করছে না। কেন করছে না? কারণ তার ওয়ান্টগুলো ফুলফিল হয়নি। এখন কথা হল, এমন অন্য মানুষ আছে যাদের ওয়ান্টগুলোও পূরণ হয়নি কিন্তু তারা দুর্নীতিবাজ হয়নি। কিন্তু যারা দুর্নীতি করল তাদের ওয়ান্টগুলো ফুলফিল না হওয়া কেন ততবেশি বড় হল তাদের কাছে? যে কারণে দুর্নীতি করে বিষয়টিকে পেতে হল? অর্থাৎ এখানে একজন মানুষের চাহিদা তার পুরো ব্যক্তিত্বের সাথে জড়িয়ে আছে। ব্যক্তির নেবার ক্ষমতা, পরিবেশ, চাহিদা, তার প্রতি অন্যদের সাপোর্ট ইত্যাদি সব মিলিয়ে কিন্তু ব্যক্তিটা তৈরি হয়েছে। কাজেই শুধু অবদমন করেছে বলে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়গুলো প্রভাবিত হয়েছে একজন সাইক্লোজিস্ট হিসেবে আমি তা মনে করি না।

হালখাতা

রাষ্ট্রের নির্বাহীর ক্ষেত্রে অবদমন ও তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে এর প্রভাবের সকল সম্ভাবনাকেই কি আপনি নাকচ করে দেখতে চান?

মেহতাব খানম

হ্যাঁ, একটা সম্ভাবনার জায়গা থাকতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মানবতাবাদী কারা-চিকিৎসক ফিলিপ পিনেল (ফরাসি) সরকারকে বোঝাতে সক্ষম হন যে মানসিক রোগের কারণে অপরাধী ব্যক্তিরা যেহেতু কোনো দোষের কারণে অপরাধী নয় সেহেতু তাদের শাস্তি না দিয়ে ব্যবস্থা করে পুনর্বাসিত করা উচিত। কথা হল আমাদের দেশে মানসিক হাসপাতালসহ অন্যান্য হাসপাতালে যে সব অপরাধী আছে তারাও কিন্তু কোনো-না-কোনোভাবে মানসিক রোগি। তাদের মানসিক রোগের জন্য কোনো চিকিৎসা দেয়া হয় কি?

হালখাতা

অবদমনের সঙ্গে অপরাধ কীভাবে যুক্ত বলে আপনি মনে করেন?

মেহতাব খানম

এটা আসলে অনেক বড় একটা প্রশ্ন। আমাদের দেশে যারা অপরাধ করে জেল খাটছে তাদের কথাই কি শুধু বলব,– না কি আমাদের দেশে যে সব শিশুরা জেল খাটছে যারা সেভাবে অপরাধ করেনি তাদের কথা বলব। শিশুরা তো অপরাধ করে বলে আমরা মনে করি না। কিন্তু আমাদের সেই সাহায্য কোথায়? যেমন পশ্চিমা দেশে যারা অপরাধ করে জেল খাটছে তারা যত বড় অপরাধীই হোক না কেন তাদের সাইকোথেরাপি দেয়ার ব্যবস্থা আছে এবং কাউন্সিলিংও করা হয়। কারণ একটা মানুষের শুধু একটা দিক-ই না তার আরও অনেক দিক আছে। সে সব দিকগুলোও বিবেচনায় আনা উচিত। উন্নত দেশগুলোতে অপরাধীদের এই সহযোগিতাগুলো দেয়া হয়। আমাদের দেশে এই সহযোগিতা দেয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই, আমাদের দেশে যে সব অপরাধীরা জেল খাটছে তারা জেল থেকে বেরিয়ে আবারও বড় একটা অপরাধ করছে। কেননা তাদের সাথে জেলে এমন ব্যবহার করা হয় বা তারা মনে করে যে এমন কোনো অপরাধ তারা করেনি যার জন্য সে শাস্তি ভোগ করছে, তখন জেল থেকে বেরিয়ে আরো অপরাধ করার প্রবণতা তাদের মধ্যে থেকে যায়। কাজেই শুধু শাস্তি কোনো সমাধান নয়। আমি বিভিন্ন শিশু অপরাধ কেন্দ্র, কিশোর উন্নয়ন শিশু বিকাশ কেন্দ্র ইত্যাদি জায়গায় গিয়েছি। সেখানেও এমন অনেক সমস্যা রয়ে গেছে যার সমাধান করা দরকার বা ঐ সব শিশুদের সাইকোথেরাপি দিয়ে একটি সুস্থ ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সূচনা করে দেয়া দরকার।

হালখাতা

অপরাধী যাতে সঠিক আচরণ পায়, সেজন্য আমাদের মতো রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কী কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন?

মেহতাব খানম

আমাদের দেশে আসলে দমন অবদমন ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য মানসিক কারণে যারা অপরাধ করে তাদের সাইকোথেরাপি দেয়ার মতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাউকে যদি খুঁজি তেমন কাউকেই পাওয়া যাবে না। আমরা যখন মনে করি যে সাইক্লোজি প্রাকটিশ দরকার বা আমরা যখন এর ওপরে প্রশিক্ষণ নেই– এখনও দিনের পর দিন ট্রেনিং নিচ্ছি –আমরা এসব ট্রেনিং নিচ্ছি বাইরের লোকদের কাছ থেকে। আমাদের দেশে এখনও এমন কোনো ইনিস্টিটিউট তৈরি হয়নি। দেশের সবগুলো বড় শহরে একটি করে বড় ইনিস্টিটিউট হওয়া উচিত যেখানে আমরা কিছু লোক প্রশিক্ষণ নিতে পারি। তাহলেই সে লোকগুলো কাজ করে যেতে পারবে। আমরা যদি বলি আমাদের সাইক্লোজি প্রশিক্ষণ দরকার, যদি বলি ট্রেইন মেডদের জন্য দরকার, তারা জীবনে যাতে খারাপ কাজ আর না করে তারা যেন ভালো থাকে– তো সেটা কারা করবে? কেউ নেই তো।

হালখাতা
রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও তো সেই ম্যানেজমেন্ট নেই?

মেহতাব খানম
রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করেন, তারা তো বিষয়টি বুঝতেই পারেন না। তাদের তো বিষয়টা প্রথমে বুঝতে হবে। মানুষকে বুঝতে হবে। অথচ তারা যে বুঝতে পারবে তারও কোনো সম্ভাবনা নেই।

হালখাতা
আমরা পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অবদমনের শিকার হচ্ছি নাকি জন্মগতভাবেই কিছু জিন পেয়েছি যে কারণে আমাদের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য সেটার দ্বারা নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে?

মেহতাব খানম
হ্যাঁ, এটা নিয়ে সারা বিশ্বে কিন্তু বিতর্ক চলছে। আমরা পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে কোনো কিছু হচ্ছি নাকি জন্মগতভাবেই কিছু জিন পেয়েছি বা উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি যেখান থেকে আমাদের প্রকৃতি নির্ধারিত হচ্ছে, আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তৈরি হচ্ছে। এখন পর্যন্ত এই বির্তকের নির্বাসন হয়নি। আমার মনে হয় এই পৃথিবী যতদিন আছে বা থাকবে ততদিন এই বিতর্ক চলতে থাকবে। কেননা বৈজ্ঞানিকভাবে বিষয়টিকে প্রমাণ করা খুবই কঠিন।

হালখাতা
একটি শিশু কিভাবে অবদমিত হতে পারে?

মেহতাব খানম
এটা ধারণা করা হয় যে একটি শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার ব্যক্তিত্ব মায়ের গর্ভ অবস্থায় গঠিত হয়। শিশুটা যখন মায়ের গর্ভে আসে তখন মা যদি মানসিকভাবে খুব কষ্টে থাকেন, মায়ের জীবনটা যদি সুখকর না হয় সেখানে শিশুটা সাফার করে। এখন মা কি সবসময় ঐ শিশুর কথা মনে করে চলবে? তাতো চলতে পারে না। এখন মা যদি মনে করে যে আমাকে খুশি থাকতে হবে তখন পরিবেশ হয়তো তাকে খুশি থাকতে দেবে না। তখন থেকেই তো শিশুটা বেড়ে উঠছে। দীর্ঘ নয় মাস মায়ের গর্ভে থাকাকালীন এই সময়ে শিশুটা কিন্তু ওই প্রতিকূল পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। আমি কিন্তু মাতৃগর্ভেও পরিবেশ দ্বারা প্রভাবের কথা বলছি। এই মুহূর্তে জেনেটিক্যালি ইফেক্ট-এর কথা বলছি না। কারণ এটা নিয়ে এখনও গবেষণা হচ্ছে।

হালখাতা

তাহলে শিশুর চরিত্র-গঠন সম্পর্কে যদি একটু বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন?

মেহতাব খানম

তাহলে আমরা বুঝতে পারছি কত ছোট ছোট ব্যাপার শিশুর চরিত্র গঠন করতে পারে, চরিত্র তৈরি করতে অবদান রাখে। তাহলে আমরা কী করে বলব জন্মগতভাবে এটা হয়েছে কি হয় নি। আমাদের বুঝতে হবে প্রতিটা শিশু পৃথিবীকে কেমনভাবে দেখছে। একই বাড়িতে লালিত-পালিত হওয়া প্রতিটা ভাইবোনের নেচার আলাদা। এমনকি জমজ ভাইবোনেরও। আমি পরিবেশবাদী। আমি বলব প্রতিটি শিশু পরিবেশ থেকে জানা-বোঝার অনুভব করার বিষয় থেকেই আলাদা হয়ে যায়। যে শিশুটি বেশি কাঁদছে মা কিন্তু তাকে আগে দুধ দিচ্ছে, অন্যটি অপেক্ষা করছে। দুটি জমজ শিশু একটিকে যখন তার দুধ দিচ্ছে তখন অন্যটি অপেক্ষা করছে। এই পরিবেশ থেকেই সে অপেক্ষা করা শিখছে। এভাবেই দুটি শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলাদা হচ্ছে। সুতরাং আমার ধারণা মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সময়ে শিশুর বৈশিষ্ট্য তৈরি হয় মায়ের গর্ভ থেকে তার বেড়ে ওঠার সময় পর্যন্ত। এখানে ফ্রয়েড অবশ্য জন্মের পর থেকে পরবর্তী পাঁচ বছরের কথা বলছেন; এ সময়টুকুর মধ্যে নির্ধারিত হয়ে থাকে যে সে মানুষ হিসেবে কেমন হবে। ফ্রয়েডের মতে এ সময়ের মধ্যেই তার জীবনের পরবর্তী সময়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়ে যায়। আমরা কিন্তু একটা কথা শুনে সেটা এনালাইসিস করছি শিশু যেটা করতে পারে না। আমরা যখন কোনো কথা শুনি তখন বুঝি এটা ঠিক বা এটা ঠিক না, হয়তো যে এক মিনিট অপেক্ষা করেছে বা দুই মিনিট অপেক্ষা করেছে, তখন থেকেই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটা আলাদা হচ্ছে। আমি কিন্তু মাতৃগর্ভের পরিবেশ থেকে শুরু করছি; শিশুটা ভূমিষ্ঠ হল, শিশুটির জন্মের প্রথম দিন থেকেই পরিবেশ তাকে অভিজ্ঞ করছে। আমরা যখন থেরাপি শিখেছি তখন ট্রেইনার আমাদের বলেছে যে মায়ের প্রথম স্পর্শ থেকেই বুঝতে পারে যে সে কতটুকু নিরাপদে আছে। মা তাকে যেভাবে তৈরি করে সেটা থেকে সে বুঝতে পারে সে মায়ের কাছ থেকে কতটুকু নিরাপত্তা পাচ্ছে। ও যেটা বলছে সেটার ৫০% ঠিক ৫০% ঠিক না। শিশু যখন কিছু দেখে-শোনে বা বোঝে তখন পরিবেশ থেকে সে ১০০% নিয়ে নেয়। এই ১০০% দিয়ে সে তার পরিবেশকে কিভাবে দেখছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভারি হয়ে যায়। কাজেই এই অবস্থায় শিশুটি তাকে অবদমন করবে কি করবে না আমি মনে করি এটা তার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই জেনেটিক ব্যাপারও আছে। সে ব্যাপারটা এখনও আমরা জানিনা যে সেটা কতটুকু আছে।

হালখাতা

Perversion বা বিকৃতি অবদমন থেকে সৃষ্টি এরকম একটা কথা অনেকে জানেন এবং অনেকে স্বীকারও করেছেন। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

মেহতাব খানম

এখানে সেক্স-রিলেটেড বিকৃতিকে বোঝানো হয়েছে কিনা আমি জানি না। তবে সব ধরনের বিকৃতিকে যদি বোঝানো হয়ে থাকে তাহলেও তা হতে পারে। তবে পুরোটাই অবদমন করেছে বলে বিকৃতি হয়েছে এটা না হয়ে বরং অন্যান্য অনেক কারণেও হতে পারে। এক্ষেত্রে অনেক থিওরি আছে। একটা থিওরি আছে যে আমি যদি দেখি, আমার বাবা আমার মাকে অত্যাচার করেন তাহলে কোনো সময় আমিও তার ছেলে হিসাবে আমার স্ত্রীকে অত্যাচার করতে পারি। ওখানে কিন্তু আমি আমাকে অবদমন করি। আমি দেখেছি এবং শিখেছি যে মেয়েরা ডোমিনেটেড হবে। স্যোসাল লার্নিং থিওরি যেটা বলে; শিশুরা ছোটবেলায় তার চারপাশে যা দেখে তা থেকে খবধৎহ করতে পারে।

হালখাতা

আপনি ব্যক্তিগত জায়গা থেকে এরকম অবদমনকে কীভাবে দেখেন?

মেহতাব খানম

আসলে নিজেকে অবদমিত রাখছি, এভাবেই নানা অনেক কিছুই অবদমন করছি। একে Splite Personality বলতে পারি। আমাদের Personality গুলো বিভিন্নরকম। আমি ব্যক্তিগতভাবে সমাজে একটা আদর্শ সত্তা দেখাতে চাই। এই আইডিয়াল সত্তাটা বাস্তব সত্তা থেকে যত বেশি সরে যাবে সমাজ ততই অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে।

হালখাতা

আপনি বলছেন আমাদের Personalityগুলো বিভিন্নরকম আবার বলছেন ব্যক্তিগতভাবে সমাজে একটা আদর্শ সত্তা দেখাতে চান। এটা কি তাহলে পরস্পর বিপরীতমুখী কথা এবং প্রতারণা নয়?

মেহতাব খানম

অবশ্যই প্রতারণা, তবে প্রতারণা ইচ্ছে করে করছি কিনা, সেটা দেখতে হবে। তাছাড়া এগুলো আমরা শিখিই-বা কোত্থেকে। আমরা এগুলো শিখছি আমাদের চারপাশ থেকে। মূলত আমরা প্রতারণাও পরিবেশ থেকেই শিখি।

হালখাতা

আমি হয়তো এক রকম কিন্তু আমার ভিন্ন রকম একটি রূপ মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। সেজন্য মেকাপ পরি, ভিন্ন রকম স্বর ও ঢং নিয়ে কথা বলি, ড্রেসআপও পালটে ফেলি– এগুলো আমরা কেন করি? এগুলো কি অবদমনের মধ্যে পড়ে না? এগুলো কি এক ধরনের প্রতারণা নয়?

মেহতাব খানম

এখানেও আমি কিন্তু জেনারালাইজড করব না। আমি কি প্রতারণা করতে চাচ্ছি নাকি আমার একটা অন্য রকম ছবি আমি মানুষকে দেখাতে চাই। মানুষ আমাকে খুব গ্রহণ করুক– কে না চায়। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই এই প্রবণতা আছে। আমরা যাদের কথা বলছি তাদের মধ্যে এই প্রবণতাটা হয়তো বেশি আছে। কিন্তু এই প্রবণতা কার মধ্যে নেই? আমি তো মনে করি আমার মধ্যেও আছে। আমি যখন Student -দের সামনে যাচ্ছি তখন সে-আমি আর ঘরের আমি তো এক আমি না। আমরা কিন্তু নিজেদের নিয়েই বিষয়টা বিচার করতে পারি। এজন্য ওদের কাছে যাওয়ার দরকার নেই যারা সমাজে অনেক রকম অবিচার করছে আর ঘরে গিয়ে অন্যরকম করছে। আবার সমাজের লোকের কাছে ভালো, ঘরে গিয়ে অন্যায় করছে। আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু কমবেশি এরকম। আমি নিজেকেও বাদ দিব না। আমি নিজেই নিজের দুটো ছবি দেখে অবাক হয়ে যাই। ছোটবেলায় আমার মা আমাকে যখন খুব জোরে ধমক দিতেন আমি সেটাই ঐধঃব করতাম। আমার মনে হতো এটা একেবারেই উচিত হচ্ছে না। আবার আমিও আমার মেয়ের সাথে সে একই রকম আচরণ করছি। আমি সেই একই সুরে একইভাবে ধমক দিচ্ছি। আমি এটা আমার মায়ের কাছ থেকেই শিখেছি। আমি সচেতন বলে এটা সবাইকে বলি। কিন্তু আমি এত ঝঃৎড়হমষু এটা বলতে চাই না। আমি যেহেতু এ নিয়ে কাজ করছি, নিজেও অনেক থেরাপি নেই, মানুষকে থেরাপি দেই এবং আমরা এ নিয়ে পড়াশুনা করছি, ট্রেনিং নিচ্ছি তাই এখন খোলাখুলিভাবেই এগুলো আলোচনা করি, কার মধ্যে না দ্বৈত সত্তা আছে? দ্বৈত সত্তা ছাড়া কি মানুষ হয়। আমার মধ্যেও তো আছে। সমাজ তো আমাদের নানা বিধিনিষেধের মধ্যে ফেলে দেয়। একটি শিশুও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে সমাজ তাকে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলে দেয়।

হালখাতা

ফ্রয়েড যে মানুষের বায়লোজিক্যাল নিড কিংবা শিশুর সেক্সুয়াল প্লেজারের কথা বলেছেন, এ বিষয়গুলোকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

মেহতাব খানম

আসলে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব আমি যখন প্রথম পড়েছিলাম তখন বিষয়টাকে একভাবে দেখেছি। এখন আবার অন্যভাবে দেখছি। কেননা একদম ছোট্ট একটা বাচ্চা, সে সেক্সুয়াল প্লেজার পাচ্ছে এটা আমার কাছে ঠিক ভালো লাগেনি। ফ্রয়েডের সব জিনিস আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। তবে তার কিছু জিনিস খুবই গ্রহণযোগ্য। কিছু কিছু জায়গায় মনে হয়েছে যে ফ্রয়েড বায়লোজিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বর্তমান বিশ্বে ফ্রয়েডের স্থান এখনও অনেক গ্রহণযোগ্য জায়গায় রয়েছে। অবশ্য

তারপরেও এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। যারা নিউ ফ্রয়েডীয়– যারা মানুষের সামাজিক দিকটাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন তারা অবশ্যই তাঁর এই ধারণাকে বর্জন করেছেন। তারা বলেছেন যে মানুষ বায়লোজিক্যাল এনিমেল না স্যোসাল এনিমেল? নাকি উভয়ই? আমিও তাদের সাথে একমত। কিন্তু বায়লোজিক্যাল ব্যাপারটা তো আমরা বাদও দিতে পারি না। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যতটুকু জানতে ও বুঝতে পেরেছি মানুষের সাথে কথা বলে দেখেছি যে, মানুষের বায়লোজিটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। একটা মানুষের বায়লোজিক্যাল নিড আছেই কিন্তু প্রথমে 'হাঙ্গার' পরে 'সেক্স' আসে। এখন বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটাকে যেন মোড়ক দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। সেক্স নিয়ে আলোচনাই করা যাবে না। কাজেই এরকম রাখো-ঢাকো করে রাখার কারণে আমরা কিন্তু সুস্থভাবে বা সহজভাবে বিষয়টা সম্পর্কে জানতে পারছি না। আমি মনে করি আমাদের জ্ঞানের জায়গা থেকে সেক্স বিষয়ে আলোচনা বা ধারণা আসা উচিত।

হালখাতা

আমাদের দেশে বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের সেক্স সম্পর্কে জ্ঞান দানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় যে বৈরিতা লক্ষ্য করা যায়, সে সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?

মেহতাব খানম

আমি মানুষের সাথে আলোচনা করে দেখেছি যে মানুষ তার বায়লোজিক্যাল দিকটা ফিল করে। কিন্তু যেহেতু পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্র এর দায়িত্ব নিতে চায় না সেহেতু সে এটাকে অবদমন করে রাখে। এবং রাখার কারণে কিন্তু আউটকাম ভালো আসে না। ফলে সমাজে নানা রকম বিকৃতি দেখা দেয়। কেননা সেক্স সম্পর্কে এরকমের অবদমনের ফলে বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীরা বিষয়টা অন্যভাবে জানছে। তখন তাদের কৌতূহলও বেড়ে যায়। এরা নানারকম সেক্স-ভার্গালিটির মধ্যে পড়ে যায়। এখানে কিন্তু ফ্রয়েড সত্য হয়ে যায়। এখানে তার বায়লোজিক্যাল তত্ত্বটা এসে যায়। কাজেই আমি বায়োলোজিক্যাল ও স্যোসাল উভয় দিকটাকেই গুরুত্ব দিতে চাই। ফ্রয়েডের বিপক্ষে যারা মত প্রকাশ করেছেন তারা সবাই মূলত প্রথমে ফ্রয়েডের সাথে কাজ করেছেন পরে আলাদা হয়ে গেছেন। তাদের মধ্যে এরিখ বার্ন অন্যতম। তার ওপর ফ্রয়েডের ছায়া আমরা দেখতে পাই। এরিখ বার্ন ফ্রয়েডের ব্যাখ্যাটাকেই আরেকটু উন্নত ভারসনে আমাদের দিয়েছেন। কিন্তু ফ্রয়েডের থিওরীর প্রভাব তার প্রতিষ্ঠিত জায়গাতেই রয়েছে। কাজেই ফ্রয়েডকেই প্রথম আমাদের ধরে নিতে হবে, পরবর্তী ধাপগুলোতে প্রায় সবাই তার অনুসারী। কিন্তু তারা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তাদের মতকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। ফ্রয়েড-এর মধ্যে সামাজিক যে বিষয়টির কমতি ছিল।

হালখাতা

একটা শিশু তো আসলে মায়ের সাহচর্যে থেকে মায়ের উষ্ণতা পেয়ে বড় হতে চায়। এখন শিশুর প্রয়োজন হল 'মা'কে। কিন্তু চাকরিজীবী মায়েদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই সন্তানের নিডটা ফুলফিল হচ্ছে না। এই নিডটা তাকে অবদমন করতে হয় এবং পরবর্তী সময়ে এর প্রভাবটা তার ওপরে নিশ্চয়ই পড়বে। কাজেই শিশুটা যে মায়ের আদর, স্নেহ, স্পর্শ ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সেটা পরিমাপ করা তো মুশকিল। তবে এটা সবসময়ই আমাদের চিন্তা করতে হবে যে প্রতিটা শিশুই আলাদা। তাছাড়া সাধারণত ছোটবেলা থেকেই 'ডোন্ট' শুনে শুনে একটা শিশু বড় হচ্ছে। এরিখ বার্ন সেরকম কতগুলো 'ডোন্ট' আইডেন্টিফাই করেছেন, তার একটা 'ডোন্ট' হচ্ছে 'ডোন্ট এগজিস্টেন্স'। 'ডোন্ট এগজিস্টেন্স' মানে তো 'তোমার বেঁচে থাকার দরকার নেই'। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি।

মেহতাব খানম

'ডোন্ট এগজিস্টেন্স' নিয়ে যে শিশুটা বড় হচ্ছে তার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাটা বেশি থাকে। মা হয়তো কোনো প্রতিবেশিকে বলছেন, যখন শিশুটি পাশের রুমে অবস্থান করছে মা হয়তো তা জানেন না, যে, জানো, এই বাচ্চাটা আমি চাইনি। যখন গর্ভে ধারণ করেছি তখন আমি খুব মন খারাপ করেছি। তখন পুরো সময়টাই আমার মনে হয়েছে যে বাচ্চাটা না হলে ভালো হত। তখন তার শিশুটি কিন্তু এ কথা শুনল। এখন একই মায়ের দুটি শিশু যদি একথা শোনে তাহলে দু'জন কিন্তু একই ম্যাসেজ নিবে না। তাদের একজন মনে করবে, ও মাই গড! আমার জন্মটাই তাহলে অনাকাঙ্ক্ষিত! আমাকে চায়নি আমার মা! তাহলে আমি কেন বেঁচে থাকব! এই শিশুটা কিন্তু অন্যরকমভাবে মেসেজটা নিয়ে নিল। হয়তো এত গুছিয়ে সে বিষয়টা ভাববে না। তবে সে এটুকু বুঝবে যে তার জন্মটা অনাকাঙ্ক্ষিত। অন্যশিশুটি কিন্তু একই কথা শুনেছে। কিন্তু শুনলে কী হবে, সে হয়তো কনসেপ্টটা নেয়নি। সে তাকে অবদমন করেছে কি-না আমরা জানি না। কাজেই শিশুটি মাকে না পেলেই সে নিজেকে অবদমিত করছে– এটা এতটা জেনারালাইজড করা বোধ হয় সম্ভব না। কেননা প্রতিটা মানুষ ভীষণভাবে আলাদা। একজনকে অন্যজনের সাথে কোনোভাবেই মেলানো যাবে না।

হালখাতা

প্রতিটা অস্তিত্বের একটা নিজস্ব গতি আছে। একটা শিশুরও নিজস্ব একটা জগৎ ও গতি আছে। সেক্ষেত্রে পরিবেশ তাকে হয়তো সাপোর্ট দেয়, সহযোগিতা করে। তো শিশুর নিজস্বতা সম্পর্কে যদি কিছু বলেন?

মেহতাব খানম

মা-বাবারা বলেন, আমার শিশু আমার মতো করে ভাববে। আমার মূল্যবোধগুলো সব ওর মধ্যে দিয়ে দেব। মা-বাবা মনে করে, 'দে আর মাই এক্সটেনশন'। আমার

শরীরেরই একটা অংশ আমার শিশু। আসলে এটা কিন্তু একদমই ঠিক না। যে মুহূর্তে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হচ্ছে সে মুহূর্ত থেকেই পৃথিবীতে তার আলাদা একটা সত্তা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু বাবা-মা হিসেবে আমরা শিশুকে সেভাবে বিচার না করে আমরাই নিজের শরীরের অংশ মনে করে আমার মূল্যবোধ চিন্তা-চেতনা-ইচ্ছা-স্বপ্ন-অনিচ্ছা ইত্যাদি ওর মধ্যে দেয়ার চেষ্টা করি। যেমন– আমাদের সাইকোলোজি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলের বাইরে দল করে বসে থাকা মায়েদের সাথে আলোচনা করেছে। তারা বলেছে আপনারা কি আপনাদের শিশুদের সাইকোলোজি বোঝেন? তখন তারা উত্তরে বলেছে, ওদের আবার সাইক্লোজি কী? আমি যা বলব সেটাই ওর সাইকোলোজি। ওর আবার আলাদা সাইকোলোজি কী? – এই যে শিশুদের আমরা একদম প্রাধান্য দিচ্ছি না এতে করে তাদের প্রতি মূল্যায়নটা মোটেও সুস্থ ও স্বাভাবিক হচ্ছে না। একটা শিশুর স্বপ্ন, চাওয়া-পাওয়া যে আলাদা সেটা আমরা একদম চিন্তা করি না। যেমন উন্নত দেশগুলোতে কিন্তু শিশুদের জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কী খাবে? কোন ড্রেসটা পড়বে? লালটা না নীলটা। শিশুটি যদি বলে লালটা তাহলে কিন্তু ওকে নীলটা পড়তে বাধ্য করা হয় না। কিন্তু এদেশের মায়েরা কী করেন? তারা বলেন, আমি যেটা বলছি সেটাই তুমি খাবে, সেটাই তুমি পড়বে। এতে করে শিশুটির কিন্তু বলার ক্ষমতা আর তৈরি হয় না এতে করে একটি শিশুর শ্রদ্ধাবোধ, চিন্তা করা, সিদ্ধান্ত তৈরি করা– এসব গুরত্বপূর্ণ ক্ষমতাগুলো হারিয়ে ফেলে।

হালখাতা

একটা কথা প্রচলিত আছে যে, ভারতে নারীর মূর্তিকে পূজা করা হয় একইভাবে ঘরে ফিরে পুরুষ নারীকে অর্থাৎ বউকে পেটায়। আর বাংলাদেশে বউ-পেটানো সংস্কৃতি তো সর্বশ্রেণীর মধ্যে অসুখের মতো এখনো বর্তমান। নারী-পুরুষের এধরনের সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলুন?

মেহতাব খানম

এটা শুধু ভারতীয় বা বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। এটা সব সমাজেই বর্তমান। আমাদের জন্মের পর থেকেই একটা পুরুষশাসিত সমাজ দেখতে পেয়েছি। যেন পুরুষ মানেই শক্তিধর। মেয়েরা কিন্তু বায়লোজিক্যালি পুরুষদের চেয়ে কম শক্তিশালী নয় বরং আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে মেয়েরা একটা জায়গায় পুরুষের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। আমি আমার ব্যক্তিগত কাজের জায়গা থেকে বলছি, মেয়েরা কিন্তু ইমোশনালি অনেক স্ট্রং। মেয়েরা যত নিতে পারে ছেলেরা তার অর্ধেকও নিতে পারে না। একটা মেয়ে কিন্তু পার্টনার ছাড়া জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু একটা ছেলে তা পারবে না। ছেলেরা ভীষণভাবে নির্ভরশীল। আর কাজের জায়গাগুলোতে তারা ইমোশনাল। দু'জন কর্মজীবী স্বামী-স্ত্রী একই সাথে বাড়িতে ফেরে– কিন্তু স্বামী বিশ্রাম নিতে থাকে আর স্ত্রী তখন হয়তো সন্তান দেখাশোনা করে বা রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। স্বামী তখন হয়তো বলছে, প্লিজ একটু চা বানিয়ে দাও না, একজন

নারী ঘরে-বাইরে দু'টা জায়গায়ই সামলাচ্ছে, একটা ছেলে কি তা করছে? এটা পুরোপুরি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার।

হালখাতা

তাহলে কী বিষয়টা এরকম যে আমাদের সমাজের মেয়েরা ছোটবেলা থেকেই অবদমিত হতে হতে নিজেদের মধ্যে এক প্রকার শক্তি নিজেদের মধ্যে এভাবে তৈরি করে নিচ্ছে?

মেহতাব খানম

হ্যাঁ, তা হতে পারে। একদিক থেকে কথাটা সত্যি। আসলে হয় কি, ছোটবেলা থেকেই বিশেষ করে মা তার মেয়েকে এটা বলে যে, তুমি মেয়ে, তুমি সর্বংসহা হবে। এই যে তাকে এই মেসেজটা দিয়ে দেয়া হল সেখান থেকে সে তো অবদমিত হচ্ছেই। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে আমাকে বলা হল যে তোমাকে এটা করতে হবে– কিন্তু ওটা করা আমার পছন্দ না। আমি তখন ভাবলাম এটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমার কী করা উচিত তখন আমি ওখান থেকে বেরিয়ে আসলাম। আবার বলা হল ওটা করো না। কিন্তু আমার করতে ইচ্ছে হচ্ছে তখনও আমি বেরিয়ে আসার জন্য পথ খুঁজলাম। এবং বেরিয়ে এলাম। কথা হল– এই প্রাকটিসের মধ্যে দিয়ে আমি আসলে একটা জায়গা তৈরি করে নিচ্ছি। এসব জায়গায় কিন্তু আমি অবদমিত হচ্ছি। কিন্তু নিয়তির কাছে নিজেকে চিরতরে সঁপে দিচ্ছি না। দাঁড়াবার চেষ্টা করছি। অন্যদিকে একটা ছেলের ক্ষেত্রে যখন সে কিছু করতে চায় তখন বাবা-মা তাকে সেটা করতে দেয়। তাতে করে ছেলেটি তেমন বাধার সম্মুখীন হচ্ছে না। এ ধরনের জটিল পরিস্থিতি তাকে অবদমন করছে না। ফলে তার কাছে ঐ পথ খোঁজার দরকারও হচ্ছে না।

একটা ছেলেকে আসলে বিধি-নিষেধ কম দেয়া হচ্ছে। যেমন আমি সেক্সের ক্ষেত্রে বলব– ছেলেরা কেন এত ব্লুফিল্ম বেশি দেখে। মেয়েরা এত বেশি দেখে না। আমি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখেছি, ছেলেরা কিশোর বয়স থেকেই এই অভিজ্ঞতা নিয়ে বড় হচ্ছে। দল করে ছেলেরা ব্লুফিল্ম দেখছে। এখন মেয়েদের কী এরকম চিন্তাভাবনা করার কথা না? মেয়েরা কেন এতটা করছে না। জাস্ট বিকজ মেয়েদের বলা হচ্ছে যে, সেক্স তোমার জন্য না। এ বিষয়টা তোমার জন্য না। সেকারণে মেয়েদের গতিবিধির ওপর অভিভাবকদের একটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ থাকে। ছেলেরা যতটা পারে মেয়েরা ততটা স্বাধীনভাবে বাইরে চলাফেরা করতে পারে না।

হালখাতা

ধর্ষণের পেছনে কি অবদমন বিষয়টি কারণ হতে পারে?

মেহতাব খানম

এক্ষেত্রে অবদমন কিছুটা হলেও কাজ করতে পারে কিন্তু আমি তাকে পুরোপুরি অবদমন বলতে চাচ্ছি না আর তা মনেও করছি না। এখানে কিন্তু সাংঘাতিকভাবে

অন্যান্য বিষয় কাজ করছে। ধর্ষণ বিষয়টি পুরোপুরি মনস্তাত্ত্বিক। এখানে এক প্রকার পাওয়ার গেইম থাকতে পারে। জীবনের কোনো-না-কোনো ঘটনা এক্ষেত্রে তাকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। কারণ মানুষের মানসিক জগৎ খুবই জটিল। সে কারণে ধর্ষণ যে শুধু অবদমন থেকে হয় তা নয়।

হালখাতা

আমাদের দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে পরকীয়া বা লিভ-টুগেদার– এ দুটি বিষয়কে আপনি কীভাবে দেখেন? বিশেষ করে পরকীয়ার সঙ্গে অবদমনের কোনো সম্পর্ক আছে কি না?

মেহতাব খানম

পরকীয়া বিষয় নিয়ে আমার কাছে যেসব সমস্যা আসে তাতে আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি যে, একটা কাপল তারা যদি পরস্পরের শারীরিক ও মানসিক চাহিদা মেটাতে পারে, তাদের মধ্যে যদি খোলামেলা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকে তাহলে তো তাদের পরকীয়া হওয়ার কথা না। কিন্তু যদি তাদের সম্পর্কের মধ্যে কোনো ভাঙনের সৃষ্টি হয় কেবল তখনই পরকীয়া ঘটতে পারে। এর সঙ্গে দমন-অবদমনের বিষয় থাকতেই পারে। কিন্তু লিভ-টুগেদার তো ভিন্ন ব্যাপার। যে সম্পর্কের মধ্যে আইনী দিক দরকার হয় না, শুধুমাত্র আস্থা-সম্পর্কের ভিত্তি সেটা তো অনেক উচুঁ সম্পর্কের স্ত র। মানুষে মানুষে এরকম সম্পর্কই হওয়া দরকার কিন্তু মানুষ যেহেতু অতটা উচুঁ স্তরের সবসময় নয় বা সকলে নয়, তাই বিয়ে পদ্ধতির দরকার হয়। এটা মানুষের জন্য সম্মানের কথা নয়, যতটা সম্মানের সে হতে পারত লিভ-টুগেদারের মাধ্যমে।

জা কি র তা লু ক দা র

[জন্ম ২০ জানুয়ারি ১৯৬৫ নাটোরে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক এবং স্বাস্থ্য-অর্থনীতিতে উচ্চ শিক্ষা। লিখছেন গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৬। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ স্বপ্ন কিংবা উদ্বাস্তু পুরাণ (গল্প ১৯৯৮), কুরসিনামা (উপন্যাস ২০০২), হাঁটতে থাকা মানুষের গান (উপন্যাস ২০০৬)। তাঁর রচনায় দলিত মানুষের বাস্তবতা ও সেখান থেকে বেরিয়ে আসার তাগিদ প্রধান হয়ে ওঠে।]

হালখাতা

আপনার মতে আমাদের সমাজ-ভাবনার নিরিখে অবদমন, দমন ও সংযম এই তিনটি বিষয়ের ব্যাখ্যা কী?

জাকির তালুকদার

সংযম তো একমাত্র তখনই দেখানো সম্ভব, যখন কারো হাতে পর্যাপ্ত অধিকার এবং তা প্রয়োগ করার মতো ও যথেচ্ছাচার করার মতো ক্ষমতা থাকে। সেই অবস্থা আমাদের ভূখণ্ডে কতজন মানুষের আছে? সংযমকে পুঁজিবাদী উন্মেষলগ্নে এক মহৎ গুণ হিসাবে বিবেচনা করা শুরু হয়। রেনেসাঁসের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত যে সদর্থক শব্দগুলো– যেমন অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করা, ভিন্নমতের অবকাশ থাকা, অধ্যবসায়, কৃচ্ছতাসাধন, সময়ানুবর্তিতা, যুক্তিশীলতা– এগুলোর সঙ্গে সংযমকেও মহীয়ান করে তোলার চেষ্টা করা হয়। সেই অর্থে আপনার উল্লিখিত তিনটি শব্দ বা প্রপঞ্চের মধ্যে সংযম একটি ইতিবাচকতা বহনকারী শব্দ বটে। কিন্তু আমাদের সমাজে সংযমকে প্রায়ই অবদমনের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা হয়। অনেকক্ষেত্রে অবদমনকেই সংযম নাম দিয়ে এক ধরনের সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করা হয়। দুর্বল যেমন মার খেয়ে মার হজম করে নিজকে নিজে সান্ত্বনা দেয় সংযমের কথা বলে। কিন্তু যার কিছু করার ক্ষমতাই নেই, তার আবার সংযম কিসের? সেই হিসাবে আমাদের দেশে সংযম অভ্যাস করেন, এমন লোকের সংখ্যা কোটিতে গুটিক।

আর দমন এবং অবদমন এই দুটি জিনিস অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। দমনের শিকার অবদমনে বাধ্য হয়। যেহেতু অবদমন মানেই বিকৃতির আশংকা সৃষ্টি, তাই তা মন থেকে রিলিজ হয় কোনো-না-কোনো বিকৃতির মাধ্যমে। যদি সম্ভব হয়, অবদমনকারী তার অধীনস্থদের ওপর দমন-পীড়ন চালিয়ে শোধ নেয়। এইভাবে দমন এবং অবদমন

নেমে আসতে থাকে সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্নস্তর পর্যন্ত। বুশ দমনপ্রক্রিয়া চালায় পৃথিবীর দেশে দেশে অন্যান্য রাষ্ট্রনেতাদের ওপর। যেমন আমাদের দেশেও। আমাদের দেশের শাসকসমাজ নিজের অবদমনের ক্যাথারসিস ঘটায় দেশজোড়া সাধারণ মানুষের ওপর। কর্মক্ষেত্রে দমন ও অবদমনের শিকার পুরুষ এসে গৃহস্থালি জীবনে দমননীতি প্রয়োগ করে স্ত্রীর ওপর। বউ চাক্‌রে হলেও ইতরবিশেষ হয় না। কেননা বউ তো স্ত্রীলিঙ্গ। অতএব পুংলিঙ্গের দমননীতি তাকে সয়ে যেতে হয়। তখন অবদমনের সার্বিক ভার বয়ে চলতে হয় সাধারণ স্ত্রীসমাজকে। তার মোক্ষণের কোনো জায়গা নেই। এর ফলে দেখা দেয় জীবনের রূপ-রস থেকে অকালে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, আত্মহত্যা করা, নানা মাত্রার সিজোফ্রেনিয়ায় ভোগা ইত্যাদি। তবে একটি কথা মনে রাখতে অনুরোধ জানাব যে আমি দেশের সব ধরনের সব শ্রেণীর মানুষের ওপর অবদমনের কী কী প্রভাব পড়ে তা নিশ্চিত করে বলার অধিকারী কেউ নই। কিছুদিন আগে একটি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে বাংলাদেশের ১৬ শতাংশ মানুষ মানসিক রোগি। আমার ধারণা মাত্রাটি এর চেয়ে অনেক বেশি বৈ কম নয়। সমাজে বিদ্যমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সংযম প্রপঞ্চটি ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোনো কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। তবে দমন এবং অবদমন রাষ্ট্রে ও সমাজে সর্বগ্রাসী অবস্থান নিয়ে নিয়েছে। সে কারণে বিষয় দুটি নিয়ে এখনই ব্যস্ত হয়ে ওঠার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

হালখাতা

'অবদমন' শব্দটির দার্শনিক তত্ত্বের দিক বাদ দিলেও, আমাদের সমাজে শব্দটির যত্রতত্র ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। এই সমাজে প্রধানত যৌন অবদমনকে বোঝাতে শব্দটির অধিক ব্যবহার ঘটে। প্রশ্ন হল যৌনতার দিক ছাড়া, আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবদমনগুলো কী এবং সেগুলো কীভাবে ঘটে?

জাকির তালুকদার

অবদমন এবং লিবিডো– এই উভয় শব্দই ফ্রয়েড সাহেবের কল্যাণে ব্যাপক প্রচারিত হয়েছে। অনেকের কাছেই তাই শব্দদুইটি প্রায় সমুচ্চারিত হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু বিবেচ্য বিষয় তো হওয়া দরকার আস্ত মানুষটি। শুধু যৌনতা নিয়ে তো আর আস্ত একটা মানুষ হয় না। তার আরো অজস্র দিক রয়েছে, মাত্রা রয়েছে। বিলাতি সাহেবদের বস্তুগত মৌলিক চাহিদা নিয়ে যেহেতু ভাবতে হয় না, তাই তারা যৌনতা নিয়ে বেশি ভাবার অবকাশ পান। সেই একদেশদর্শিতা থেকেই ফ্রয়েড সাহেবের লিবিডো-নির্ভর কচকচানি। বাংলা কথাসাহিত্যের দিকপাল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যদ্দিন বাপের ঘরের ভাত খেয়েছেন, তদ্দিন তিনিও ফ্রয়েড দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু যখন দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধে নামতে হল তখন তিনি নিজে নিজে উপলব্ধি এবং স্বীকার করলেন যে ক্ষুধা অগ্রগণ্য। যৌনক্ষুধা আসে এই মৌলিক চাহিদার পরে। তার মানে মোদ্দা কথাটি এই যে অবদমন মানে শুধু যৌন অবদমন নয়।

রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক অবদমনের তালিকা করতে বললে সেটি দ্রৌপদীর শাড়ির মতো অন্তহীন হবে। আপনি কয়টার কথা বলবেন? বরং আর কোনটি বাদ রয়েছে সেটাই তো খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব হবে। রাজনৈতিক অবদমনের নমুনা হাজারটা। সেটি দলের মাধ্যমেও আসে, দলবহির্ভূত রাজনীতির মাধ্যমেও আসে। রাজনৈতিক অবদমনের উদাহরণ খুঁজতে বেশি দূর যেতে হবে না। আমাদের তথাকথিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই তো অবদমনের বিরাট হাতিয়ার। এ পদ্ধতির মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত চাপিয়ে দিয়ে সংখ্যালঘুকে অবদমনের শিকারে পরিণত করা হয়। সংখ্যার বা ভোটের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তের সঠিকতা নিরূপিত হতে পারে না। বাংলাদেশের মতো সমাজে এই কথা তো আরো বেশি প্রযোজ্য। সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা-গবেষণা এবং উন্মুক্ত বিতর্ক। তা না করে ভোটের নামে জগদ্দলের মতো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বারংবার আত্মঘাতী প্রমাণিত হয়েছে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ছলে-বলে-কৌশলে সামন্তবাদী মূল্যবোধগুলো টিকিয়ে রাখা এবং তা আরো বেশি বিকশিত করার মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠী মানুষের ওপর দমননীতি চাপিয়ে দিচ্ছে। সামাজিক অনেক কুপ্রথাকে অস্বীকার তো দূরের কথা, সেগুলো সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই তোলা যাচ্ছে না জনসমক্ষে। অবদমনের প্রশ্নে এর চেয়ে নির্মম পরিস্থিতি আর কী হতে পারে! আমার জীবনাচরণ আর চিন্তার ধরনই তো আমার সাংস্কৃতিক জীবন। সেখানে যে কোনো অংশের অবদমনই তো সাংস্কৃতিক অবদমন। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের সকল মিডিয়া ও মুখপত্র যেমন মন্ত্রী-নেতা-আমলা-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী-মোল্লা-পুরুতদের ব্যবহার করে মানুষের মগজ ধোলাই বা মনোজগতে উপনিবেশ স্থাপনের প্রক্রিয়া প্রতিমুহূর্তে জোরতর হচ্ছে। তাই কী কী ভাবে অবদমন ঘটে তার চাইতে কী কী ভাবে ঘটে না, সেই তালিকা তৈরি করাই সহজতর হবে বলে মনে হয়।

হালখাতা

আপনি আমাদের সঙ্গে একমত হবেন যে, আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার প্রচণ্ড মাত্রায় অবদমিত অবস্থায় আমাদের রেখেছে। কিন্তু এ যাবত কালে বাঙালি চিন্তাশীল লেখকদের প্রায় সকলে বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছেন। এর পেছনে কারণ কী?

জাকির তালুকদার

আপনার এই অভিযোগটি অনেকাংশেই সত্য। বাঙালি সৃজনশীল লেখকরা তাঁদের কাব্যে-উপন্যাসে-গল্পে যেভাবে অবদমনের বিষয়টিকে এনেছেন, ভাবুক-চিন্তাশীল প্রাবন্ধিকরা সেভাবে গুরুত্ব দিয়ে অবদমনের বিষয়টিকে আলোচনায় আনেননি। হতে পারে, তাঁরা বিষয়টিকে ততখানি গুরুত্ব দিতে চাননি বা আরো রূঢ়ভাবে বলা চলে, ব্যাপারটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অদ্যাবধি তাঁরা তা বুঝতেও পারেননি। আর যদি চিন্তাশীলতার কথা বলেন, তাহলে আমাদের দেশের চিন্তাশীলদের চিন্তা বা মনন উগড়ে

দেয়ার জায়গা মূলত দৈনিক পত্রিকার কলাম ও উপসম্পাদকীয়– এই যা। সেখানে তাঁরা মূলত সাম্প্রতিক ব্যাপারগুলো নিয়েই চর্বিত-চর্বণ করে থাকেন, গরুর অনুকরণে জাবর কাটেন। মদনিষিদ্ধ দেশে তাঁরা অতিসাম্প্রতিকতা আর তাৎক্ষণিকতায় আচ্ছন্ন মাতাল। দূরগামী গভীরতর চিন্তার ছাপ তাঁদের লেখায় দেখা যায় না। আবার একাডেমিক চিন্তাশীল লেখকরা প্রাতিষ্ঠানিক সুরুচির নামে নিজেদের চারপাশে একধরনের অটো-সেন্সরশীপের বাতাবরণ তৈরি করে নেন। সেখানে তাঁরা তাঁদের ভাষায় 'অশিষ্ট' শব্দ বা অনুষঙ্গগুলোকে এড়িয়ে চলাকেই সুরুচির প্রকাশ বলে মনে করেন। যেমন ধরুন, জগদীশ গুপ্ত নিয়ে থিসিস লেখার সময়েও একাডেমিক বুদ্ধিজীবীরা অবদমনের প্রসঙ্গটি শুধুমাত্র উল্লেখ করেই দ্রুত অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। জগদীশ গুপ্তকে কেন্দ্র করে অবদমনের যে একাডেমিক আলোচনাটুকু হতে পারত, সেটুকুও হয় না। আমাদের ইসলামী সুরুচি এবং রাবীন্দ্রিক সুরুচি– দুটোই এই পথের অন্তরায় হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে। আরো একটি কারণ হচ্ছে অভ্যাস। অবদমনকে আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রসঙ্গ হিসাবে মনে না করাটা আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। সর্বোপরি আরো একটি কারণের কথা বলা যেতে পারে। সেটি হচ্ছে বিদেশী দাতাসংস্থাগুলো এখনো 'অবদমন' ইস্যুতে টাকা ঢালতে শুরু করেনি। তারা টাকা দিচ্ছে নারীবাদ, আদিবাসী ইস্যু, এইডস রোগীদের মানবাধিকার, মা ও শিশু, দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলপত্র, পরিবেশ রক্ষা, পোস্ট মর্ডানিজম, নয়াকৃষি আন্দোলন, ওরিয়েন্টালিজম, লালন চেতনা– ইত্যাদি বিষয়ে। কাজেই আমাদের চিন্তাশীলরা এখনো অবদমনের দিকে চিন্তাকে পরিচালিত করার সময় ও রসদ পেয়ে ওঠেননি।

হালখাতা

আমাদের এখানে অবদমনের ক্ষেত্রে প্রায়ই ধর্মকে দায়ী করা হয়। কিন্তু অনেকের মতে ধর্মের ভেতরে থেকেও পৃথিবীর কোনো কোনো রাষ্ট্র মুক্তসমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, যেমন মালয়েশিয়া। আবার একই রাষ্ট্রে একাধিক রকমের সমাজও তৈরি হয়েছে, যেমন লন্ডনে কট্টরমনা এবং মুক্তমনা দুই প্রকার লোকের সংখ্যাই প্রায় সমান। কথা হল বাংলাদেশে মুক্তসমাজ তৈরির ক্ষেত্রে ধর্ম এমন সমস্যা কিনা যা সমাধানযোগ্য নয় ? নাকি ধর্মকে সময়পযোগী ও কল্যাণমুখী করার জন্য যোগ্য ও মেধাবী লোকগুলো ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কারণে এখানে মুক্তসমাজ তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না?

জাকির তালুকদার

অবদমনের ক্ষেত্রে ধর্ম এককভাবে দায়ী, এমন কথা বলা আদৌ ঠিক নয়। বরং অবদমনের সঙ্গে আধিপত্যের ধারণার একটি যোগসূত্র রয়েছে। আধিপত্যকে যে যে উপাদান শক্তিশালী করে, সেগুলো সবই অবদমনের ক্ষেত্রে দায়ী। ধর্ম তাদের মধ্যে একটি উপাদান। এটি হয়তো প্রভাবসম্পাতি, তবে একক উপাদান নয়। যে কোনো রীতি-নীতি শুরুতে প্রগতিশীল থাকে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা প্রাসঙ্গিকতা হারায়। কিন্তু এটি নিজের অবস্থান ছাড়তে চায় না। ধর্মও তো কিছু রীতি-নীতিরই সমষ্টি। তাই

তার নবীকরণ, নবীকরণের নবীকরণ, অব্যাহত নবীকরণের প্রক্রিয়াটি চালু না থাকলে অবশ্যম্ভাবীরূপেই সে এক সময় মৌলবাদে পরিণত হয়। ধর্মের এই মৌলবাদী রূপটিই সমাজ ও ব্যক্তির জন্য ভয়ংকর। বর্তমানে সেই অবস্থাই বিরাজমান আমাদের দেশে। মালয়েশিয়া বা লন্ডনের সমাজে ধর্ম বা সংস্কৃতির চেয়ে আর্থিক গতিশীলতাকে বেশি মূল্য দেয়া হয় বিধায় সেখানে ধর্মের ভূমিকা দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারিতে। তদুপরি সেখানে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। ফলে ধর্মতন্ত্র নিজের জোরে যতটুকু বিকশিত হতে পারে, ততটুকুই তার শক্তি। তার সঙ্গে সেখানে রাষ্ট্রশক্তির যোগ নেই। কিন্তু বাংলাদেশে ধর্ম রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পেয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যর একটা মানে হল সন্ত্রাসী আনুকূল্য। কারণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র হচ্ছে সবচেয়ে বড় এবং সংগঠিত সন্ত্রাসী শক্তি।

সত্যি কথা বলতে আমাদের দেশে মুক্তসমাজ তৈরির ক্ষেত্রে *রাষ্ট্রশক্তির সাথে সমন্বিত ধর্ম* এটা প্রায় অনতিক্রম্য একটি বাধা বলেই আমার কাছে মনে হয়। যা অন্তত সহজ এবং আশু সমাধানযোগ্য নয়। এ সমস্যা পূর্বে এতটা প্রকট ছিল না যা বর্তমানে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইদানীং আবার পোস্ট মর্ডানিজম, লিবারেশন থিয়োলজি, ইউরোকেন্দ্রিকতার বিরোধিতা– ইত্যাকার জিনিসের মাধ্যমে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ধর্ম-ধ্বজাকে উঁচু করে তুলে ধরতে চাইছেন। কেউ কেউ শ্রেণীসংগ্রাম ও জেহাদ এক জিনিস বলে প্রচার করছেন। তাদের অবস্থান মৌলবাদী ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির অবস্থানের খুব কাছাকাছি।

আপনার প্রশ্নের শেষের অংশটির মধ্যে উত্তরটিও লুকিয়ে আছে। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে যোগ্য ও মেধাবী বলতে আপনি কাদের বোঝাতে চাইছেন? তারা কি শার্ট-প্যান্ট পরা, সেকুলার প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ ডিগ্রি অর্জন করে রাষ্ট্রের বড় বড় পদে আসীন ব্যক্তিরা? তা যদি হয়, তাহলে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এদের অন্তরাত্মার অন্ধকার বাংলা ও ইংরেজি না-জানা মোল্লাদের চেয়েও বেশি। তবে যদি চিন্তাশীল জ্ঞানপথের পথিকদের কথা বলেন, তাহলে আপনার প্রশ্নের উত্তর হবে অবধারিতভাবে হ্যাঁ-বাচক। খেয়াল করলে দেখবেন যে প্রথম যুগের ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি মুসলমান লেখকরা লিখতে শুরু করেছিলেন ধর্ম-সংস্কার ও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়েই। এই ধারাটি কম-বেশি বহমান ছিল গত শতকের চল্লিশের দশক পর্যন্ত। তারপর বাঙালি মুসলমান ভাবুকরা পুরোপুরিই ত্যাগ করলেন ইসলামি থিওলজির চর্চা। গত ষাট বছরে এই চর্চা পুরোপুরি চলে গেছে ধর্মজীবী মোল্লদের হাতে। ফলে এখন কোনো শিক্ষিত মানুষ ইসলাম সম্পর্কে কোনো কথা বলতে গেলেই ধর্মজীবীরা তাকে মনে করে অনধিকার চর্চা। তেড়ে এসে বলে– মেরে আঙ্গনা মে তুমহারা কেয়া কাম হায়!

হালখাতা

বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ফ্রয়েডের 'অবদমন তত্ত্ব'কে আপনি কিভাবে দেখেন ?

জাকির তালুকদার

ফ্রয়েড সাহেবের 'অবদমন তত্ত্ব' তাঁর মনঃসমীক্ষণের একটি মৌলিক স্তম্ভ। আমার দিক থেকে বলার কথাটি হচ্ছে কোনো অতি বেদনাময় অভিজ্ঞতাকে অহং যখন সহ্য করতে পারে না তখন অহং এই অভিজ্ঞতাকে জোর করে নির্জ্ঞান মনে পাঠিয়ে দেয়। এই পদ্ধতিকেই অবদমন বা নিষ্পেষণ বলা যায়। চেতন অহং এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাকে নিষ্পেষণ করে না। এই নিষ্পেষণের কথা চেতন অহং জানেই না। নির্জ্ঞান অহং-ই এই অবদমন করে থাকে। কোনো প্রচণ্ড শক্তিশালী কামনা যদি এমন হয় যে সেই কামনা মেটাতে গেলে অহং-এর ভীষণ ক্ষতি হতে পারে তখনই এই বেদনাময় অভিজ্ঞতার আবির্ভাব হয়ে থাকে। এই রকম অবস্থায় অহং দুইটি বিপরীতমুখী সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই টানাপোড়েনে পড়েই অহং বেদনা অনুভব করে। বেদনা অতি অসহনীয় হলে নির্জ্ঞান অহং এই অভিজ্ঞতার কথা একবারে ভুলে যায়। কিন্তু নির্জ্ঞান মনে প্রেরিত হলেও এই অভিজ্ঞতা মুছে যায় না। নির্জ্ঞান মনে বিপরীতমুখী এই শক্তিদ্বয় একটি মীমাংসা করে নেয় এবং এই মীমাংসাই আমাদের অগোচরে রোগলক্ষণ রূপে প্রকাশ পায়।

এই তত্ত্ব পরে আরো বিকশিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটুকু প্রায় পুরোপুরি প্রযোজ্য। দেশটির ব্যক্তি, ব্যষ্টি কিংবা রাষ্ট্রদেহের সর্বত্র অবদমনজনিত বিকৃতি ও বিকারের দগদগে ঘা!

হালখাতা

সমাজবাদী রাষ্ট্রের তুলনায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা উপন্যাস রচনার জন্য অধিক উর্বর এলাকা, একইভাবে অবদমিত সমাজও উপন্যাসের চরিত্র খুঁজে পাওয়ার জন্য তথা সাহিত্য সৃষ্টির জন্য উর্বর সংস্থান। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

জাকির তালুকদার

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসীরা আপনার সাথে শতভাগ একমত পোষণ করবে না। তবে পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে আপনার উক্তির কিছুটা সত্যতা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। রাশিয়াতে অক্টোবর বিপ্লবের আগে উপন্যাসে যে অফুরন্ত তারকার মিছিল দেখা গেছে, তা একসময় থেমে গেছে। তবে তার জন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণই যে দায়ী, এমনটি বলা যাবে না। কেননা সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াতেও অনেক উঁচুমানের লেখক এসেছেন। নিকোলাই অস্ত্রভস্কি, রাসুল হামজাতভ, চেঙ্গিজ আইৎমাতভের মতো লেখকরা প্রতিভায় ন্যূন ছিলেন না। আবার চীনের দিকে যদি তাকান, তাহলে বিপ্লবের আগেই বলুন আর পরেই বলুন কিংবা বর্তমানের অধঃপতন পর্বের কথাই বলুন– তেমন কোনো উপন্যাস চোখে পড়ে না। পশ্চিমা মিডিয়া গাও দিয়াংকে নোবেল পুরস্কার দিয়েও বিশ্ববাসীর দৃষ্টিকে চীনের উপন্যাসের দিকে ফেরাতে পারেনি। কারণ সেখানে সাহিত্যিক ঐতিহ্য সেইভাবে নেই । তাহলে শুধুমাত্র সামাজিক অবস্থাই নয়, উপন্যাসস্রষ্টার সক্ষমতার প্রশ্নটিও সমানভাবে জরুরি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন, লক্ষ লক্ষ তথাকথিত ভালো মানুষ (!) নিয়ে গল্প লেখা যায় না, গল্প লেখা যায় চোরকে নিয়ে। তাই অবদমিত সমাজব্যবস্থায় অস্বাভাবিকতা ও বিকৃতি নিয়ে ঘুরে-বেড়ানো লোকের সংখ্যা বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু আমার মত হচ্ছে যদি উপকরণের অভাবে উপন্যাস লেখা বন্ধ হয় হোক (তেমনটি কখনোই ঘটবে না), বা উপন্যাস লেখা না সম্ভব হোক, তবু একটা বিকৃতিহীন অবদমনহীন সমাজ তৈরি হোক।

হালখাতা

মানুষ কি প্রকৃতিগতভাবেই বেপরোয়া ধরনের মুক্তমনা? যদি তাই হয়, তাহলে মুক্ত হওয়ার নামে বেপরোয়া হওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্মের বিকল্প কী হতে পারে? হয়ত আপনি এ প্রশ্নের জবাবে বলবেন, 'সংস্কৃতি' হতে পারে সেই যথার্থ বিকল্প। কিন্তু সংস্কৃতিও তো রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মের দীর্ঘকালীন প্রভাবেই গড়ে ওঠে। তাহলে উল্লিখিত প্রশ্নের জবাব শেষপর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে কোথায় গিয়ে?

জাকির তালুকদার

প্রকৃতিগতভাবে মুক্তমনা বটে, কিন্তু বেপরোয়া মুক্তমনা নয়। কারণ প্রকৃতি নিজে বেপরোয়া নয়, সুশৃংখল। স্বাধীন মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সুশৃংখল থাকেন। যেহেতু তিনি নিজের স্বাধীনতার মূল্য বোঝেন, অন্যের স্বাধীনতা যাতে তার দ্বারা খর্ব না হয়, সেদিকে পূর্বাপর তিনি লক্ষ্য রাখেন। আর স্বাধীন মানুষ নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে পারেন। তার জন্য কোনো ধর্ম, সমাজ বা রাষ্ট্র অত্যাবশ্যক নয়। যখন মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করবে, তখন সংস্কৃতিও রাষ্ট্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হবে।

হালখাতা

সাহিত্য তো কখনো সমাজ-নির্ভর মানবীয় ব্যথাকেও অতিক্রম করে চলে। এ ধরনের সাহিত্য কি লেখকের ব্যক্তিগত অবদমনকে পাঠকের ওপর চাপিয়ে তার প্রতিশোধ চরিতার্থ করার প্রয়াস নয়?

জাকির তালুকদার

কোনো সৎ সাহিত্যই সমাজ-নির্ভর মানবীয় ব্যথাকে পাশ কাটিয়ে বা অস্বীকার করে সৃষ্টি হতে পারে না। সমাজের অবদমনের সবচেয়ে বড় চিত্র উঠে এসেছে আলবেয়ার কামুর 'দি আউটসাইডার' উপন্যাসে। কাফকা-র ক্ষীণায়তন উপন্যাসগুলোতেও তার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। এসব লেখা সমাজনির্ভর মানবিক ব্যথাকে অতিক্রম করে নয় বরং সেগুলোকে কেন্দ্রে ধারণ করেই সৃষ্টি হয়েছে।

অবদমিত কাম বা অবদমিত আকাঙ্ক্ষার প্রতিশোধ পাঠকের ওপর নিতে চাওয়া লেখকের সংখ্যা সবদেশে সবকালেই অনেক বেশি ছিল। তারা সবাই সময়ের বুদ্বুদের সঙ্গে ভেসে গেছে, হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। বর্তমানেও তাদের প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট। এদের

সংখ্যাই বেশি। সংখ্যা বেশি বলে তারাই নিজেদের কনটেম্পোরারি ভাবে ও দাবি করে। আমি বলি তারা কনটেম্পোরারি শুধু নয় টেম্পোরারিও।

হালখাতা

একই প্রশ্নের জের ধরে প্রসঙ্গক্রমে বলি, অনেকের কাছ থেকেই শুনি, জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' কিংবা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' পড়া যায় না। কষ্ট করে পড়লেও এখান থেকে যে রসদ পাওয়া যায়, তা দিয়ে কষ্টের বিনিময় করলে পোষে না। কিন্তু প্রায় সবাই এক ধরনের শ্রদ্ধায় অবনত হয় এই সব উপন্যাসের পরিশ্রমের কাছে বা অনুমান-নির্ভর সমাজ-অতিক্রান্ত এর মানবীয় ব্যথার কাছে। প্রশ্ন হল, এ ধরনের উপন্যাসকে কি লেখক-ব্যক্তির অবদমনের অস্বাভাবিক ফল বলা যায়?

জাকির তালুকদার

জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' পড়তে আমার খুবই কষ্ট হয়েছে। তার প্রধান কারণ আমার ইংরেজি ভাষা ভালোভাবে না জানা। কোনো ইংরেজিভাষী শিক্ষিত মানুষ যদি বলেন যে 'ইউলিসিস' পাঠ খুব কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা তাহলে হয়তো আমি মেনে নেব। তবে 'খোয়াবনামা' পাঠ আমার একটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। মহৎ শিল্পের সামনে দাঁড়ালে যে রকম অভিজ্ঞতা হয়। এখন 'খোয়াবনামা'র কাছে কে কী চাইছেন বা প্রত্যাশা করছেন তার ওপর নির্ভর করে তার শ্রম ইনভেস্টমেন্টের প্রতিফল পাওয়ার ব্যাপারটি। ক্লাসিক কোনো শিল্পকর্মের প্রধান শর্তই হচ্ছে তা সমকালীন সমাজ-অতিক্রান্ত এক মানবীয় ব্যথা ও প্রত্যাশাকে ধারণ করবে। 'খোয়াবনামা'কে আমি ব্যক্তি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অবদমনের অস্বাভাবিক ফল বলে মনে করি না। বরং আমি মনে করি যে দর্শনকে ধারণ করতেন ইলিয়াস, তা দিয়ে তাঁর পক্ষে প্রচলিত ধারার পুরনো, অভ্যস্ত, নিরাপদ, পাঠকদের খুবই পরিচিত প্রকরণ-সম্বলিত উপন্যাস লেখা সম্ভব ছিল না। 'খোয়াবনামা'তে লেখকের অবদমনের কোনো চিহ্ন আমি খুঁজে পাইনি। বরং বাখতিন যাকে বলতেন 'বহুস্বরিক' উপন্যাস, 'খোয়াবনামা'কে আমার কাছে তাই-ই মনে হয়েছে। ইলিয়াসের প্রাথমিক বক্তব্য গড়ে উঠেছে অস্তিত্বের সন্ধানকে কেন্দ্র করে। মানুষের পৃথিবীতে কোনো কিছুই নিজে নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; উপন্যাসও গড়ে ওঠে কেন্দ্র ও পরিধির টানাপোড়েনে, সত্তা ও অন্য-সত্তার বিবর্তনশীল দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের বিন্যাসে। অন্য আরও কয়েকটি সাহিত্য মাধ্যমের মতো উপন্যাস যে-কোনো একটি মাধ্যম মাত্র– এমন ধারণা সম্ভবত ইলিয়াস পোষণ করতেন না। বরং মানবিক বীক্ষার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অনুঘটক হিসাবে এ মাধ্যমটি গণ্য হোক এটাই ছিল তাঁর প্রত্যাশা। এখানে অবদমনের ব্যাপারটি 'খোয়াবনামা'র সঙ্গে ঠিক ততটুকুই প্রাসঙ্গিক হতে পারে, যতটুকু হতে পারে দস্তয়ভস্কির 'দি ইডিয়ট'-এর সাথে।

হালখাতা

বাংলাদেশে নারীর অবদমনের ক্ষেত্রে পুরুষ কতখানি দায়ী? এবং কীভাবে দায়ী?

জাকির তালুকদার

এক্ষেত্রে আপনাকে আরেকবার আমি অ্যাঙ্গেলস-এর 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' বইটির কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। বাংলাদেশের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক। তাই নারীর অবদমনের ক্ষেত্রেও দায়ী প্রধানত সেই পুরুষতন্ত্রই। এর পাশাপাশি আপনাকে বলতে চাই যে নারীর অবদমনের জন্য শুধুমাত্র ফ্রয়েডীয় কারণকে দায়ী করলে আপনি সমস্যার শুধুমাত্র একটি তল বা মাত্রাকে স্পর্শ করবেন। অন্য মাত্রাগুলোকেও আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে। শ দেড়েক পৃষ্ঠার এই বইটিতে অ্যাঙ্গেলস যে সিদ্ধান্তগুলোকে পরিস্ফুটিত করার চেষ্টা করেছেন সেগুলোর মধ্যে মূল একটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে নারীর অবস্থার বিপর্যয়ের শুরু সেদিন থেকে, যেদিন সমাজ মাতৃতান্ত্রিকতা থেকে ধাবিত হয়েছে পুরুষতান্ত্রিকতার দিকে।

এই পর্বান্তরের একটি চমৎকার ছবি পাওয়া যায় এস্কাইলাসের লেখা 'আরস্টেইয়ার' বইতে। অনেকের মতে এই গ্রন্থ হচ্ছে বীর যুগের ক্ষয়িষ্ণু মাতৃ-অধিকার এবং উদীয়মান ও বিজয়ী পিতৃ-অধিকারের মধ্যে সংগ্রামের নাট্যরূপ। ক্লাইটেমনেস্ত্রা তার প্রেমিক এগিস্থাসকে পাওয়ার জন্য ট্রয়যুদ্ধ থেকে সদ্য-প্রত্যাগত তার স্বামী আগামেমনকে হত্যা করল। আর আগামেমনের ঔরসজাত পুত্র অরেস্টিস তার মাকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিল। এইজন্য মাতৃ-অধিকারের রক্ষক এরিনিয়েরা অরেস্টিসকে তাড়া করল, কারণ মাতৃ-অধিকার অনুযায়ী মাতৃহত্যা হচ্ছে সবচেয়ে ঘৃণিত অপরাধ যার কোনো ক্ষমা নেই। কিন্তু দেবতা অ্যাপোলো এবং দেবী এথেনা দুজনে মিলে অরেস্টিসকে রক্ষা করলেন। অ্যাপোলো নিজেই দৈববাণীর মাধ্যমে অরেস্টিসকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য প্ররোচিত করেছিলেন। আর দেবী এথেনা ছিলেন দুই পক্ষের মধ্যস্থতাকারিণী। কিন্তু অ্যাপোলো এবং এথেনা দুজনেই ছিলেন পিতৃ-অধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত নতুন ব্যবস্থার প্রতিনিধি। এরিওপেগাইটিস ও জুরীদের এই প্রশ্নে ভোট দিতে আহ্বান করলেন বিচারসভার পৌরোহিত্যের দায়িত্বে নিয়োজিত এথেনা। অরেস্টিসের মুক্তি ও শাস্তির পক্ষে সমান সমান ভোট পড়ল। তখন এথেনা বিচারসভার সভানেত্রী হিসাবে অরেস্টিসের পক্ষে তার ভোট দিয়ে তাকে মুক্ত করলেন। মাতৃ-অধিকার হারিয়ে পিতৃ-অধিকার জিতল। এখানে বোঝাই যাচ্ছে নারীর আধিপত্য অবসানের ক্ষেত্রে শুধু পুরুষের একক ভূমিকা নেই। ভূমিকা আছে নারীরও। একই কথা প্রযোজ্য বাংলাদেশে নারীর অবদমনের ক্ষেত্রেও। এখানে পুরুষ ও পুরুষতন্ত্রকেই প্রকৃতিসিদ্ধ মনে করে যে নারী, তারা উভয়ে মিলেই নারীর ওপর দমননীতি প্রয়োগ করে। উল্লেখ্য, আমাদের দেশে পুরুষরা যত প্রকারে নারীদের অবদমনের শিকারে পরিণত করে, তার মধ্যে সবচেয়ে নির্মম হচ্ছে নারী ও নারীত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করা। এক্ষেত্রে সমাজ, আইন, ধর্ম, ধর্মপুস্তক ইত্যাদি বিষয়াদি পুরুষের ধর্ষকাম চরিতার্থতায় ব্যাপক সহায়তা দান করে।

হালখাতা

শিশু-কিশোরদের অবদমনের কারণ ও ক্ষেত্রগুলো কী?

জাকির তালুকদার

শিশুর অবদমনের প্রধান কারণ হচ্ছে সমাজের শ্রেণী-বিভাজন। এমন অমানবিক শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিশুদের অবদমনের শিকার না হয়ে গত্যন্তর থাকে না। শিশুকে যখন তার শিশুত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়, তখন অবদমন তাকে আক্রমণ করবেই। এত কম বয়সে আমাদের শিশুদের হীনমন্যতায় আক্রান্ত হতে হয় যে তার পুরো শৈশবই হারিয়ে যায় তার পরবর্তী জীবন থেকে। যদি সে বেঁচে-বর্তে থাকতে পারে বা প্রাণটাকে টিকিয়ে রাখতে পারে। গৃহস্থালীর কাজে নিমগ্ন শিশু বা গৃহশ্রমিক তার মনিবসন্তানকে খেলতে দেখে, পড়তে দেখে, স্কুলে যেতে দেখে, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখে, শিশুসুলভ বায়না বা জেদে মত্ত-উন্মত্ত হতে দেখে। এগুলো সবই তার নিজের জন্যও কাম্য। কিন্তু তাকে শৈশবেই সামাজিকভাবে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে এগুলো তার প্রাপ্য নয়। কেন প্রাপ্য নয় এই প্রশ্নটুকু করার অধিকারও তার নেই। আবার ক্যাডেট কলেজ-মডেল কলেজ-সাধারণ স্কুল-মাদ্রাসা-টোল এইসব বিবিধ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা প্রবেশাধিকার পায়, তাদের মধ্যেও রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বরাদ্দের বৈষম্য এতই বেশি যে প্রথমোক্তদের দেখে বাকি সবাই হীনমন্যতায় আক্রান্ত হতে বাধ্য হয়। অবদমন তাদের নৈমিত্তিক জীবনে অবশ্যম্ভাবী একটি ঘটনা। যদি ফ্রয়েড সাহেব ও অন্য মনোবিজ্ঞানীদের তত্ত্বে বিন্দুমাত্র সারবত্তাও থেকে থাকে, তাহলে এই অবদমন বিকৃতি ও অসুখ আকারে বেরিয়ে আসবেই। আমাদের সমাজের পিচ্চি হান্নান বা গালকাটা কামাল বা মুরগি মিলন বা বাচ্চা রকিব কি এই অবদমনগুলোরই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি নয়? হ্যাঁ, গোটা দেশজুড়ে যে সামাজিক ও কালেকটিভ এনার্কি দেখা দেয়ার কথা সেটি এখনও দেখা দেয়নি বটে, কিন্তু সেটাও বাকি থাকবে বলে মনে হয় না। দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসার মানুষ পেটে তিনদিন-চারদিনের ক্ষিধে নিয়ে একমুঠো খুদ বা এক বাটি ফ্যান চেয়ে পথে পথে ঘুরছে, আর পাশেই বিপণীবিতানে থরে থরে সাজানো রয়েছে লোভনীয় খাদ্যসামগ্রী– এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প লিখেছিলেন 'ছিনিয়ে খায় না কেন'। শিশুদের যুগ যুগ ব্যাপী এই অবদমন প্রক্রিয়া যদি অব্যাহত থাকে তাহলে অচিরেই হয়তো লিখতে হবে 'ছিনিয়ে নেবার মতো আর কিছু বাকি নেই' ধরনের গল্প।

হালখাতা

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক স্বাভাবিক নয়, অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে এরা অভ্যস্ত নয়। এমনকি এরা নারী-পুরুষের প্রেমকেও মেনে নেয় না। এরা শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দায়িত্বকে স্বীকার করে। বিয়ের পর দাম্পত্যজীবন যতই কলহপূর্ণ হোক তারা এক সম্পর্ক ভেঙ্গে দ্বিতীয় সম্পর্ক তৈরি না করে মন্দ সম্পর্ক নিয়েই আমৃত্যু ঘর করে থাকে। উচ্চ ও নিম্নবিত্তের মধ্যে এই

সমস্যা থাকলেও তা মধ্যবিত্তের মতো এতটা তীব্র নয়। মধ্যবিত্তের এই ধরনের অবদমনের জন্য আপনি কোন কোন বিষয়কে দায়ী করেন?

জাকির তালুকদার

আমাদের সমাজ ভালোবাসাকে প্রকাশ করতে দেয় না, কিন্তু ঘৃণাকে প্রকাশ্যে আসতে উৎসাহিত করে। পাশ্চাত্যের মতো আমাদের যুবক-যুবতী নিজেদের ভালোবাসা প্রকাশ করছে পরস্পরকে চুম্বন করে বা আলিঙ্গন করে এমন দৃশ্য আপনি দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না আমাদের সমাজে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী চেঁচিয়ে পাড়া-মহল্লার মানুষকে সচকিত করে ঝগড়া করছে বা স্বামী বউকে বেধড়ক পেটাচ্ছে এমন দৃশ্য আপনি অহরহ না হলেও প্রায়ই দেখতে পাবেন আমাদের সমাজে। আমাদের সমাজে ভালোবাসা ও ঘৃণা প্রকাশের এই রীতি-রেওয়াজ শত শত বছর ধরে চলে আসছে বলে এইটাকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সবাই। কেউ কোনো প্রশ্ন পর্যন্ত তুলতে আগ্রহী নয়। আমার কথার অর্থ এই নয় যে আমি যুবক-যুবতীকে প্রকাশ্যে চুম্বন ও আলিঙ্গনের অধিকার প্রদানের দাবি জানাচ্ছি। যদিও তা হলে ভালো হবে বলেই আমার ধারণা। আমার মূল কথাটি হচ্ছে ঘৃণার এমন অশালীন বহিঃপ্রকাশ থেকে সমাজকে মুক্তি দেয়া হোক। তার মানে আবার এই নয় যে আমি গোপনে বউ-পেটানোর পক্ষপাতি। পেটানোর ধারণাটিকে বা মানসিক যন্ত্রণা দেয়ার ধারণাটিকে উচ্ছেদ করাটাই হচ্ছে মূলকথা। বিশেষ করে মানসিক যন্ত্রণা দেয়া ও ভোগ করা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে উভয়েই অবদমনের শিকার হয়ে পড়ে। আর অবদমনের আরেক নাম তো তিলে তিলে আত্মহত্যা। কাজেই দাম্পত্যিক আত্মহত্যা করার চেয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া হাজার গুণে শ্রেয় একথা স্বল্পতম বুদ্ধির অধিকারী মানুষটিও বুঝতে পারে। কিন্তু মধ্যবিত্ত বুঝতে পারে না। বুঝতে পারলেও কার্যে পরিণত করতে পারে না। মধ্যবিত্ত সমাজে যে কয়টি বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে, সেগুলোর সিংহভাগ হচ্ছে স্বামীকর্তৃক স্ত্রী-র বিরুদ্ধে আনীত বিশ্বাসঘাতকতা বা পরকীয়া প্রেমের অভিযোগে। তবে একই অপরাধে স্বামী অপরাধী হলে স্ত্রী সচরাচর তাকে ক্ষমা করেই মহত্ত্বের পরিচয় দিয়ে থাকে। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীল আর নারীদের তো কথাই নেই, আমরা বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ফার্স্টলেডি হিলারিকেও সাম্প্রতিক কালে দেখেছি একই পথ অনুসরণ করতে। স্বামী ক্লিনটনের সেক্স অর্গান হিসাবে শুধু শরীরই ব্যবহার হয়নি, তার চুরুট, এমনকি টেলিফোনও ব্যবহৃত হয়েছে জেনেও বেচারি হিলারি তার স্বামীকে মাফ করে দিয়ে নারীত্বের মহিমা সমুন্নত রাখতে বাধ্য হয়েছে। এই অবস্থায় সৌদি শেখ আর কুয়েতি আমীরদের হারেম-বন্দিনী স্ত্রী নামক প্রাণীগুলোর অবস্থা তো আর ব্যাখ্যার অবকাশই রাখে না।

কথার কেন্দ্রে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ। মধ্যবিত্ত সমাজকে নৃতাত্ত্বিক দক্ষতায় নির্মোহ, কখনো কখনো নির্মমভাবে ব্যবচ্ছেদের প্রবণতা চালু হয় মার্কসবাদীদের দ্বারা। যারা এই কাজটি করেন তারাও সচরাচর মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই মানুষ। অর্থাৎ এটি এক

ধরনের আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসমালোচনাও। সেই হিসাবে এটি মধ্যবিত্ত সমাজের শক্তির দিকও বটে। কারণ আত্মসমালোচনা করতে শেখা যার-তার কম্মো নয়। এইসব আত্মসমালোচনা থেকে অবদমনের বিষয়টিও বেরিয়ে এসেছে। অবদমনের প্রধান কারণ অর্থনৈতিক, দ্বিতীয় কারণ সামাজিক আচরণের বিপক্ষে দাঁড়ানোর সাহসের অভাব, তৃতীয় কারণ ধর্মাচরণের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যের প্রভাব, চতুর্থ কারণ কোনো ধরনের আলো প্রাপ্তির ঘটনা না ঘটা। ইউরোপীয় বলুন আর এশীয় বলুন আর দেশীয়ই বলুন, বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজে কোনো ধরনের অলো প্রাপ্তি ঘটেনি। তবে এসব বিষয়ের মূল কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক। আলোহীনতাকেই তো অন্ধকার বলা হয়। অবদমন হচ্ছে অন্ধকার একটি প্রকোষ্ঠ। সবগুলোর আন্তঃসম্পর্ক এখন পাঠকই মিলিয়ে নিতে পারবেন।

হালখাতা

ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় পণ্যের বিজ্ঞাপনে অত্যন্ত অশিল্পিতভাবে যৌনতাকে দেখানো হয়। প্রশ্ন হল প্রচণ্ডভাবে অবদমিত এই সমাজের যৌন-দুর্বলতাকে পুঁজি করে মুনাফা করার এই প্রক্রিয়া সমাজে কী ধরনের প্রভাব ফেলে?

জাকির তালুকদার

আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে পুঁজি এবং মুনাফা হচ্ছে যথার্থ 'ধর্মনিরপেক্ষ' এবং 'ইহজাগতিক' জিনিস। আর এর সাথে সর্বাধিক সংলগ্ন শব্দ হচ্ছে পণ্য। পণ্যের সার্বিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করার মুহূর্তে স্বয়ং কার্ল মার্কসও হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কাছে প্রথমে পণ্যকে মনে হয়েছিল তুচ্ছ ও সহজেই বোধগম্য একটি শব্দ। কিন্তু বিশ্লেষণ করতে বসে তিনি দেখলেন যে পণ্য হচ্ছে বহু অধিবিদ্যক নিগূঢ়তা ও ধর্মীয় সূক্ষ্মতার প্রাচুর্যে ভরা একটি অতি অদ্ভুত পদার্থ। যতদূর পর্যন্ত সেটি একটি ব্যবহার মূল্য, ততদূর পর্যন্ত তার মধ্যে রহস্যময় কিছু নেই। কিন্তু যে মুহূর্তে সে পণ্য রূপে এক পা এগোয়, অমনি তা পরিণত হয়ে যায় যেন অতীন্দ্রিয় একটা বস্তুতে। পণ্যের এই রহস্যময় চরিত্র ও ভোক্তাদের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোকে সচেতনভাবে সংশ্লেষণ করার মাধ্যমেই বুর্জোয়াশ্রেণী পণ্যমোহকে বৃদ্ধি করতে ও চাহিদার চরিত্রকে পরিবর্তিত-নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয়। এখানেই বিজ্ঞাপনের প্রাসঙ্গিকতা। বিজ্ঞাপন আপনাকে বোঝাতে চায় যে এই পণ্য না কিনলে আপনার প্রেমিক বা প্রেমিকার সঙ্গে সম্পর্ক গাঢ়তর করার চেষ্টা ব্যাহত হতে পারে, আপনার বিয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে, প্রতিবেশীর চোখে আপনার গুরুত্ব কমে যেতে পারে, আপনার শরীরে নানা রোগ-বালাই দেখা দিতে পারে, আপনার সৌন্দর্য কমে যেতে পারে। এইভাবে ক্রেতাদের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতা জাগিয়ে তুলে তাকে মরিয়া করে তোলার চেষ্টা করা হয়। সেইসঙ্গে যখন নারী বা পুরুষের শরীরকে অশ্লীল যৌনউদ্দীপক ঢং-য়ে উপস্থাপন করা হয় তখন সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অবদমিত কামেচ্ছা তীব্রতর হয়ে তাকে অসহায় ঘরবন্দি পশুর পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। তখন তার কাছে পৃথিবী তুচ্ছ, অবদমিত কাম

থেকে মোক্ষণই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। স্বাভাবিক পন্থায় যেহেতু এর কোনো সমাধান করার সামর্থ তার নেই, তখন অবদমন থেকে আসে বিকৃতি। সেই বিকৃতির শিকার হয় কখনো কখনো সে নিজে, কখনো কখনো সমাজ। অসুস্থ সমাজ আরও অসুস্থতার দিকে এগিয়ে চলে।

হালখাতা

প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশে এখন আর উপন্যাস লেখা হচ্ছে না বললেই চলে। তথাকথিত উপন্যাসের নামে যে চিন্তাশূন্যতার নির্লজ্জ অপচর্চা চলছে, সেই বিরাণ দৃশ্য কিছুটা উজ্জ্বল করেছে যে দু-এক জনের রচনা তার মধ্যে আপনার উপন্যাস বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। আপনার গল্প বা উপন্যাস সবসময়ই সমাজবাদী চিন্তনের অনুগামী। আপনার নিজের উপন্যাস থেকে আপনার বিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদমনের একটি চিত্র তুলে ধরলে আশা করি পাঠক আপনার লেখার সঙ্গে আরেক ধাপ পরিচিত হবেন এবং এতে তারা উপকৃত হবেন।

জাকির তালুকদার

অবদমনের চরিত্র উন্মোচন করে বা অবদমনকে কেন্দ্রীয় না হলেও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে যে সব উপন্যাস লেখা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আমার কাছে উইলিয়াম ফকনারের 'দি সাউন্ড এন্ড দি ফিউরি' উইলিয়াম গোল্ডিং-এর 'লর্ড অব দি ফ্লাইজ' ফিটজেরাল্ডের 'টেন্ডার ইজ দি নাইট' কাফকা-র 'দি ট্রায়াল' লরেন্স-এর 'সন্স এন্ড লাভারস' কে খুব উল্লেখযোগ্য মনে হয়। আমি ঠিক সেইভাবে অবদমন নিয়ে কাজ করিনি। আমার উপন্যাসে অবদমন এসেছে অন্য মাত্রায়। পাঠক আমার 'কুরসিনামা' উপন্যাসটি পড়লে বোধহয় অবদমন নিয়ে আমার সাহিত্যভাবনার একটি আভাস পেতে পারেন।

অবদমনের বিভিন্ন প্রেক্ষিত

নি র্ম লে ন্দু গু ণ

[রাষ্ট্র হল অবদমনের যন্ত্র; জনগণের মধ্য থেকে উঠে এসে জনগণেরই বুকের ওপর চেপে বসে –কার্ল মার্কস]

'বীরত্ব জিনিসটা কোথাও-বা সুবিধাকর কোথাও-বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ইহার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে অবস্থাতেই মানুষ থাক না কেন, মনের মধ্যে তাহার ধাক্কা না লাগিয়ে তো নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান গাহিয়া সেই ধাক্কাটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের যাহা প্রকৃতিগত এবং মানুষের কাছে যাহা চিরদিন আদরণীয়, তাহার সকল প্রকার রাস্তা মারিয়া, তাহার সকল প্রকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে একটা যে বিষম বিকারের সৃষ্টি করা হয় সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। একটা বৃহৎ রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরানিগিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানব চরিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ রাখা চাই, নইলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে– সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরিণাম অভাবনীয়।'
(স্বাদেশিকতা: জীবনস্মৃতি: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল সমরবাদী পাকিস্তানের বিকারগ্রস্ত রাজনীতির 'অসুবিধাকর বীরত্বর বিরুদ্ধে বাঙালির অবদমিত 'সুবিধাকর' বীরধর্মের অনিবার্য বিরোধ। রবীন্দ্র-জীবনস্মৃতিতে সেই বিরোধের অন্তর্নিহিত সত্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা পাঠ করে আমি এতই মুগ্ধ বোধ করেছি যে, তা আমার বর্তমান রচনার পাঠকদের গোচরে আনার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি। শুধু লোভই বা বলছি কেন, মনে হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি বিশাল ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্য অনুধাবনে পাঠককে সহায়তা করাটা ইতিবৃত্তকার হিসেবে আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আর সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বিশ্বস্ত শিক্ষক, এমন বিশ্ববিহারী জ্ঞানযোগী আর কে হতে পারেন? মার্কসবাদী

পণ্ডিত, আমার প্রিয় শিক্ষক শ্রীজ্ঞান যতীন সরকারকেও তো দেখেছি প্রায়শ তাঁরই শরণ নিতে। 'হিন্দুমেলা'র স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অভিজ্ঞানসমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের এই দার্শনিক উপলব্ধি কিশোর-রবীন্দ্রনাথের সময়কার ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের জন্য যতটা সত্য ছিল; তাঁর মৃত্যুর তিরিশ বছর পর, ১৯৭১ সালেও তা ঠিক ততটাই, বা তার চেয়েও অনেক বেশি সত্য হয়ে উঠেছিল পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের বেলায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল রবীন্দ্রবর্ণিত বীরধর্মের অনিবার্য দ্বন্দ্বের প্রকাশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধিকারকামী বাঙালির ব্যাঘ্র-জাগরণকে তার নিজের ভিতর থেকে জাগা ন্যায়সঙ্গত বীরধর্মের প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা না করে, তাকে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া 'ভারতীয় ষড়যন্ত্র' বলে অপপ্রচার চালিয়ে পাকিস্তান শুধু যে আমাদের বীরধর্মের প্রতিই অবিচার করেছিল তা নয়, শেষ-বিচারে, মনে হয় তাদের নিজেদের কৃতকর্মের ভিতর দিয়ে তারা নিজেদেরই অপমান ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বেশি। রবীন্দ্ররচনা যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি ব্যাখ্যায় এতটাই প্রাসঙ্গিক, তাঁর জীবনস্মৃতি পাঠের মধ্যে দিয়ে সে-বিষয়টি বুঝতে পেরে আমার খুব আনন্দ হল।

বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রামী ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় তার সর্বকালের সেরা নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের বীরোচিত উত্থানকে তাই আকস্মিক নয়, মানবপ্রকৃতি বিচারে অনিবার্য বলেই মনে হল। মনে হল, পাকিস্তানের অবদমনমূলক আচরণের কারণে যে বাঙালিরা তাদের বীরধর্ম পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে নিষ্ফল পাথরে মাথা কুটে মরছিল, সেই পাথরচাপা অবস্থার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেই আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ বাঙালি ইপিআর, বাঙালি পুলিশ, বাঙালির অবদমিত বীরধর্মের স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ। সুযোগ থাকার পরও যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সেই মিছিলে সামিল হয়নি, বীরধর্মচ্যুত হয়ে তারা ইতিহাসের গৌরব থেকেই বঞ্চিত হয়েছে। 'কী পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী মানুষের ওপর, তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি। আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।' '...রক্ত যখন দিয়েছি, আরও দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ..। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।' পদব্রজে অজানা অচেনা গ্রামের পথে চলতে চলতে, ক্ষুধায়, রাতে ভালো ঘুমাতে না পারার দোষে যখন ক্লান্ত দেহকে আর বইতে পারতাম না, নতুন করে দেহমনকে চাঙ্গা করার জন্য তখন কখনও জোর গলায়, কখনও বা মনে-মনে আবৃত্তি করতাম বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের প্রায় মুখস্থ হয়ে যাওয়া বজ্রকণ্ঠভাষণ, কখনও বা আমাদের বুকের ভিতর থেকে গুনগুনিয়ে উঠতো রবীন্দ্র-নজরুল, জীবনানন্দ-সুকান্তর কবিতা বা কোনো জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক গানের চরণ।

‘মুক্তির মন্দির সোপানতলে
কত প্রাণ হলো বলিদান–
লেখা আছে অশ্রুজলে ।’

এই গানটির রচয়িতা মোহিনী চৌধুরী । এই জনপ্রিয় প্রাণছোঁয়া গানটির রচয়িতা কে, তা আমি জানতাম না । আমার ধারণা ছিল, এর রচয়িতা নিশ্চয়ই বিখ্যাত কোনো কবি হবেন । কিন্তু গানটির রচয়িতা মোহিনী চৌধুরীর মতো অখ্যাত একজন কেউ, জেনে খুবই বিস্মিত হয়েছি । তবে এই গানের সুরকার ও গায়ক বিখ্যাতই বটে । তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে । জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী মান্না দে’র শিক্ষাগুরু ও আপন খুল্লতাত । তিনিই গানটিকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ।

(তথ্যসূত্র: সংস্কৃতি: জাতীয় মুখশ্রী: মাহবুব উল আলম চৌধুরী)

দুই

সদ্য-প্রকাশিতই বলা যায়, আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থটি বেরিয়েছে ১৯৭০-এর নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে, আর আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে মার্চের শেষ সপ্তাহে । সময় বিচারে আমার কাব্যগ্রন্থটি তখন মাত্র চার মাসে পা রেখেছে । আমি ঢাকা থেকে বেরোবার সময় সঙ্গে করে সঙ্গোপনে আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থটি আমার ঝোলায় পুরে নিয়েছিলাম । তার সারা গায়ে তখনও নববধূর গন্ধ । নববধূর মতোই আমি তাকে আমার চলার পথের সকল বিপর্যয়ের মধ্যেও যতটা সম্ভব চোখে-চোখে বুকে-বুকে, হাতে-হাতে রাখি । মাঝে মাঝে ঝোলার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বইটিকে আলতো আঙুলে স্পর্শ করি । মনে হয় যেন আবেগ থরথর প্রথম পরশ কুমারীর । কখনও-বা আমার কাঁধের ঝোলা থেকে বের করে তন্বী নয়নের বহ্নির মতো আপন প্রতিকৃতি-সম্বলিত বইয়ের রুদ্র-প্রচ্ছদটি চকিতে দেখ নিই । আমার ভাবতে খুব ভালো লাগে, পূর্ব পাকিস্তানের শেষ ও বাংলাদেশের প্রথম কবিতার বই এটি । খুব সম্ভবত এর পর বাংলাবাজার থেকে আর কোনো কবির কোনো কবিতার কোনো বই বেরোয়নি । তাই আবেগের আতিশয্যে রবীন্দ্র-নজরুলের পাশাপাশি নিজের কবিতা থেকেও দু’একটা পঙ্‌ক্তি যে কখনও আওড়াইনি, এমন কথাও হলফ করে বলতে পারব না । সময় পেলে, হয়তো কোনো চায়ের স্টলে বসেছি চা খেতে, তখন ঝোলায় ঘুমিয়ে-পড়া বইটির ঘুম ভাঙিয়ে, তার পাতা উল্টিয়ে পাঠও করেছি কোনো কোনো কবিতার কিছু প্রিয় ছত্র ।

‘পুরোভাগে হাঁটে মুক্ত-ভূমণ্ডল,
আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গোবে...’

পাকসেনাদের তাড়া খেয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি ফেলে নিরাপদ আশ্রয় সন্ধানে ছুটে চলা মানুষের অনিঃশেষ মিছিলের দিকে তাকিয়ে আমি যেন আমার স্বপ্নের ‘মুক্ত ভূমণ্ডল’ বা বাংলাদেশকে স্পষ্টই দেখতে পাই । বুঝি বইটির অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য নামকরণ আমাদের অজস্র প্রিয়জনের রক্তদানের ভিতর দিয়ে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে । মুক্তির জন্য আমাদের আরও কত প্রিয়জনকে যে তাদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতে হবে, কে জানে? পঁচিশে মার্চ তো শেষ নয়, মনে হয় এ হচ্ছে এক দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের

শুরু। আমাদের জয়ের ভিতর দিয়েই যে এই যুদ্ধের শেষ হবে, সে ব্যাপারে আমার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না, কিন্তু এই যুদ্ধে আরও কত মানুষের প্রাণ বলি যাবে, কতদিন লাগবে হানাদার পাকসেনাদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আমার বারবার শুধু ভিয়েতনামের কথা মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল আমার নিজের লেখা একটি দীর্ঘ কবিতায় ব্যবহৃত একটি চিত্রকল্প 'দক্ষিণপূর্ব এশিয়াবাসীর বিস্ফোরণ'। নেকরোজবাগ থেকে মন্টু, খসরু, আফতাব, মধু ও বাবলাসহ কাউকে কিচ্ছুটি না জানিয়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যাচ্ছি ভেবে আমার মনের ভেতরে যে অপরাধবোধ তৈরি হচ্ছিল, আমার নিজের লেখা কবিতা পড়ে, সেই অপরাধবোধ থেকে আমার মনের জট কিছুটা খুলে যেতে থাকে। আমি বুঝতে পারি, অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করাটা হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, কিন্তু কলম হাতে আমি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারব। যুদ্ধের মাঠে অসির চেয়ে মসি বড় না হলেও, মসিরও যে একটা জোর আছে, তার প্রয়োজনও আছে সেকথাটাও আমি বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে পাই।

শুভাড্যা গ্রামে পৌঁছে পথের পাশের একটি চায়ের স্টলে বসে আমরা চা খাচ্ছিলাম আর চায়ের স্টলে ঐ এলাকার মানুষজনের মধ্যে যারা বসেছিল, তাদের কাছে খোঁজ করছিলাম আমাদের বন্ধু মহসীনকে তারা কেউ চেনে কি না? দেখলাম অনেকেই মহসীনকে খুব ভালো করে চেনে। এলাকায় মহসীন বেশ জনপ্রিয়। চায়ের স্টলের মালিক, তরুণ বয়সী ছেলেটি বলল, আপনারা এখানে বসেন, কিছুক্ষণের মধ্যে মহসীন ভাই নিজেই এখানে আসবেন। তিনি আমার চায়ের স্টলে বসেই আড্ডা দেন। শুনে আমরা আশ্বস্ত হই। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি মহসীন এসে ঐ চায়ের স্টলে হাজির। দীর্ঘদিন পর মহসীনকে কাছে পেয়ে আমি তাকে আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। আমরা যে পাকবাহিনীর ২৫ মার্চের বর্বর হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে গেছি, এটিই হল মহসীনের জন্য পরম আনন্দের বিষয়। তাই তাকে আমাদের কিছুই বুঝিয়ে বলতে হল না। নিজে থেকেই মহসীন বলল, পাকসেনাদের তাড়া না খেলে আপনারা কি আমাদের মতো গণ্ড-গ্রামে কখনও আসতেন? আপনাদের কোথাও যেতে হবে না, এখানেই আমি আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিব। জামগাছের তলায় এই যে মনোহারী দোকানঘরটা দেখছেন, এটি আমার এক নিকট আত্মীয়ের, এখানেই আপনারা থাকবেন। পাকসেনারা বুড়িগঙ্গা নদী পেরিয়ে এখানে সহজে আসবে বলে মনে হয় না।

তিন

ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুসারে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে পাক-বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন কিনা, এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ ও ধূম্রজাল প্রচারকারী সাক্ষীগোপালদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শ্রী নির্মল সেন আমাদের জানাচ্ছেন তাঁর অভিজ্ঞতা :

'আমি মনে করি, একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন। ঘোষণাটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং সাহসিকতাপূর্ণ। মরহুম জিয়াউর রহমান নিঃসন্দেহে সে জন্য কৃতিত্বের দাবিদার। একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতেই এই ঘটনাটি বিবেচ্য। কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা হয়েছিল ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। যদিও এই ঘোষণার আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। এ ছাড়াও একটি ঘোষণা ২৬ মার্চ রাতে শেখ সাহেব পাঠিয়েছিলেন বেতার মারফত। ঘোষণাটি আমাদের থানার ডাকঘরে এসেছিল। আহ্বান এসেছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নামেই। আমি নিজের চোখে সে ঘোষণা দেখেছি। এ ব্যাপারে কারও ধার করা কথা বা তত্ত্ব শুনতে বা বুঝতে আমি রাজি নই। আমি জিয়াউর রহমানের অমর্যাদা করতে চাই না। কিন্তু তাঁর সমর্থকদের তাঁর সীমাবদ্ধতা ও তাঁর ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে। একটি কথা স্বীকার করতে হবেই যে, স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের নামে। এ আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। অবদান ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও কোটি কোটি সাধারণ মানুষের। কিন্তু এ রাজনৈতিক দল বা তাদের নেতাদের নামে কোটি কোটি মানুষ সংগ্রামে নামেনি। তাদের দলীয় সদস্যরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ সংগ্রামে যোগ দিয়েছে, প্রাণও দিয়েছে অকাতরে। কিন্তু বাংলার মানুষের কাছে প্রথমে দু'টি নামই ছিল উল্লেখযোগ্য। তা হচ্ছে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ। ১৯৭১ সালে আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছি। ঢাকা শহরে পাঁচবার ঢুকেছি। ফরিদপুর, ঢাকা, কুমিল্লার বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছি। একাধিকবার সীমান্ত পারাপার করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে গিয়ে রাজাকারদের প্যারেড দেখেছি। প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে দেখেছি সত্যি সত্যি প্রেসক্লাব ভবন ধূলিস্যাৎ হয়েছে কি না। কাছে গিয়ে দেখেছি ভাঙা শহীদ মিনার। গ্রামে গিয়ে দেখেছি মুক্তিবাহিনীতে যাবার প্রতিযোগিতা। কান্না দেখেছি অসংখ্য তরুণের। পিতা-মাতা ছেড়ে যাবার দুঃখ নয়, মুক্তিবাহিনীতে যেতে না পেরে। ওদের কাছে পরিচিত ছিল শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ। অন্য বিশেষ ব্যক্তি বা রাজনৈতিক সংগঠন নয়। তবে সংগ্রামের এক পর্যায়ে সকল সংগঠন ছাড়িয়ে উঠেছিল মুক্তিবাহিনী। কোনো দল নয়, মুক্তিবাহিনীই হয়ে উঠেছিল সকলের আদরের ধন। এর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের নামটিও ছিল অচ্ছেদ্য।'
(সূত্রঃ মা জন্মভূমিঃ পৃ. ৫২-৫৩)

নির্মল সেন তাঁর লেখায় 'অচ্ছেদ্য' শব্দটি চমৎকার কুশলতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। মায়ের সঙ্গে নাভিযোগে যুক্ত নবজাতকের অচ্ছেদ্য চিত্রকল্পটি আমাদের মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। জানি, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর চার ঘনিষ্ঠ সহচরহীন বাংলাদেশে সৃষ্ট রাজনৈতিক শূন্যতা ও অনিশ্চয়তার পটভূমিতে জিয়াউর রহমান যদি ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন না হতেন, বা ঘটনাপ্রবাহে তাঁর ওপর বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা 'অর্পিত' না হত, –তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির কোনো

সুযোগই কখনও তৈরি হত না। হত না যে, তার প্রমাণ আমরা পাই জিয়ার নিজের লেখায় (একটি জাতির জন্ম)।

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে নয়, জিয়ার নির্দেশে বা আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে বা তারা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বলে যারা দাবি করেন, তারা ভুলে থাকতে ভালোবাসেন এই নিন্দনীয় বাস্তব সত্যটি যে, নিজেকে 'স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার প্রধান' নিযুক্ত করে মেজর জিয়া যে-ঘোষণাটি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করেছিলেন, তার পরমায়ু ছিল খুব বড়জোর ১২ ঘণ্টা, তার বেশি নয়। 'বহির্বিশ্বে ঘোষণাটির গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব বাড়বে' এই খোঁড়া যুক্তিতে মেজর জিয়া তাঁর ঘোষণাটিকে খরস্রোতা কর্ণফুলীর ওপারে নিয়ে যেতে পারেননি। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতাদের (আওয়ামী লীগ নেতা একে খান ও ড. এ আর মল্লিক) চাপের মুখে বারো ঘণ্টার মধ্যেই 'মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা' করে মেজর জিয়া সেদিন তাঁর ঐতিহাসিক ভ্রান্তি মোচন করেছিলেন এবং তাঁর পরবর্তী আচরণ হয়ে উঠেছিল আত্মরক্ষামূলক। তাই সেদিনের বাস্তবতায় ঐ ঘোষণা প্রচারের গৌরবকে পুঁজি করে বঙ্গবন্ধুর বিকল্প নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার মতো কিংবা চেপে রাখা অবদমিত ওই আকাঙ্ক্ষা পূরণের মতো সুযোগ জিয়া নিজেও তৈরি করতে পারেননি। তাই, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠিত হলে, মুজিবনগর সরকারের অধীনে একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক করে গঠিত মুজিবনগর অস্থায়ী প্রবাসী সরকারের সঙ্গে মেজর জিয়ার কোনোরকমের মতবিরোধের কথাও আমরা কখনও শুনিনি।

লক্ষণীয় যে, ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান যে ভাষণ প্রদান করেন, সেখানেও মেজর জিয়া কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারটিকে আমলে নেয়া হয়নি বরং আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবকেই বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে শাস্তি প্রদানের হুমকি দেয়া হয়।

'President Yahya Khan, broadcasting on the same day, announced the outlawing of the Awami League, a ban on political activity throughout Pakistan, and the imposition of non-cooperation movement as "act of treason'' desuaibed Sheikh Mujibur Rahman and his party as "enemies of Pakistan'' who wished to break away completely from the country and said that this "crime will not go unpunished''. (KCA, PP 24567)

Among political leaders in West Pakistan, Mr Bhutto accused Sheikh Mujibur Rahman of wanting to establish an independent facist and racist regime in East Pakistan while Khan Abdul Wali Khan described the Awami League's six-point programme as an act of secession and an open act of treason. (KCA, PP 24568)

তাদের বক্তব্য শুনে মনে হয়, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বা জুলফিকার আলী ভুট্টো বা ওয়ালী খানরা তখনও বুঝতে পারেননি যে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির খতম তারাবি (চরমপত্রের রচয়িতা এম আর আখতার মুকুলের ভাষায়) হয়ে গেছে। তাঁরা ভেবেছিলেন, ২৫ মার্চের অপারেশন সার্চলাইট অখণ্ড পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। পাকনেতারা তখনও বুঝতে পারেননি যে, গ্রাউন্ড রিয়ালিটি থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখে অন্ধের ভাণ করলেই প্রলয় বন্ধ থাকে না। কিন্তু মিথ্যা আর কৌশল দিয়ে প্রকৃত সত্যকে দমিয়ে রাখার প্রচেষ্টা আর অন্ধের ভান চলছে আজও। মনে রাখা দরকার অবদমিত এই বাসনা মাত্র গুটিকয় মানুষের, দেশের অধিকাংশ বা সকল মানুষের নয়।

পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বায়ন ও অবদমিত সমাজ

আহমেদ স্বপন মাহমুদ

দমন ও অবদমন সামাজিক অভিঘাত হিসেবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোন ধরনের সমাজব্যবস্থার নিয়ামক হয়ে ওঠে দমন ও অবদমন সেই আলোচনা উত্থাপন করা খুবই দরকারি। দমন ও অবদমনের মধ্যে পার্থক্য আছে, তবে একটি অন্যটির জন্ম দেয়, সেই অর্থে পরিপূরক। এটি নির্ভর করে ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কের ওপর। দমন ও অবদমন দুটি উপাদানই সমাজের একটি বিশেষ চেহারা হিসেবে আমাদের সামনে হাজির হয়। একটি অগণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়– যে সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার, স্বাধীন চিন্তার গতি ও প্রগতি হুমকির মুখে পড়ে সেই রকম সমাজব্যবস্থায় ক্ষমতার বিশেষ রূপ হিসেবে দমন জনগণের ওপর নাজেল হয়।

দমন ক্ষমতার সম্পর্ক ও সমাজকাঠামোর বিশেষ একটি রূপ, যেখানে একটি গোষ্ঠি অন্য শ্রেণীর ওপর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। অর্থাৎ দমনের সাথে ক্ষমতার সম্পর্ক রয়েছে। দমনপীড়ন, নির্যাতন-শোষণ, বঞ্চণা অগণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার রূপ বা বিশেষ চরিত্র। আর অগণতান্ত্রিক সমাজের কাঠামো স্বাধীন চর্চা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার অন্তরায়। ফলে দমনের মধ্য দিয়ে যে সমাজ ক্রমাগতভাবে অন্ধকারে যেতে থাকে, জনগোষ্ঠির একটি অংশ শিকার হয় বৈষম্যের, নির্যাতনের, পীড়নের। আর ক্রমাগত পীড়ন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে শ্রেণীগোষ্ঠিকে এবং অবদমিত

শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই অবদমন একটি সমাজের অগণতান্ত্রিক চেহারার অন্তরের রূপ। এই রূপ এত ভয়াবহ ও ভয়ংকর যে, পুরো মানবগোষ্ঠিকে সাংস্কৃতিকভাবে এটি পিছিয়ে দিতে পারে, সমাজ বিকাশের ধারাকে বিনষ্ট করে পঙ্গু করে দিতে পারে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে। ক্ষমতার সম্পর্ক যে সমাজে যত বেশি স্পষ্ট ও কার্যকর, সে সমাজে বৈষম্য ও দমন তত বেশি প্রবল। ফলে ক্ষমতা যার বা যাদের হাতে, রাষ্ট্র হোক বা ব্যক্তি বা বিশেষ শ্রেণী হোক, দমন বা নিপীড়ন হয় ওপর থেকে অর্থাৎ যারা ক্ষমতাবান তাদের দ্বারা যারা ক্ষমতাহীন তাদের ওপর।

ফলে অবদমনের বিস্তার হয় একটি ক্ষমতাহীন শ্রেণীর মধ্যে প্রথমত, যেখানে ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজ নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী চলতে পারে না। রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেয়া রীতিনীতির কারণে এর ব্যাপকতা বিভিন্ন পর্যায়ে চরম আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারে। এখন যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে পুঁজির বিস্তার বা পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বসমাজব্যবস্থার বিস্তার সেই দমন ও অবদমনকে কিভাবে আরও ব্যাপকতর করে তুলেছে বা পুঁজির বিকাশের সাথে দমন ও অবদমনের সম্পর্ক নির্ণয়। এই প্রশ্নটি দরকারি, কেননা আজকের এই কর্পোরেট বিশ্বায়নের ভয়াল থাবার মুখে যখন সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল রীতিনীতি পদ্ধতি ও আচার আচরণ নির্দিষ্ট হয়, তখন দমন ও অবদমন একই বৃত্তে ঘুরপাক খায়। কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, যেমন : পুঁজির সাথে দমনের সম্পর্ক জ্বলন্ত উদাহরণ ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন। নির্বিবাদে কোনো কারণ ছাড়া আমেরিকার সেনাবাহিনী যেভাবে লাখ লাখ নারীশিশু হত্যা করছে সারা পৃথিবীতে সেটি পুঁজির ক্ষমতার, পুঁজির কেন্দ্রিভবনের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। বাংলাদেশে যখন বিচারব্যবস্থার বাইরে হত্যাউৎসব হয়, রাষ্ট্র যখন মানবাধিকার লঙ্ঘন করে তার পুলিশবাহিনীকে মানুষ মারার বৈধতা দেয় সেটিও ক্ষমতার দাপট। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার প্রকাশ। এমন হাজার হাজার উদাহরণ দেয়া যায়– সারা পৃথিবী জুড়েই এমনটি ঘটছে। দুর্বলের ওপর সবলের খড়্গ সবসময় প্রস্তুত। আর ক্রমাগত অত্যাচারের ফলে যখন মুখ খোলার শক্তিটুকুও থাকে না মানুষের ক্ষমতার ভয়ে, তখন তৈরি হয় মানসিক অস্থিরতার, অবচেতনায় কার্যকর হয়ে ওঠে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য অভিজ্ঞতা– জন্ম হয় অবদমনের। ফলে অবদমন একাধারে মানসিক ও সামাজিক ব্যাধি।

ক্ষমতার আধিপত্যের বা ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষার অপ্রতিফলিত মনোভাব চাপা পড়ে থাকে চেতনায় এবং এর বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে অবদমন। এর সামাজিক প্রকাশ রয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক প্রকাশও আছে। আবার মানসিক বিকারগ্রস্ততা বা আকাঙ্ক্ষার অপ্রকাশ্য ভাব একটি দার্শনিক প্রপঞ্চ, এ নিয়ে বিস্তর বলেছেন ফ্রয়েড বা ইয়ুং বা ফুকো। সেগুলো থাক। বরং সমাজের অভিজ্ঞতা এগুলো কিভাবে দেখছে– প্রত্যক্ষ করছে তা গুরুত্বপূর্ণ।

অবদমন ব্যক্তি পর্যায়ে যেমন ভয়াবহ তেমনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও। বরং রাষ্ট্র কর্তক অবদমন অনেক বেশি প্রবল ও এর বিধ্বংসী রূপ অনেক বেশি ভয়াবহ, প্রবল ও ক্ষতিকর। অর্থনৈতিক বৈষম্য, অন্যায্যতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, আইনের শাসনের অভাব, মুক্তচিন্তার অভাব সবকিছুই পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বায়নের রূপ। রাজনৈতিক যে

খেলা, তথাকথিত গণতন্ত্র বা সমরতন্ত্র বা জরুরি অবস্থা– সব অবস্থায়ই পুঁজির সর্বব্যাপী প্রভাবের ফল। ফলে রাজনৈতিকভাবেও একটি রাষ্ট্র বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলো দাঁড়াতে পারে না। পুঁজির দাসত্বে আটকে গিয়ে অবদমনের যে বিকট চেহারা আমাদের সামনে হয় তার প্রভাব কেবল সমসাময়িক সময়ে নয়, এটি ভবিষ্যত অন্ধকার করে দেয়। ফলে অর্থনৈতিক অন্যায্যতা যে অপ্রাপ্তি তৈরি করে ব্যক্তি ও সমাজে সেই অপ্রাপ্তি অবদমনকে গ্রাস করে সমাজকে পঙ্গু করে দেয়। দেখা যায়, রাষ্ট্র কারণ হয়ে ওঠে অবদমনের, ব্যক্তি নয়। বা ব্যক্তি ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে স্রেফ ব্যক্তি হিসেবে নয়, যা অবদমনের কারণ হয়, দমনেরও হতে পারে। এছাড়াও, ব্যক্তির ব্যক্তিগত কারণ ও দুশ্চিন্তা, অপ্রাপ্তি মানসিক অস্থিরতার কারণ হয়ে ওঠে এবং অবদমন গ্রাস করে।

অবদমনে-এর একটি রাজনৈতিক দিক রয়েছে– সেটি ক্ষমতার রাজনীতি, পুঁজি ও মুনাফার রাজনীতি, বহুজাতিক কোম্পানি ও ব্যবসায়িকদের রাজনীতি, আমলা, পরিষদ তাদের রাজনীতি, যেসব রীতিনীতি জনগণের ঘাড়ে চেপে বসে।

বিশ্বায়নের ধারণার সাথে দমনের সম্পর্ক এবং দমনের সাথে অবদমনের সম্পর্ক যেটি উল্লেখ করেছি আগেই, সেই সম্পর্ক গভীর। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অবদমন অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তির স্বাধীনতা গুরুত্বপূর্ণ, ব্যক্তির অধিকার ক্ষুন্ন হলে অবদমন তৈরি হয় ব্যক্তি ও সমাজে– এটা ছড়িয়ে পড়ে ব্যাধি হিসেবে।

প্রকৃতপক্ষে, অবদমন স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, জ্ঞান চর্চা, সৃজনশীলতা সবকিছু নষ্ট করে ব্যক্তি ও সমাজকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেয়। এই নৈরাজ্য সমাজকে অবদমন করে, এবং সেটা রাষ্ট্রের ওপর চেপে বসে। আবার রাষ্ট্রের রীতিনীতির কারণেও ব্যক্তি ও সমাজ পর্যায়ে অবদমনের তৈরি হয় এবং এমন অবস্থা তৈরি করে যা বিপর্যয় ও সংকটের মুখে ফেলে। ফলে অবদমন এমন এক উপাদান যা কোনো অর্থেই ইতিবাচক হতে পারে না। কেননা, ব্যক্তির বিকাশের জন্য যে মুক্ত ও স্বাধীন ব্যবস্থা থাকা দরকার, মানবের প্রকাশের যে স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা, তার বিকাশ রুদ্ধ হয় যদি স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়। রাষ্ট্র যে অবদমন তৈরি করে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারি। রাষ্ট্রের নিয়মকানুন, শোষণ-বঞ্চণা, ক্ষমতা ও আধিপত্য যদি ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যক্তির ওপর কর্তৃত্ব করে এবং সেটা যদি সমাজের সর্বব্যাপী ছেয়ে যায় তাহলে ক্রমশ অবদমনের মাত্রা অন্তর্গতভাবে বিনাশ করে ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে। ফলে সকল বিকাশ রুদ্ধ হয়।

যে প্রশ্নটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে কোন ধরনের সমাজব্যবস্থা অবদমনের জন্ম দেয় সমাজে বা ব্যক্তির মাঝে তা সুরাহা দরকার। পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ব্যক্তির মাঝে সমাজের মধ্যে যে ভোগবাদ সৃষ্টি করে, তা কেবল ভোগ করতে পারে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী: মুষ্টিমেয় একটি অংশ যাদের হাতে ধনসম্পদ আছে, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা আছে, যারা সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে তারা, বাকি অধিকাংশ জনগোষ্ঠি অবদমনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়, তারা বঞ্চিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত। বিশ্বায়ন সমাজে

নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, সমাজে ও ব্যক্তিমানসে অপ্রাপ্তি অন্তর্গত শক্তিকে স্তিমিত করে দেয়, এবং এক নৈরাজ্যময় পরিস্থিতি তৈরি করে।

অবদমনের ক্ষেত্র অনেক, এটা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। কিন্তু দেখা যায়, সমাজের বা ব্যক্তির অবদমনকে কোনো গুরুত্ব দেয়া হয় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে, এটা পরিবার ও সমাজের ক্ষেত্রে যেমন, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তেমনি। অর্থাৎ সমাজের বিদ্যমান দমন ও অবদমনের রূপকে অস্বীকার করা হয়, গুরুত্ব দেয়া হয় না ব্যক্তিমানস ও সমাজমানসকে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার তৈরি হয় যা সমাজ বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবদমনের ফলে যে নৈরাজ্য তা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা আবশ্যক। কেননা এটি একটি সুস্থ সমাজের লক্ষণ হতে পারে না।

অবদমনের বিষয়টি যৌনতার ক্ষেত্রে বেশ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। অর্থাৎ যৌন অবদমনের দিকটি ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের কারণে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে যা বিস্তৃত ও গভীর। কিন্তু শুধু যৌনতা কেন, তথ্যক্ষেত্রে, শারীরবৃত্তীয় ক্ষেত্রে, চিন্তার ক্ষেত্রে, চর্চা, মনোভাব, সৃজনশীলতা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে অবদমন হতে পারে যা গুরুত্ব সহকারে দেখা দরকার। অবদমন একটি ব্যাধিতে পরিণত হওয়ার আগেই এর নিরাময় দরকার। একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ও সমাজব্যবস্থা ব্যক্তি ও সমাজকে অগ্রসর করে দিতে পারে, ব্যক্তির বিকাশ, সমাজের বিকাশ ও রাষ্ট্রের গতিপ্রকৃতি ইতিবাচকভাবে পরিবর্তন করে দিতে পারে। তখন দমন বা অবদমনের মাত্রা দুটোই কম হয়।

অবদমিত ব্যক্তিসত্তা ও সমাজ

র ত ন ত নু ঘো ষ

অবদমন প্রসঙ্গ এলেই স্মরণ করতে হয় যে, সিগমুন্ড ফ্রয়েডের কথা যিনি অবদমনকে মানুষের একটি প্রতিরক্ষাকৌশল বলে গণ্য করেছেন।

আমরা এমন অনেক কথাই ভাবি যা অস্বাভাবিক; কারো কাছে তা প্রকাশ করতে দ্বিধাজর্জরিত হই। মনের মাঝে উঁকি দেয় এলোমেলো চিন্তা-ভাবনা। এসব কথা ভয়ে গোপন রাখি, লজ্জায় চেপে যাই। মনের অতলে সংগুপ্ত রাখি নিজের মনের প্রশ্ন,

বিস্ময়, সন্দেহ আর দ্বিধা। এক কথায় বলা যায়, এসবই অবদমিত বাসনা বা অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা, অপ্রকাশিত বেদনা। সমাজ অনুমোদিত নয় বলে ব্যতিক্রমী ও অস্বাভাবিক বিষয়গুলো একান্তই ব্যক্তির মনোলোকে ছাইচাপা থাকে। এসব খণ্ড-ক্ষুদ্র-ভাবনা, অসংঘটিত ঘটনা মনের কোণে লুকিয়ে রাখলেও সেগুলো একেবারে উধাও হয়ে যায় না, মন থেকে নিষ্কাশিত হয়ে যায় না। ফলে উপযুক্ত মুহূর্তে ও অনুকূল পরিস্থিতে এসব গুপ্ত ভাবনা ও চিন্তা মনের গোপন কক্ষ থেকে বেরিয়ে ডানা মেলে, প্রকাশের পথ খুঁজে নিতে চায়। তখনি নিজেকে নতুন করে ভাবতে হয়। খুঁজতে হয় ঘটনার উৎস, সমাহিত স্মৃতিখণ্ড, অতীতের অজ্ঞাত যন্ত্রণা, চেপে রাখা আকাঙ্ক্ষা। সমাজের প্রচলিত আয়নায় নিজেকে দেখি বলেই স্বকীয় সকল কিছুকেই বিচার করি সামাজিক মানদণ্ডে। নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গুরুত্বহীন করে অন্ধকারে রাখলেই মন ফুঁসে উঠতে চায়। অনৈতিক ও যৌনতা-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে আমরা পাপবোধের অজুহাতে চেতন মনের আড়ালেই রেখে দিই। কিন্তু এমন অনেক ভালো চিন্তাও আছে যা সৃজনশীল মনের সহজাত উপলব্ধি। যেগুলো দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রকাশের সুযোগ খোঁজে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্থার মেধাবী-ব্যক্তিত্বের বিকাশের ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করতে গেলে তার সত্যতা খুঁজে পাই। যা কিছু সৃষ্টিশীল, যা কিছু ভালো আয়োজন তা প্রচলিত নিয়মের বাইরে ব্যক্তিক্রমরূপে চিহ্নিত হলেও লোকভয়ের কারণে তা প্রকাশ পায় না। এক্ষেত্রে বিস্তার ও বাস্তবরূপ দানের আনুকূল্য করতে হবে সমাজকেই। নইলে সৃষ্টিশীল মনের যন্ত্রণার দায়ভাগ বহন করতে হবে সমাজকেই। অতীতে অনেক কিছুই ছিল সমাজ কর্তৃক নিষিদ্ধ ও অননুমোদিত। কিন্তু কালপ্রবাহে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনার বাঁক পরিবর্তন হয়েছে। তারুণ্য দেখতে চায় নতুন কিছু, যাতে যৌবনের উদ্দামতায় মনে আনন্দের ঘনঘটা প্রস্ফুটিত হয়। সহজ-সরল ও নিষ্পাপ আনন্দবোধটুকুও সমাজ সহজভাবে দেখে না বলে তারুণ্যের মনে কাজ করে অপরাধবোধ। কিশোর-অপরাধী হয়ে ওঠে অবদমিত তরুণরাই। তার সৃজনশীল আত্মবিকাশের স্বাভাবিক পথ না পেলে অস্বাভাবিক উপায়ে নিজেকে প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্র খোঁজে। সমাজের শুভশক্তি ও ক্ষেত্রের অভাবে তারা অশুভ শক্তির ইশারায় ধ্বংসাত্মক হয়, সহজে তাদের কাজে লাগানো হয়। অপরাধবোধ জন্ম নেয়ার আগেই অজ্ঞাতসারে তারা অপরাধ করে, নিজেকে হারিয়ে ফলে ধ্বংসের ভয়ঙ্কর ভাগাড়ে। সহজ আনন্দ লাভ, সরল চিত্তবিনোদন, আত্মবিকাশ, সৃজনীশক্তির প্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা সকলেরই আছে। কিন্তু প্রচলিত প্রথার সবিধাভোগী শ্রেণী কখনো বুঝতে চায় না, এসব মূল্যায়ন করে না। ফলে বড় হওয়ার স্বাভাবিক কামনা সুপ্ত রেখে অস্বাভাবিক উপায়ে নিজেকে বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্নীতিসংশ্লিষ্ট বিষয়ের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হয়। তরুণের মনোভুবনের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলো এভাবে মার খায়, কিন্তু নিঃশেষ হয় না। প্রকৃত পথে সুযোগ না পেলেই মানুষ বিকৃতির আয়োজনে নিজেকে সমর্পণ করে। যে যুবক অপ্রকাশের ভার দীর্ঘদিন বহন করতে পারে না তাকে দীর্ঘদিন দমিয়ে রাখা যায় না। প্রকাশের দুর্নিবার আগ্রহে যে ব্যাকুল তার সৃজনশক্তি কোনো-না- কোনো পথের সন্ধান করবেই। বিস্ময়ের, দ্রোহের ও জিজ্ঞাসার স্ফুরণ সে ঘটাবেই।

সমাজগ্রাহ্য ধারণা ব্যক্তি প্রকাশ করে সহজেই। কিন্তু কল্পনাপ্রবণ মন যৌনাত্মক ধারনাগুলোকে প্রায়শ অবদমিত রাখে। সেগুলোকে শিল্পসম্মতভাবে সৃজনশীল সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে পারে না সবাই। ফলে মনে অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলো গুমরে ওঠে। দুঃখপূর্ণ অভিজ্ঞতাগুলোকে আমরা ভুলে থাকি, এড়িয়ে যাই অবদমনের মাধ্যমেই। কিন্তু সেগুলো গোপন মনে আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। মহত্তম ধারণা ও বিষয়গুলোকে মনে অবদমিত রাখলে আমাদের অস্থিরতা-যন্ত্রনা বাড়ে যদিও এ প্রক্রিয়ার আমরা ভারসাম্য রক্ষা করে সমাজের নিকট ভালো ও গ্রহণযোগ্য থাকার চেষ্টা করি। 'কিল খেয়ে কিল চুরির' ঘটনার নায়ক আমরাই। এ প্রক্রিয়ার কত শুভবোধ, শুভ ইঙ্গিত, ইতিবাচক প্রণোদনা ও কল্যাণকর প্রেষণার অপমৃত্যু হয়েছে মনের ভেতরে তার হিসেব আমরা করিনা। আত্মনিয়ন্ত্রণের নামে আত্মদমন ও আত্মপীড়নে অভ্যস্ত হলেই আত্মসংহার ও আত্মপতনের পরিণাম থেকে নিজেকে রেহাই দেয়া যায় না। আমাদের সত্তাজুড়ে অসুখকর যে প্রবৃত্তি মনোলোকে মনের অচেতনভাবে তাকে গোপন রাখার প্রবণতা নতুন নয়। কত আত্মস্খলন, কত দুর্ঘটনা, কত মনোময় অনুভূতির অঙ্কুর যে আমরা আড়াল করেছি সযত্নে তার কোনো পরিসংখ্যান নেই। এভাবে আমরা নিরাপদ থাকতে চেয়েছি। 'পাছে লোকে কিছু বলে'– তারই অজুহাতে আত্মমগ্ন থেকে আমরা নিজেকে মনের নিকট অপ্রকাশিত রেখেছি। প্রকাশিত আত্মসত্তা অপেক্ষা আমাদের অপ্রকাশিত সত্তা অনেক বড় অংশ জুড়ে অবস্থান করে। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মনের মধ্যে লুকায়িত এসব ঘটনার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। হঠাৎ অপ্রকাশিত আত্মসত্তার আলোকে প্রকাশিত সত্তার বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন। পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির বর্তমানকে বিচার করতে প্রয়াসী হয়েছেন। অবদমনের প্রক্রিয়ার আমরা সাময়িকভাবে দুঃখ-যন্ত্রণা, অশান্তি ও উদ্বেগ থেকে আত্মরক্ষা করি। কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হয় কি! আমাদের কৃত ঘটনার পেছনে থাকতে পারে বহিরাগত-আকস্মিক কারণ। নিজের সৃষ্ট ঘটনার নায়ক যখন প্রভাবশালী কেউ অজ্ঞাত থাকে তাকে সনাক্ত না করে আত্মসংশোধন করাও দুরূহ। সতর্ক শয়তানের প্ররোচনা, বিরূপ অবস্থার প্রতিক্রিয়া ও দৃষ্টিশক্তির অনিবার্য প্রভাবে আমরা যা করি তার পরিণাম ভোগ করতে হয় ঘটনার প্রত্যক্ষ ব্যক্তিকেই। মন্দঘটনার পেছনে যারা সংগঠিত হয়ে কাজ করে সেই ঘটনার দায়ভাগ তাদের উপরই বর্তায়। ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন-সামর্থ্য সীমাবদ্ধতাকে আমরা বিবেচনা করি না। শুধু সামাজিক রীতি-প্রথা আর নিয়মের অজুহাতে ব্যক্তিকে দমন-পীড়নে বাধ্য করি। ব্যক্তির মহৎ আকাঙ্ক্ষার অবদমন মহৎ সামাজিক সত্তা বিকাশেরও পরিপন্থী।

অপরাধের প্রকৃত নায়কেরা সামাজিক অবদমন খুঁজে নেয়, নিজেকে দুর্নীতি ও অপরাধের পরিণাম থেকে মুক্ত রাখতে চায় বলেই নিজের অস্পষ্টতাও অনুরূপভাবে লালন করে। কিন্তু মহৎ আকাঙ্ক্ষা, সৃজনীপ্রচেষ্টা আর স্বকীয় উপলব্ধির উচ্চকিত প্রকাশ রুদ্ধ করে রাখলে তাতে শুধু ব্যক্তির সত্তাই অবদমিত থাকে না সমাজের প্রগতিশীল বিকাশও ক্ষুন্ন হয়, বাধাগ্রস্ত হয়। মুক্ত ও সুস্থ সমাজ ছাড়া প্রগতি আসে না। প্রগতিপূর্ণ কাম্য সমাজ গঠনে উদ্যোগ, স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতার বিকল্প নেই। আত্মসত্তার বেপরোয়া অবদমন স্বৈরশৃঙ্খল গতিশীল সমাজের জন্য সুখকর সংবাদ হতে পারে না।

বাণিজ্যনীতিতে অবদমন: রাষ্ট্রের মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত

অ প র্ণা হা ও লা দা র

'রা'জার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি'– চুরি করে বলেই সে রাজা। আর ধনতান্ত্রিক জটিল অর্থনীতি এই চুরিকে দিয়েছে প্রশংসিত তত্ত্বের উপাধি। পাশ্চাত্যের উন্নত জীবন দেখে আমরা মোহিত হই, প্রলুব্ধ হই। কিন্তু এই অসম অবস্থার প্রেক্ষাপটে কি লুকিয়ে আছে শত শত বৎসরের লুটপাটের ইতিহাস? যে মনস্তাত্ত্বিক ক্ষুদ্রতায় বিশাল জমিদারের কামুক দৃষ্টি ধাবিত হয় দুই বিঘার শেষ আশ্রয়ের দিকে, সেই একই অবদমনের মনস্তত্ত্ব– যেনতেনভাবে কেড়ে নেওয়ার মনস্তত্ত্ব– কাজ করে যখন একটি বিশাল রাষ্ট্র ভেঙে দিতে চায় ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তিকে।

বাণিজ্যনীতি পর্যালোচনা করলে পৃথিবী দুটি মাত্র গোত্রে ভাগ হবে– একটি সারা পৃথিবীর বাজার দখল করে নিচ্ছে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী ছলচাতুরির সাহায্যে; আর অপরটি বার বার মার খাচ্ছে নিতান্ত টিকে থাকার তাগিদে। কেবল শক্তিধর হওয়ার সুবাদে গুটিকয় রাষ্ট্র যখন অর্থনীতির কলকব্জাগুলো নিজের অধিকারে রেখে– আমাদের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতিকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসে; তার পেছনের মনস্তত্ত্ব বোঝা দুরূহ নয় যদি আমরা নাইকো, এশিয়া এনার্জির নীতির দিকে তাকাই। দরিদ্র দেশের স্বাভাবিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে অক্টোপাসের মতো এরা পুঁজির পাহাড় গড়ে তুলছে কোটি কোটি মানুষের ভবিষ্যৎকে নিংড়ে নিয়ে। এই বাণিজ্য অবদমন একটি কূটনৈতিক চাল, সেই নষ্ট মানসিকতা যা দিয়ে বড় শক্তি আরো নষ্ট হওয়ার জন্য

ছোটকে পিষে ফেলে। বিভিন্ন সংগঠন বিশ্বব্যাপী সবার স্বার্থ রক্ষার মিথ্যা ব্রত নিয়ে কাজ করছে প্রধান কয়েকটি দেশের মুখপাত্র হয়ে। অথচ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মতো প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আমাদের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ভঙ্গুর অর্থনীতির স্থবিরতা অতিক্রমণে এসব কোনো উপকারে আসছে না। যদিও নির্বাচনের একক নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হাতে রেখে আমেরিকা, ইউরোপ **W.T.O**-কে শিখণ্ডী সাজিয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করছে। অবদমনের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করলে এসব প্রতিষ্ঠানের চরিত্র প্রকট চিত্র ধারণ করে। এসব রাষ্ট্র-র মনস্তত্ত্ব এমনই ভয়াবহ সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা যে এরা বিশ্ববাজারে গ্যাসের দাম যেখানে ৭ ডলার, সেখানে আমাদের থেকে নিতে চায় দেড় ডলারে। 'বড়' হওয়ার উদ্ধত মনস্তত্ত্বে এরা স্পর্ধিত হয়ে ওঠে আমাদের লুট করার মধ্য দিয়ে নয়া সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। এই গোলকধাঁধায় পড়ে নাইজেরিয়া আজ স্বর্ণভাণ্ডার থেকে পরিণত হয়েছে ঋণগ্রস্ত দুর্নীতিবাজের দেশে।

বাণিজ্যনীতি দ্বারা অবদমনের প্রতিটি পথ কাঁটামুক্ত করতে বড় রাষ্ট্র ছোট রাষ্ট্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে নেয় আগে। এটা করে বলেই ছোট ছোট রাষ্ট্রের দরিদ্র মানুষকে লোভ দেখিয়ে, টোপ ফেলে হাত করে নিতে চায়। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার পাওয়ার লোভে এরা অল্প কিছু টাকা ছড়ায় ছোট রাষ্ট্রগুলোর প্রশাসনকে হাত করার জন্য। বিশাল অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির এসব রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদদে তাই দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সৃষ্টি হয় দুর্নীতির আচরণ। আমরা অবাক হই না, যখন জানি প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেরই মহানায়কদের হত্যার পেছনের অবিসংবাদিত চরিত্র হচ্ছে আমেরিকা। ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে ছয় শতাধিক বার হত্যার চেষ্টা করেছে তারা কেবল এক দুর্ধর্ষ ডাকাতের মনস্তত্ত্ব থেকে।

দুই

বিশ্ববাণিজ্যের প্রধান কথা এখন– উদার বাণিজ্যনীতি যার অর্থ হল বাণিজ্যকর লোপ, ভর্তুকি হ্রাস ইত্যাদি। অথচ আমরা জানি, এই নীতিগুলোর আক্ষরিক ফল কী হবে। আমাদের মতো দেশগুলো যাদের শিল্পায়ন এখনো শৈশবের দরজা পেরোয়নি, যাদের নিজস্ব কাঁচামাল নেই, প্রযুক্তিগত অবকাঠামো নিতান্ত দুর্বল– তাদের ক্ষুদ্র শিল্পকে ধ্বংস করতে উদার বাণিজ্যনীতি কতটা কার্যকর? আমাদের বাজার উন্মুক্ত হবে তাদের পুঁজির প্রসারের জন্য; আপনার-আমার গায়ে-মাথায় উঠে 'ফ্যাশন' হবে বেশ; আর আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি চিরদিনের মতো অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। বন্যা-সিডরে বিধ্বস্ত আমাদের কৃষকসমাজের হাতে যদি সঠিক সময়ে পরিমাণমতো ভর্তুকি না পৌঁছে তবে খাদ্যসংকট ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। আমাদের আমদানি-নির্ভরতা বাড়ানোর কৌশল হিসেবে এগুলোর ব্যবহার করে সেই বিশাল রাষ্ট্রগুলো কোন মনস্তত্ত্ব থেকে তা কি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে? এবং এই মনস্তত্ত্বের গভীরতা তাদের চরিত্রে কতখানি, তা সহজেই বোঝা যাবে– যদি জানা যায় এই উদার বাণিজ্যনীতির সাথে তারা কীভাবে প্যাকেজ করে দিয়েছে ঋণ পাবার সুবিধাগুলো। অর্থাৎ,"হয় এটা মানো, নইলে বৈদেশিক ঋণ-ও পাবে না"। আমাদের বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণে এখন তো তাদের

ভূমিকাই প্রধান। পাশ্চাত্যের শ্রমিক-সংগঠনগুলো এদেশে শ্রমিক-অসন্তোষ বৃদ্ধির জন্য যে কোনো কিছু করতে প্রস্তুত। কেননা তাতে এখানে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। আমাদের গার্মেন্টস শিল্প মার খাবে ওদের কাছে। এসব অবদমনের চটুল নীতি যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকেই তারা সময়কে আখ্যায়িত করেছে "আধুনিক" নামে। মিলে যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের জমিদারবাবুর দম্ভোক্তির সাথে এই বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রগুলোর মনস্তত্ত্ব। এমনকি, জনশক্তির ক্ষেত্রেও এ নীতি সত্য। এদেশের ডিগ্রি নিয়ে পাশ্চাত্যে গিয়ে করতে হয় রেস্টুরেন্টে প্লেট ধোয়ার কাজ। অন্যদিকে স্কুল পাস করেও পাওয়া যায় তুলনামূলকভাবে ভালো কাজ; ডি.ভি. পূরণ করে যারা উল্লসিত– কেবল ওদের দেশে সুইপার, হোটেল বয়-এর কাজ করার জন্য মানুষ দরকার তাই অবদমনের তথাকথিত মানবিক পরিকল্পনা। 'তৃতীয় বিশ্বকে' ওরা তৃতীয় বিশ্বই বানিয়ে রাখতে চায়। একটি রাষ্ট্র তার অর্থনৈতিক বলিষ্ঠতার ওপর ভিত্তি করে আচরণ করে অর্থলিপ্সু ব্যক্তিবিশেষের মতোই– সেই একই মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে বাণিজ্যক্ষেত্রে অবদমনের এই উপায়গুলো তাদের নিয়ে যায় আরো আরো কথিত প্রথম বৈশ্বিক উপরে, যার পরিণতি আমাদের করে উলঙ্গ ভিক্ষুক জাতি।

অনুবাদ

অবদমনের ধারণা

মিশেল ফুকো/ অনুবাদঃ শওকত হোসেন

[১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে প্রাদেশিক এক প্রভাবশালী পরিবারে পল মিশেল ফুকোর জন্ম। তিনি ছিলেন কাঠামোবাদ ও উত্তরকাঠামোবাদের সঙ্গে জড়িত ফরাসি দার্শনিক, ইতিহাসবিদ ও রাজনীতিক। কাঠামোবাদী মার্কসবাদী লুই আলথুসারের পরামর্শে ১৯৫০ সালে ফরাসি কম্যুনিস্ট পার্টিতে ফুকো যোগ দেন। কিন্তু মাত্র ৩ বছরের মাথায় ১৯৫৩ সালে বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নে স্ট্যালিনের স্বৈরতান্ত্রিক নীতির কারণে রাজনীতির ওপর

থেকে তার মোহভঙ্গ হয়। এরপর আবার প্রায় ১৬/১৭ বছর পর ৭০-এর দশকের শুরু থেকে ফুকোর রাজনৈতিক সক্রিয়তা বেড়ে যায়। তিনি কয়েদিদের অধিকার আদায়ের জন্য একটা সংগঠন গড়ে তোলেন এবং প্রান্তিক মানুষদের পক্ষে নিয়মিত প্রতিবাদমুখর ছিলেন। ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দে প্রায় ৫৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। Paul Rabinow সম্পাদিত 'দি ফুকো রিডারস (এ্যান ইনট্রোডাকশন টু ফুকোস থট)' গ্রন্থ থেকে The Repressive Hypothesis নিবন্ধটি অনুবাদ করা হয়েছে। এই রচনাটি মিশেল ফুকোর মূল Sex And Truth গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ।]

সপ্তদশ শতাব্দীর দিকের আমরা যাকে বুর্জোয়া সমাজ বলি তখন অবদমনের একটা যথার্থ সময়ের সূচনা হয়েছিল। সম্ভবত আমরা এখনও পুরোপুরিভাবে সেটাকে পেছনে ফেলে আসতে পারিনি। পরবর্তী কালেও সরাসরি যৌনতার উল্লেখ ছিল কঠিন এবং কষ্টসাপেক্ষ ব্যাপার। যেন বাস্তবে দমন করার লক্ষ্যেই ভাষার প্রতিটি স্তরে যৌনতার উল্লেখ দমন করা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। মুখের ভাষায় এর প্রকাশ্য উল্লেখ নিয়ন্ত্রণ করার দরকার হয়ে পড়েছিল, যেসব কথা মুখে বলা হত তা থেকে একে নাকচ করে দেয়া হয়েছিল। অত্যন্ত খোলামেলাভাবে তুলে ধরা ভাষাকে দমন করা হয়েছে। এমনকি এসব নিষেধাজ্ঞাও যেন এর উল্লেখ করতে ভীত ছিল। শব্দটির উল্লেখমাত্র না করে আধুনিক বিনয় স্রেফ একে অন্যটির প্রসঙ্গ উল্লেখকারী পারস্পরিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে নিষেধাজ্ঞাগুলো এটা নিশ্চিত করেছিল যাতে কেউ যৌনতা শব্দটি উচ্চারণও না করে: নীরবতার উদাহরণ কোনও কিছু উল্লেখ ব্যতিরেকেই নীরবতা আরোপ করেছিল। সেন্সরশিপ।

তারপরেও কেউ যখন ধারাবাহিক পরিবর্তনসহ বিগত তিন শতাব্দীর দিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন সব কিছু বেশ অন্যরকম মনে হয়। যৌনতা প্রসঙ্গে অসংখ্য ডিসকোর্সের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়। তবে আমাদের একটা বিষয়ে স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন: অনুমোদিত শব্দভাণ্ডারের একটা প্রবল সংশোধনের ঘটনা ঘটেছিল। এমন হতে পারে যে পরোক্ষ উল্লেখ এবং উপমার সব রকম বাগাড়ম্বড়কে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল। বিনা প্রশ্নে নতুন স্বত্বাধিকার কিছু কিছু শব্দকে বাতিল করে দিয়েছে। বক্তব্যের ওপর খবরদারির ঘটনা ঘটেছে। মত প্রকাশের ওপর এক ধরণের নিয়ন্ত্রণও আরোপ করা হয়েছে। এজাতীয় বিষয়ে কথা বলা কখন অসম্ভব: কোন পরিস্থিতি, কাদের ভেতর এবং কোন সামাজিক সম্পর্কের ভেতর– স্পষ্ট হয়ে গেছে। এভাবে একেবারে চরম নৈঃশব্দ না হলেও এটা কৌশল আর গোপনীয়তার একটা এলাকা: যেমন সন্তান আর পিতামাতা, কিংবা ছাত্র ও শিক্ষক, কিংবা মনিব আর গৃহপরিচারকদের মাঝে– প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এতে প্রায় নিশ্চিতভাবে একটা নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল যা একদিকে স্বতঃস্ফূর্ত আবার অন্যদিকে সমন্বিতভাবে ভাষা আর মুখের কথার রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ক্লাসিক্যাল কালের সামাজিক বণ্টনের সঙ্গে যা সম্পর্কিত ছিল।

তবে ডিসকোর্স এবং তাদের আওতার ভেতর বাস্তবক্ষেত্রে বিপরীত ব্যাপারস্যাপার ঘটে গেছে। যৌনতা-সংক্রান্ত ডিসকোর্সের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আকার এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে পরস্পরের চেয়ে ভিন্ন নির্দিষ্ট ডিসকোর্স ছিল এসব। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক থেকে এ বিষয়ক আলোচনার প্রাবল্য গতি পায়। এখানে আমি সেভাবে "অসঙ্গত" ডিসকোর্সের উত্থানের কথা অর্থাৎ যেসব আইন আলোচনা নতুন শ্লীলতার আচরণবিধিকে ব্যঙ্গ করে অপমান বা পরিহাসের ভেতর দিয়ে যৌনতার উল্লেখ করেছে সেইসব আলোচনার কথা ভাবছি না। শোভন আচরণের বিধিবিধানের কড়াকড়ি প্রকৃতপক্ষেই পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসাবে অশোভন বক্তব্যের একটা জোয়ারের সৃষ্টি করেছিল। তবে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে খোদ ক্ষমতার ক্ষেত্রেই যৌনতা-সংক্রান্ত ডিসকোর্সের প্রসার, এ সম্পর্কে কথা বলার প্রাতিষ্ঠানিক উস্কানি, আরও বেশী করে তার উল্লেখ; এর উল্লেখ শোনার জন্যে ক্ষমতার প্রতিনিধিদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং সুস্পষ্ট উচ্চারণ এবং বিরামহীন পুঞ্জীভূত বিস্তারের সঙ্গে তার উল্লেখ।

কাউন্সিল অভ ট্রেন্টের পর ক্যাথলিক প্যাস্টরাল ও পেনান্সের স্যাক্রামেন্টে বিকাশের কথা ভাবুন। আস্তে আস্তে মধ্যযুগের কনফেশন ম্যানুয়েল-সৃষ্ট প্রশ্নের নগ্নতা এবং সপ্তম শতকেও তার যেসব অংশ ব্যবহৃত হচ্ছিল সেগুলোকে আড়াল করা হল। এক সময়ে শ্যানচেয বা ট্যাম্বুরিনির মতো লেখকরা যাকে কনফেশনের অপরিহার্য অংশ বলে মনে করতেন– যেমন সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর আসনের বর্ণনা, গৃহীত ভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি, স্পর্শিত স্থান, আদর, তৃপ্তির সুনির্দিষ্ট মুহূর্ত– কেউই যৌন সম্পর্কের পরিপূর্ণ যন্ত্রণাকর পর্যালোচনা তেমন বিস্তারিত স্বীকারোক্তির দিকে যেত না। বাড়তি গুরুত্বের সঙ্গে গোপনীয়তা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছিল। কৌমার্যের বিরুদ্ধে অপরাধের মোকাবিলা করার সময় সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। "ব্যাপারটা পীচের মতো, কারণ কেউ একে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার যত চেষ্টাই করুক, তা লেগে থাকে এবং নোংরা করে দেয়।" এবং পরে আলফানসো ডি' লিগুইরি বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তিমূলক এবং দুর্বোধ্য প্রশ্ন দিয়ে শুরু করার কথা বলেছেন।

তবে ভাষা পরিমার্জিত হলেও স্বীকারোক্তির আওতা– বিশেষ করে শরীরী স্বীকারোক্তি– ক্রমবর্ধমানহারে বেড়ে উঠেছে। এর কারণ কাউন্টার রিফর্মেশন বাৎসরিক স্বীকারোক্তির হার বাড়িয়ে তোলার কাজে ব্যস্ত ছিল এবং আত্ম-সমালোচনার খুঁটিনাটি নিয়ম চালু করার প্রয়াস পেয়েছিল। তবে সবার ওপর তা সম্ভবত অন্যান্য পাপের বদলে শরীরী পাপের ওপর বেশি করে গুরুত্ব আরোপ করেছে: চিন্তা, কামনা, ইন্দ্রিয়সুখের কল্পনা, ভোগ, দেহ ও মনের সম্মিলিত কর্মকাণ্ড। এরপর থেকে স্বীকারোক্তি এবং পরামর্শের প্রক্রিয়ায় এর সমস্ত কিছুকেই অন্তর্ভূক্ত করতে হয়েছে। নতুন প্যাস্টরাল বিধি অনুযায়ী যৌনতার কথা সরাসরি উল্লেখ করা চলবে না, তবে এর বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন সম্পর্ক এবং প্রভাবকে অবশ্যই সূক্ষ্মতম প্রকাশের ভেতর অনুসন্ধান করতে হবে: দিবাস্বপ্নের কোনও ছায়া, ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়া কোনও কল্পনা,

শরীরের যান্ত্রিকতা ও মনের কোনও খারাপ জটিলতা, সবকিছু খুলে বলতে হবে। দেহকে সকল অশুভের মূলে পরিণত করার একটা দ্বিমুখি পর্যালোচনা, খোদ পাপাচারের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটিকে দুর্বোধ্য এবং অপ্রকাশ্য কামনার দিকে নিয়ে যাওয়া, কারণ এটা এমন এক অশুভ বিষয় যা সম্পূর্ণ পুরুষকে সর্বাত্মক গোপন উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। "সুতরাং তোমার আত্মার সকল দিক: স্মৃতি, বোধশক্তি এবং ইচ্ছা– তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা কর। তোমার সকল বোধকেও পরীক্ষা কর...তাছাড়া, তোমার সমস্ত চিন্তাভাবনা, তোমার প্রতিটি কথা, তোমার সব কাজ পরীক্ষা কর; এমনকি তোমার স্বপ্নও যাচাই কর, যাতে জেগে ওঠার পর জানতে পার তুমি সেগুলোর প্রতি সম্মতি দাওনি। সবশেষে এমন স্পর্শকাতর ও বিপজ্জনক একটা বিষয় নিয়ে ভাবতে যেও না, এখানে তুচ্ছ বা তাৎপর্যহীন কিছু রয়েছে।" সুতরাং ডিসকোর্সকে দেহ ও আত্মার সকল বাঁক ঘুরে পাপের স্তরে পৌঁছতে হয়েছে। দেহের মসৃণ আচ্ছাদনকে ভেদ করতে হয়েছে। সযত্নে সংশোধিত যৌনতার প্রত্যক্ষ উল্লেখ করবে না এমন একটা ভাষার কর্তৃত্ব নিয়ে কোনও অস্পষ্টতা বা বিরাম দেবে না এমন ডিসকোর্সের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল।

সম্ভবত এ পর্যায়েই প্রথমবারের মতো একটা সাধারণ নিয়ন্ত্রণের ভেতর দিয়ে পশ্চিমের কাছে বড্ড অদ্ভুত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। আমি প্রচলিত প্রায়শ্চিত্ত প্রথা অনুযায়ী যৌনতার বিধান ভঙ্গের কথা স্বীকার করার বাধ্যবাধকতার কথা বলছি না, বরং যৌনতার সঙ্গে কিছুটা সম্পর্ক আছে এমন অসংখ্য সুখ, শিহরণ আর ভাবনার কথা নিজের কাছে এবং অন্যের কাছে বলার প্রায় সীমাহীন দায়িত্বের কথা বোঝাচ্ছি। সাধু এবং মঠের সেটিংয়ের বহু আগেই যৌনতাকে ডিসকোর্সে পরিণত করার পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছিল। সপ্তম শতক তাকে সবার জন্যে একটা বিধানে পরিণত করে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাবে একটা ক্ষুদ্র অভিজাত গোষ্ঠী ছাড়া আর কারও ওপর তা প্রযোগ করা হয়নি। বছরে মাত্র একবার বিরল ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তির মোকাবিলাকারী বিপুলসংখ্যক সাধারণ বিশ্বাসী এ-জাতীয় জটিল বিধিব্যবস্থার নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। তবে নিঃসন্দেহে একথা ঠিক যে প্রতিটি ভালো ক্রিশ্চানের জন্যে এই দায়িত্বের বিধান আরোপ করা হয়েছিল। একটা ঔচিত্যবোধের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল: আপনি কেবল আইন লঙ্ঘনের কথা বর্ণনা করবেন না, বরং আপনাকে আপনার প্রতিটি আকাঙ্ক্ষাকে ডিসকোর্সে রূপান্তরিত করতে আগ্রহী হবেন। এ পর্যন্ত প্রযুক্ত ভাষাকে সযত্নে নিরপেক্ষ করা হলেও বিধিকে এড়িয়ে যাবার প্রয়াস নেওয়া হয়নি। ক্রিশ্চান প্যাস্টরাল সীমাহীন ভাষণের মাধ্যমে যৌনতার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত কিছুকে অবগত করার কাজটিকে মৌলিক দায়িত্বে পরিণত করে। বিশেষ কিছু শব্দের ওপর নিষেধাজ্ঞা, অভিব্যক্তির শ্লীলতা, এবং শব্দভাণ্ডারের সমস্ত সেন্সরিং হয়ত সেই ব্যাপক অবদমনের দ্বিতীয় পর্যায়ের কৌশল হয়ে থাকতে পারে: একে নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং কৌশলগতভাবে উপযুক্ত করে তোলা।

সপ্তম শতাব্দীর প্যাস্টরাল থেকে সাহিত্যে– অর্থাৎ "অপবিত্র" সাহিত্য–এর অভিক্ষেপে একটা সরলরেখা টানা যেতে পারে। "সব কথা বলো," বারবার বলেছেন

পরিচালকগণ, "কেবল সম্ভোগের কাজটি নয়, বরং ইন্দ্রিয়জ স্পর্শ, অপবিত্র দৃষ্টিপাত, সমস্ত অশ্লীল মন্তব্য...সম্মতি প্রকাশক সব ভাবনা।" আধ্যাত্মিক নির্দেশনামূলক নিবন্ধ থেকে গৃহীত বলে মনে হওয়া নিষেধাজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন সাদে: "তোমার বর্ণনাকে অবশ্যই সবচেয়ে বেশিসংখ্যক অনুসন্ধানী ব্যাখ্যায় সাজানো হতে হবে, যাতে আমরা তোমার বর্ণিত আবেগের সঙ্গে মানবীয় আচরণের সম্পর্ক কী তা বিচার করতে পারি; মানুষের চরিত্র পরিস্থিতিকে আড়াল না করার ইচ্ছা থেকে নির্ধারিত হয়। আরও বড় কথা হচ্ছে, তোমার বয়ান থেকে আমরা যে ধরণের ইন্দ্রিয়জ তথ্য পেতে চাই তার ওপর স্বল্পসংখ্যক বর্ণনা ব্যাপক প্রভাব ফেলে।" ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে মাই সিক্রেট লাইফ-এর অজ্ঞাত লেখক বাহ্যিকভাবে অন্তত একই ব্যবস্থাপত্রের আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই মানুষটি নিঃসন্দেহে প্রচলিত ধরনের লম্পট ছিল; তবে জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলার ধারণা পেয়েছিল সে– নিজেকে পুরোপুরি যৌন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করেছিল–প্রতিটি পর্বের নৈতিক বিবরণসহ। অনেক সময় তরুণসমাজকে শঙ্কিত করে তোলার জন্যে নিজের উদ্বেগের কথা বলেছে সে। স্বল্পসংখ্যক কপির এগারটি খণ্ডে এই ব্যক্তিটি অভিযান, আনন্দ আর তার যৌনতার শিহরণের একেবারে ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। একেবারে খাঁটি ঔচিত্যবোধের প্রকাশ করার সময় নিজের ভাষা উল্লেখ করাই শ্রেয়: "আমি যতদূর মনে করতে পেরেছি ঠিক যেভাবে যা ঘটেছে তার সত্য বর্ণনা করেছি। এটুকুই করার ছিল আমার;" "গোপন জীবন অবশ্যই কোনও কিছু বাদ দিতে পারে না, এখানে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই... মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে কেউ বেশি কিছু জানতে পারে না।" মাই সিক্রেট লাইফ-এর নিঃসঙ্গ লেখক এসব বর্ণনা করার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রাযশই বলছে যে তার অদ্ভুত আচরণ নিঃসন্দেহে পৃথিবীর বুকে হাজার হাজার মানুষের মধ্যেও রয়েছে। কিন্তু এইসব আচারের মূল নীতিমালা, এগুলোকে দৈনন্দিন জীবন থেকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার পেছনে মূল কারণ, আধুনিক মানুষের মনে দুশো বছরেরও বেশী সময় ধরে বিরাজ করছে। সাহসী এই নিঃসঙ্গ মানুষটির মাঝে তাকে মূক হতে বাধ্যকারী "ভিক্টোরিয়ানিজম" থেকে পলাতক একজনকে দেখার বদলে আমি বরং ভাবতে চাই যে গোপনীয়তা আর শ্লীলতা আরোপকারী একটা কালে সে ছিল সবচেয়ে প্রত্যক্ষ এবং এক অর্থে যৌনতা সম্পর্কে কথা বলার ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিনিধি। ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা অবশ্য "ভিক্টোরিয়ান পিউরিটানিজম"-এর পরিমিতিবোধকেই তুলে ধরে; যেভাবেই হোক সেগুলো ছিল এক ধরণের বিচ্যুতি, পরিমার্জনা; যৌনতাকে ডিসকোর্সে রূপান্তর প্রক্রিয়ার একটা কৌশলগত ডাইভার্শন।

ক্রিশ্চান প্যাস্টরালে এরই মধ্যে মূল বৈশিষ্ট্যগুলো রূপ নিতে থাকা যৌনতায় রানীর চেয়েও বেশি করে মূল চরিত্রে পরিণত হবে এই নামহীন ইংরেজ লোকটি। সন্দেহ নেই শেষেরটির বিপরীতে তার ক্ষেত্রে এটা ছিল লব্ধ অভিজ্ঞতাকে সেগুলো সম্পর্কে তার চিন্তাভাবনা দিয়ে আরও বিস্তৃত করে তোলার ব্যাপার। সাদের মতো সেও "স্রেফ নিজের আনন্দের জন্যেই" লিখেছে– এই অভিব্যক্তির সবচেয়ে জোরালো অর্থে। লেখকের যৌনাবেদনময় পুনরাবৃত্তি, প্রলম্বিত এবং উস্কানিমূলক দৃশ্যগুলোর

সঙ্গে লেখক সাবধানে সম্পাদনা ও টেক্সটকে মিশিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ক্রিশ্চান প্যাস্টরাল সম্পূর্ণ এবং পরিকল্পিতভাবে ডিসকোর্সে রূপান্তরের মাধ্যমে কামনার বিশেষ প্রভাবকে রূপান্তর করতে চেয়েছে। নিশ্চিতভাবেই প্রভুত্ব এবং বিচ্ছিন্নতার প্রভাব, তবে আধ্যাত্মিক পুনঃরক্ষণশীলতা ও ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাবর্তনের প্রভাবও ছিল– প্রলোভন এবং তাকে প্রতিহত করার জন্যে কারও বেদনার অনুভূতি। পশ্চিমের মানুষ যে তিনশো বছর ধরে যৌনতার কথা বলার চেষ্টা করে আসছে, এই ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। ক্ল্যাসিকাল যুগ থেকেই যৌনতার ডিসকোর্সের একটা অবিরাম আশাবাদ এবং ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখা যায়। এই সযত্ন বিশ্লেষণমূলক ডিসকোর্সের অর্থ ছিল স্থানচ্যুতি, প্রবলকরণ, পুনঃপরিচয় এবং খোদ কামনার পরিমার্জনা তুলে আনা। যৌনতা সম্পর্কে কী বলা যাবে তার আওতাই কেবল প্রসারিত হয়নি, মানুষ এর কথা শুনতে বাধ্য হয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, নানামুখি প্রভাবের একটা জটিল সমাবেশের মাধ্যমে ডিসকোর্স যৌনতার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে। কেবল নিষিদ্ধকরণের আইনের মাধ্যমে যাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। যৌনতার ওপর সেন্সরশিপ আরোপ? বরং যৌনতার ডিসকোর্সের ব্যাপক উৎপাদনের জন্যে একটা পদ্ধতি গড়ে তোলা হয়েছিল, যা নিজস্ব অর্থনীতির কার্যাবলী সম্পাদন এবং তার প্রভাব গ্রহণের উপযোগী ছিল।

অন্যান্য কৌশলের সমর্থন এবং তার মাধ্যমে প্রবাহিত না হলে এই কৌশলটি হয়ত ক্রিশ্চান আধ্যাত্মিকতার নিয়তির সঙ্গেই সম্পর্কিত থেকে যেত। প্রথমত "জনগণের স্বার্থে" সমন্বিত কৌতূহল বা নতুন মানসিকতা নয়, বরং ক্ষমতার মেকানিজম এমনভাবে কাজ করেছে যে যৌনতার ডিসকোর্স পরীক্ষাসাপেক্ষ কারণে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে যৌনতা নিয়ে আলোচনার একটা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং কারিগরি প্রণোদনা সৃষ্টি হয়েছিল। তবে সেটা যৌনতার সাধারণ কোনও সূত্র হিসাবে নয়, বরং বিশ্লেষণ, তথ্য সংগ্রহ, শ্রেণীবিন্যাস এবং নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে কিংবা পরিমাণগত বা সাধারণ গবেষণার বেলায় যেমন হয়ে থাকে। যৌনতাকে "বিবেচনায় আনা", কেবল নৈতিকতা থেকে নয় বরং যুক্তি থেকেও আহরিত যৌনতা-সংক্রান্ত ডিসকোর্স এতই নতুন ছিল যে প্রথম দিকে তা নিজেই দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, নিজের অস্তিত্বের কারণে তা ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। যুক্তিভিত্তিক একটা ডিসকোর্স কীভাবে এর কথা বলতে পারে? "বিরল ক্ষেত্রে দার্শনিকগণ বিতৃষ্ণা এবং পরিহাসের মধ্যবর্তী এই সব বিষয়ের দিকে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, যেখানে কেলেঙ্কারী এড়িয়ে যাওয়াটা কারও পক্ষে অত্যন্ত জরুরি।" এবং এক শতাব্দী পরে চিকিৎসাবিদ্যা যা আবিষ্কার করতে যাচ্ছে তা নিয়ে তেমন একটা বিস্মিত হবে না আশা করলেও কথা বলার মুহূর্তে দ্বিধা করেছে। "এইসব সত্যকে আবৃত করে রাখা অন্ধকার, এবং এগুলোর প্রণোদিত বিতৃষ্ণা সব সময় দর্শকের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিয়েছে...দীর্ঘদিন ধরে আমি ঘৃণিত দৃশ্যকে আমার গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে দ্বিধায় ভুগেছি।" এই বিবেক বা তাদের প্রকাশিত "নৈতিকতা" নয়, আসলে প্রয়োজন এই দ্বিধাকে অতিক্রম করার সমন্বিত প্রয়োজীয়তা। যৌনতা নিয়ে কথা বলতে হয়েছে প্রকাশ্যে এবং এমন ভঙ্গিতে যা শ্লীল বা অশ্লীলতার বিভাজন দ্বারা নির্ধারিত

নয়। বক্তা নিজের জন্যে পার্থক্য বজায় রাখলেও (এই গম্ভীর এবং প্রাথমিক ঘোষণাগুলো প্রকৃতপক্ষে তাই প্রকাশ করতে চায়), কাউকে এ নিয়ে এমনভাবে কথা বলতে হয়েছে যে এটা কেবল ঘৃণিত বা সহ্য করার একটা ব্যাপার নয় বরং তাকে সামলাতে হয়েছে। উপযোগিতার ব্যবস্থার ভেতর তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছে। সবার সর্বোচ্চ মঙ্গলের জন্যে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়েছে। কাম্যতা অনুযায়ী কর্মশীল করে তুলতে হয়েছে। যৌনতা সাধারণভাবে বিচার করার কোনও বিষয় ছিল না। এটা ছিল পরিচলানার একটা বিষয়। সাধারণের সম্ভাবনার ভেতরই এর অবস্থান ছিল। এর জন্যে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার প্রয়োজন ছিল। বিশ্লেষণমূলক ডিসকোর্সের মাধ্যমের এর নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে "যৌনতা" একটা পুলিশি বিষয়ে পরিণত হয়। সেই সময়ের কথাটির পূর্ণাঙ্গ অর্থে। বিশৃঙ্খলার অবদমন নয় বরং যৌথ এবং ব্যক্তিবিশেষের শক্তির সুশৃঙ্খল সর্বোচ্চকরণ। "আমাদেরকে অবশ্যই এর বিধিবিধানের প্রজ্ঞার সাহায্যে সংহত এবং সমৃদ্ধ হতে হবে। যেহেতু ক্ষমতা কেবল সাধারণভাবে প্রজাতন্ত্রের মাঝে বা একে গড়ে-তোলা প্রত্যেকটি নাগরিকের মাঝে অবস্থান করে না, বরং এর অন্তর্ভুক্তদের বিভিন্ন গুণাবলী এবং মেধার দ্বারাও সৃষ্টি হয়ে থাকে, ফলে পুলিশকে এইসব উপায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে হয় এবং নিজেদের জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত করতে হয়। তারা কেবল ওইসব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান দিয়েই এই ফল অর্জন করতে পারে।" যৌনতার ওপর খবরদারি কোনও টাবুর বাড়াবাড়ি নয় বরং উপযোগী এবং সাধারণ ডিসকোর্সের মাধ্যমে যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা প্রয়োজনীয়তা।

অল্প কয়েকটি নজীরই যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান হবে। অষ্টাদশ শতকের অন্যতম ক্ষমতাকৌশলের মহান উদ্ভাবন ছিল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে "জনসংখ্যার" আত্মপ্রকাশ: সম্পদ হিসাবে জনসংখ্যা, মানবশক্তি হিসাবে জনসংখ্যা বা শ্রমশক্তি হিসাবে জনসংখ্যা নিজের বৃদ্ধি এবং নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পদের মাঝে ভারসাম্য বজায় রেখেছে। সরকারগুলো মনে করেছে যে তারা কেবল প্রজা বা "জনগণকে" নিয়ে কাজ করছে না, বরং নির্দিষ্ট বিশাল আকার এবং বিচিত্র চলক বিশিষ্ট "জনসংখ্যা": জন্ম এবং মৃত্যুহার, আয়ু, উর্বরাশক্তি, স্বাস্থ্য-অবস্থা, অসুস্থতার হার, খাদ্যাভ্যাস এবং বসতি ইত্যাদি নিয়ে কাজ করছে। এইসব চলক এমন একটা জায়গায় অবস্থান করে যেখানে জীবনের বৈশিষ্ট্যসূচক চলমানতা এবং প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট প্রভাবসমূহ পরস্পরকে স্পর্শ করে: "রাষ্ট্রসমূহ তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি অনুযায়ী জনসংখ্যার বিন্যাস ঘটায় না, বরং তাদের শিল্প, পণ্য, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কারণে জনসংখ্যার বিকাশ ঘটে...জমিনের ফসল এবং শ্রমের মাধ্যমে তারা যেই সুবিধা আর সম্পদ অর্জন করে তার অনুপাত অনুযায়ী মানুষ বৃদ্ধিলাভ করে।" জনসংখ্যার এই সমস্যার একেবারে মূলে রয়েছে যৌনতা। জন্মহার, বিয়ের বয়স, বৈধ এবং অবৈধ বিয়ে, যৌন সম্পর্কের পরিপক্কতা এবং হার , তাদের উর্বরা বা নির্বীয করার উপায়, অবিবাহিত জীবন বা নিষেধাজ্ঞার প্রভাব, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রভাব বিশ্লেষণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। এইসব জঘন্য "মারাত্মক গোপন" বিষয়সমূহের যেগুলো বিপ্লবের অব্যবহিত

আগে ডেমোগ্রাফাররা জানতেন সেগুলো ইতিমধ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের জানা ছিল।

অবশ্যই বহুদিন ধরেই এটা মনে করে আসা হচ্ছিল যে ধনী এবং শক্তিশালী হতে হলে রাষ্ট্রকে জনসংখ্যায় অধ্যুষিত হতে হবে। তবে এবারই প্রথম কোনও সমাজ একে অটলভাবে নিশ্চিত করেছিল যে এর ভবিষ্যত এবং ভাগ্য কেবল নাগরিকদের সংখ্যা আর দৃঢ়তা, বিয়ে ও বৈবাহিক নিয়মকানুন ও পারিবারিক সংগঠনের সঙ্গেই সম্পর্কিত নয়, বরং ব্যক্তি কীভাবে তার যৌনতাকে ব্যবহার করছে তার সঙ্গেও সম্পর্কিত। ধনী, ব্যাচেলর এবং দুশ্চরিত্রদের ব্যর্থ ব্যভিচার নিয়ে বিলাপ থেকে ব্যাপারটা এমন একটা ডিসকোর্সের দিকে বাঁক নিয়েছিল যেখানে জনগণের যৌন আচরণকে বিশ্লেষণ ও হস্তক্ষেপের লক্ষ্যবস্তু হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। বণিক যুগের কৌশল থেকে সময়ের লক্ষ্য এবং জরুরিত্বের আলোকে সাধারণ জনসংখ্যাবাদী যুক্তির বদলে ক্রমবর্ধমান জন্মহারকে নিয়ন্ত্রণকে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সূক্ষ্ম ও সুপরিকল্পিত বিধিবিধান আরোপের প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল। জনসংখ্যার রাজনৈতিক অর্থনীতির মধ্য দিয়ে যৌনতা সম্পর্কে সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ দেখা দিয়েছিল। অর্থনৈতিক ও জীববিজ্ঞানের প্রান্তসীমায় যৌন আচরণ, সেগুলোর নির্ধারক এবং প্রভাব বিশ্লেষণের উপায় উদ্ভাবণ করা হয়। দম্পতির যৌন আচরণকে সমন্বিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আচরণে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে প্রথাগত উপায়ের ঊর্ধ্বে উঠে পদ্ধতিগত প্রচারণারও সৃষ্টি হয়েছিল। সময়ের পরিক্রমায় এইসব নতুন পদ্ধতি ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বর্ণবাদের বিভিন্ন ভাষ্যের মূল বিন্দুতে পরিণত হয়। নাগরিকদের যৌনতার কী ঘটছে এবং তাকে কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে জানাটা রাষ্ট্রের পক্ষে আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। এটাও জানা দরকার ছিল প্রত্যেক নাগরিক এর ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম। রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির মাঝে যৌনতা একটি পাবলিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছিল। ডিসকোর্স, বিশেষ জ্ঞান এবং বিধিনিষেধের একটা জাল এর উপর ঘনীভূত হয়েছিল।

শিশুদের যৌনতার ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি একই রকম ছিল। বলা হয়ে থাকে যে ক্লাসিক্যাল যুগ একে এমন এক ধোঁয়াশায় ঠেলে দিয়েছিল যে থ্রি এসেজ বা লিটল হ্যান্স-এর উদার উদ্বেগের আগে এর তেমন প্রকাশ ঘটেনি। এটা ঠিক যে সন্তান এবং অভিভাবক বা ছাত্র ও শিক্ষকদের ভেতরকার দীর্ঘদিনের ভাষার "স্বাধীনতা" হয়তো অদৃশ্য হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনও শিশু-শিক্ষকই এরাসমাস তাঁর ডায়ালগে যেভাবে বলেছেন সেভাবে ছাত্রদের উপদেশ দিতেন না। সকল সামাজিক শ্রেণীতে শিশুদের যৌনতার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাণখোলা হাসি আস্তে আস্তে দমিত হয়ে গিয়েছিল। তবে এটা নীরবতা চাপিয়ে দেওয়ার কোনও সহজ সাধারণ ব্যাপার ছিল না। বরং তা ছিল এক নতুন ডিসকোর্সের সময়। এব্যাপারে কম কথাবলা হয়নি, বরং উল্টোটিই সত্য। তবে কথা বলা হত ভিন্নভাবে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন জনে এসব কথা বলেছে ভিন্ন ফল প্রাপ্তির জন্যে। খোদ নীরবতা– কেউ বলতে চায় না বা নাম উল্লেখ করতে চায় না এমন কিছু; বিভিন্ন বক্তার মাঝে প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা– ডিসকোর্সের পরম সীমার চেয়ে কম ছিল। কে কী বলছে বা কী বলছে না তার মাঝে কোনও রকম

বাইনারি পার্থক্য ছিল না। আমাদেরকে অবশ্যই কিছু না বলার বিভিন্ন উপায় বের করার চেষ্টা করতে হবে। কীভাবে যারা বলতে পারছে আর পারছে না তাদের ভাগ করা হবে। কোন ধরনের ডিসকোর্স অনুমোদিত কিংবা উভয় ক্ষেত্রে কোন ধরনের ডিসকোর্স উপযোগী। এক রকম নয় বরং অনেক রকম নীরবতা রয়েছে। ডিসকোর্সকে রূপদানকারী এবং গড়ে তোলা কৌশলের অপরিহার্য অংশ সেগুলো।

উদাহরণ স্বরূপ অষ্টাদশ শতকের মাধ্যমিক স্কুলকে বেছে নিন। সামগ্রিকভাবে যে কেউ বুঝবে এইসব প্রতিষ্ঠানে যৌনতার কথা খুব কমই উল্লেখ করা হত। তবে কাউকে কেবল স্থাপত্য লেআউট, শৃঙ্খলার বিধিবিধান এবং সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ সংগঠনের দিকে নজর দিতে হবে। যৌনতার প্রশ্নটি ছিল অব্যাহত একটা ধারণা। নির্মাতা একে বিশেষভাবে বিবেচনা করেছেন। সংগঠকরা একে স্থায়ীভাবে হিসাবে ধরেছেন। ক্ষমতাবান সবাইকে সার্বক্ষণিক সতর্কতায় স্থাপন করা হয়েছিল যেখানে সরঞ্জাম, গৃহীত সাবধানতা এবং শাস্তি ও দায়দায়িত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক কখনও পুনরুল্লেখ করা হয়নি। ক্লাসের স্থান, টেবিলের আকার, বিনোদনমূলক শিক্ষার পরিকল্পনা, ডরমিটরিসমূহের বণ্টন (পর্দাসহ বা ছাড়া বা দেয়ালসহ বা ছাড়া), শুতে যাবার সময় এবং ঘুমের সময় পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি সবই একেবারে ব্যাপকভাবে শিশুদের যৌনতার কথাই বুঝিয়েছে। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ডিসকোর্স বলে যাকে অভিহিত করা যেতে পারে– নিজেকে নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে যার সূচনা, এবং একে কার্যশীল করে তুলেছে যারা তাদের মাঝে যার বিস্তার– এই ধারণার উপরই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত যে যৌনতার অস্তিত্ব আছে এবং তা অকালপক্ক, সক্রিয় ও সর্বক্ষণ বিরাজমান। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে স্কুলছাত্রের যৌনতা এমন হয়ে দাঁড়ায়নি– সাধারণভাবে কৈশোরিকতা হতে ভিন্ন– একটা সাধারণ সমস্যা। চিকিৎসকগণ পরিচালক এবং শিক্ষকদের পরামর্শ দিয়েছেন, তবে তারা পরিবারকেও মতামত দিয়েছেন। শিক্ষকগণ বিভিন্ন প্রজেক্ট তৈরি করে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেছেন। স্কুল শিক্ষকরা ছাত্রদের কাছে গেছেন, তাদের পরামর্শ দিয়েছেন। নৈতিক এবং চিকিৎসা-সংক্রান্ত উদাহরণসহ বইপত্র রচনা করেছেন। স্কুলছাত্র ও তার যৌনতাকে ঘিরে মতামত, পর্যবেক্ষণ, চিকিৎসা-পরামর্শ, বিভিন্ন চিকিৎসা-সংক্রান্ত ঘটনা, সংস্কারের রূপরেখা এবং আদর্শ সংগঠনের পরিকল্পনার একটা ব্যাপক সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। বেসডো ও জার্মান "দানের" আন্দোলনের ফলে কৈশোরের যৌনতাকে ডিসকোর্সে রূপান্তরের এই প্রক্রিয় ব্যাপক মাত্রা পেয়েছিল। এমনকি সালযমান পরীক্ষামূলকভাবে এমন একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে এমন ব্যাপকভাবে যৌনতা শিক্ষা দেওযা হত যে একজন যুবার সর্বজনীন পাপের চর্চার কোনও প্রয়োজনই পড়েনি। গৃহীত এইসব পদ্ধতির ফলে শিশুটি কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের মাঝে পূর্ব নির্ধারিত পর্যবেক্ষণের বস্তুতে পরিণত হয়নি বরং একটা নির্দিষ্ট, যৌক্তিক, সীমিত, অনুশাসনিক এবং বিশ্বস্ত ডিসকোর্স তার পক্ষে রচনা করা হয়েছিল–একধরণের ডিসকার্সিভ অর্থোপেডিক্স।

১৭৭৬ সালের মে মাসে আয়োজিত মহা ফিলানথ্রোপিনাম এই ক্ষেত্রে নজীর হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। ফুলের খেলার সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষা গ্রহণের ভেতর দিয়ে

পুরস্কার প্রদান এবং একটা পর্যালোচনা পরিষদ থাকায় এটা কৈশোরিক যৌনতা আর যৌক্তিক ডিসকোর্সের প্রথম ভাবগম্ভীর সমন্বয়ে পরিণত হয়েছিল। যৌনশিক্ষা প্রদত্ত ছাত্রদের সাফল্য তুলে ধরার জন্যে বেসডাও তাঁর সাধ্যমতো জার্মানির সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন (গ্যেটে ছিলেন নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানকারী অল্পকজনের একজন)। সমবেত জনগণের সামনে ফল্কে নামের একজন প্রফেসর ছাত্রদের যৌনতা, জন্ম এবং প্রজনন-সংক্রান্ত নির্বাচিত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাদের অন্তসত্ত্বা নারী, দম্পতি এবং একটা দোলনার ছবির ওপর মন্তব্য করার আহবান জানান। কোনও রকম লজ্জা বা সংকোচ ছাড়াই প্রদত্ত জবাবগুলো ছিল আলোকিত। অনভিপ্রেত কোনও হাসি তাদের বাধা দেয়নি–কেবল শিশুদের চেয়েও অপরিপক্ক একজন বয়স্ক লোক বাদে–এবং ফল্কে স্বয়ং তাকে ভর্ৎসনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত সবাই দেবদূতসুলভ চেহারার এই শিশুদের তারিফ করেছে যারা প্রাপ্তবয়স্কদের সামনে দক্ষতার সঙ্গে যৌনতা আর ডিসকোর্সকে মালা পরিয়েছে।

এটা বলা ভুল হবে যে শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ শিশুদের যৌনতা এবং বয়ঃসন্ধিকালের উপর ভারী একটা নৈঃশব্দ চাপিয়ে দিয়েছিল। বিপরীতক্রমে অষ্টাদশ শতক থেকে এগুলো এবিষয়ের উপর ডিসকোর্সের পরিমাণ বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছিল। যৌনতাকে প্রতিষ্ঠা করার বহুদিক স্থাপন করেছিল; বিষয়বস্তু ও শিক্ষিতদের রূপ দিয়েছে। শিশুদের যৌনতা-সম্পর্কে কথা বলা, শিক্ষক চিকিৎসক প্রশাসক এবং অভিভাবকদের এ সম্পর্কে বা তাদের সঙ্গে কথা বলতে প্রভাবিত করা, শিশুদেরও এই বিষয়ে কথা বলতে বাধ্য করা এবং তাদের সম্পর্কে কথা বলা বা তাদেরকে নিয়ে কথা বলা ডিসকোর্সের জালে বাধা, কিংবা তাদেরকে অনুশাসনিক জ্ঞান দান করা কিংবা তাদের আয়ত্তের বাইরের একটা বিজ্ঞান গড়ে তোলার জন্যে তাদের ভিত্তি হিসাবে কাজে লাগানো–এসবই আমাদের ডিসকোর্সের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে ক্ষমতার হস্তক্ষেপের সম্পর্ক আবিষ্কারে আমাদের সক্ষম করে তোলে। অষ্টাদশ শতক থেকে শিশু-কিশোরদের যৌনতা বিতর্কের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল যাকে ঘিরে অসংখ্য প্রাতিষ্ঠানিক উপায় এবং ডিসকার্সিভ কৌশল নিয়োজিত করা হয়েছে। এটা সত্যি হতে পারে যে বয়স্ক এবং শিশুরা একটা নির্দিষ্ট উপায়ে যৌনতা-সম্পর্কে কথা বলা হতে বঞ্চিত হয়েছিল, এমন একটা উপায় যা একেবারে প্রত্যক্ষ বা সোজাসাপ্টা বা কর্কশ হবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে সেটা ছিল ডিসকোর্সের কেবল একটা পাল্টা অংশ মাত্র। শক্তি-সম্পর্কের চারপাশে জড়ো হওয়া পরস্পর-সম্পর্কিত, শ্রেণীবিন্যাসিত এবং সুবিন্যাসিত ডিসকোর্স। সম্ভবত সেগুলোর কার্যকর হওয়ার পথে এই শর্তটুকু প্রয়োজনীয় ছিল।

অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীতে যৌনতার বিষয়ে ডিসকোর্সের সূচনাকারী আরও কেন্দ্রবিন্দুর কথা বলতে পারেন কেউ। প্রথমত 'নার্ভাস ডিসঅর্ডারের' মাধ্যমে ওষুধ, তারপর দ্বিতীয়ত, মনস্তত্ত্ব যখন তা প্রথমে 'বাড়াবাড়ি' তারপর অনানিজম এবং পরে হতাশা এবং তারও পরে 'প্রজননের বিরুদ্ধে প্রতারণার' দিকে দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে মানসিক অসুস্থতার মূল কারণ আবিষ্কারের প্রয়াসে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু বিশেষ করে

যখন তা গোটা যৌনবিকারকে, দীর্ঘদিন ধরে যা 'জঘন্য' অপরাধ এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে ৬অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, অপরাধের বিচারসহ আওতার ভেতর নিয়ে এল; কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষ নাগাদ যা সূক্ষ্ম অপরাধ, ছোটখাট ঘটনা, তুচ্ছ বিকৃতি, এবং সবশেষে শতকের শেষ দিকে গজিয়ে ওঠা সমস্ত সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে আওতা বাড়িয়েছে, যা দম্পতি, অভিভাবক ও সন্তান, বিপজ্জনক ও বিপদাপন্ন কিশোরের যৌনতাকে আড়াল করেছে। সর্বত্র বিপদ দেখেছে। রোগ নির্ণয়ের আহবান জানিয়েছে। প্রতিবেদনের স্তূপ জমা করেছে। চিকিৎসা সংগঠিত করেছে। এইসব সাইট যৌনতাকে লক্ষ্য করে ডিসকোর্সের বিস্তার ঘটিয়েছে। একটা স্থায়ী বিপদে পরিণত করে জনগণের সতর্কতার মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে। এবং শেষ পর্যন্ত তা এ সম্পর্কে আরও কথা বলার ভিত্তি গড়ে তুলেছে।

১৮৬৭ সালের একদিন, এখানে সেখানে কাজ করে সামান্য আয়ে দিন এনে দিন খেয়ে দিনাতিপাতকারী, রাতে গোলাঘর বা আস্তাবলে ঘুমানো শাদামাটা মনের ল্যাপকোর্ট গ্রামের এক রাখালকে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হল। ক্ষেতের প্রান্তে একটা ছোট মেয়ের সোহাগ উপভোগ করেছিল সে। এমনটা আগেও করেছে সে। চারপাশের গ্রামের অন্যান্য ভবঘুরে ছেলেদের এমনটা করতে দেখেছে। কারণ ওরা বনের কিনারে বা সেইন্ট নিকোলাসমুখি রাস্তার পাশের খাদে পরিচিত "কার্ডলড মিল্ক" খেলা খেলেছে। সুতরাং মেয়েটির স্বীকারোক্তির বাধ্যবাধকতার কারণে ছেলেটিকে শনাক্ত করা হল (যৌনতা-সংক্রান্ত তাত্ত্বিক ডিসকোর্স ও তার প্রথম পুরুষের বর্ণনার সমরূপ), এবং তা ভাঙা না হলেও অন্তত শিথিল ও বহুমুখি হয়ে গেছে: যৌক্তিক ডিসকোর্সে যৌনতার উদ্দেশ্যমুখিকরণ এবং কেউ নিজের যৌন কর্মকাণ্ড বর্ণনা করতে গিয়ে যেসব ভঙ্গির আশ্রয় নিয়ে থাকে তার মাঝে ভাগ হয়ে গেছে। অষ্টাদশ শতক থেকেই পুনর্কথনের বেলায় এক ব্যাপক টানাপোড়েন, বিরোধ এবং সমন্বয়ের সামগ্রিক প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। সুতরাং আমাদের কেবল এই ডিসকার্সিভ বৃদ্ধির ধারাবাহিক প্রসারের আলোকে কথা বললেই চলবে না; একে বরং কেন্দ্রসমূহের বিচ্যুতি হিসাবে দেখতে হবে যেখান থেকে ডিসকোর্সসমূহ বিস্তার লাভ করেছে। যৌনতাকে আড়াল করার সর্বজনীন উদ্বেগ, ভাষার একটা সাধারণ রাখঢাকের বদলে শেষের এই তিন শতাব্দীকে আলাদা করেছে: এ বিষয়ে কথা বলা, কথা বলানো, প্রকাশ করাতে, শুনতে, রেকর্ড করতে এবং এ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাকে প্রচার করার লক্ষ্যে আবিস্কৃত নানা রকম উপায়ের বৈচিত্র্য যৌনতাকে ঘিরে এক সম্পূর্ণ বৈচিত্র্যময়, নির্দিষ্ট এবং নিপীড়নমূলক ডিসকোর্সের নেটওঅর্ক। যুক্তির কালে আরোপিত ভাষাগত স্বত্ব দিয়ে সূচিত ব্যাপক সেন্সরশিপের বদলে নিয়ন্ত্রিত ও বহুউপমাসমৃদ্ধ ডিসকোর্সের সূচনা ঘটেছিল।

সন্দেহ নেই এই কথা বলে আপত্তি তোলা হতে পারে যে যৌনতা সম্পর্কে কথা বলার জন্যে এতসব বিঘ্ন আরোপকারী মেকানিজমের প্রয়োজন হলে তার জন্যে নিশ্চয়ই প্রত্যেকের উপর নির্দিষ্ট ধরনের মৌলিক বিধিনিষেধ ক্রিয়াশীল ছিল। স্রেফ নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা–অর্থনৈতিক চাপ, রাজনৈতিক চাহিদা–এইসব বিধিনিষেধ তুলে দিয়ে

যৌনতা নিয়ে আলোচনা করার কিছু পথ খুলে দিতে পেরেছিল। তবে এগুলো ছিল সীমিত এবং সযত্নে সংকেতবদ্ধ করা। যৌনতাকে নিয়ে এত আলোচনা, এ নিয়ে কথা বলার লক্ষ্যে উদ্ভাবিত এতসব উপায়–সবই ছিল কঠোর শর্তের অধীন। এতে কি প্রমাণিত হয় না যে এটা গোপনীয়তার একটা বিষয় ছিল? আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এখনও কি ঠিক সেভাবেই একে রাখার প্রয়াস পাওয়া হচ্ছে না? যৌনতা ডিসকোর্সের বাইরে বলে যে প্রায়শ উচ্চারিত থিম, কেবল একটা বাধা দূর করে গোপনীয়তাকে ভঙ্গ করাই এ লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার উপায় বলে যে বিশ্বাস, তাকেই আসলে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ডিসকোর্সকে জাগিয়ে তোলার বিধিনিষেধে কি এর অংশগ্রহণ নেই? জনগণকে যৌনতা সম্পর্কে কথা বলায় উৎসাহিত করার জন্যেই কি একে জাগিয়ে তোলা হয়নি, যেকোনও ডিসকোর্সের শেষ সীমায় অর্থ উদ্ধার করা প্রয়োজন এমন গোপনীয়তার কাছাকাছি একটা কিছু, যা প্রায় নীরবতায় পর্যবসিত হয় অবার একই সময়ে যা কঠিন এবং প্রয়োজনীয় প্রকাশ করা বিপজ্জনক হয় না? আমাদের অবশ্যই ভুলে গেলে চলবে না যে, যৌনতাকে প্রকাশ করার সব কিছুর উপরে স্বীকারোক্তির বিষয়ে পরিণত করে ক্রিশ্চান প্যাস্টরাল সব সময়ই একে এক অস্বস্তিকর বিভ্রান্তিতে পরিণত করেছে। নিজেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তুলে ধরা কোনও বিষয় নয়, বরং নিজেকে যা সবসময় লুকিয়ে রাখে, এক বিভ্রান্তিকর কণ্ঠস্বর এমন চাপা কণ্ঠে কথা বলে এবং প্রায়শই আত্মগোপন করে থাকে যে কেউ তা না-শোনার ঝুঁকি নিয়ে থাকে। সন্দেহাতীতভাবে যৌনতা সম্পর্কে কথা বলার সমস্ত প্রণোদনার ভিত্তির প্রেক্ষিতে গোপনীয়তার অবস্থান নয়– তারা গোপনকে প্রকাশের জন্যে জোর করুক বা এ সম্পর্কে কথা বলার ভঙ্গিতে একে চাপিয়ে দিক। এটা এইসব প্রণোদনার ধারণার চেয়ে বরং একটা প্রশ্ন: বিষয় সম্পর্কে কথা বলার প্রয়োজনীয়তাকে রূপ দেয়ার একটা উপায়, একটা উপকথা যা যৌনতার ডিসকোর্সের অর্থনীতির সীমাহীন বৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য। এগুলো যে যৌনতাকে এক ধরনের ছায়াময় বিষয় হিসাবে দেখে সেটা আধুনিক সমাজগুলোর বেলা বিচিত্র নয় বরং তারা এ সম্পর্কে কথা বলার জন্যে সীমাহীনভাবে নিজেদের চালিত করেছে, আবার একই সঙ্গে একে গোপন বিষয় হিসাবে ব্যবহার করেছে।

[বি.দ্র. 'হালখাতা'র সম্পাদক ও 'অবদমনের ধারণা'র অনুবাদকের নাম হুবহু এক কিন্তু এরা আলাদা ব্যক্তি।]

বাংলা সাহিত্যে অবদমন

হা সা ন অ রি ন্দ ম

ফ্রয়েড মানুষের জীবনে যৌনতার যে ব্যাখ্যা দেন পরবর্তী পর্যায়ে অনেকেই তা থেকে অনেকটা ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। ফ্রয়েড মানুষকে যৌনজীব হিসেবে প্রত্যক্ষ করেন। এই কামচেতনাকে তিনি বলেন *লিবিডো*। অপরপক্ষে ইয়ুং মনে করেন লিবিডোর পরিসর আরও ব্যাপক। যৌন-বাসনা ছাড়াও মানুষের আরও বহু কর্মের পিছনে লিবিডো মুখ্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। কেবল যৌনচেতনা কেন মানুষের মনে কত রকম স্বপ্ন-বাসনা-তাড়নাই তো জাগ্রত হয়। সে সকল তাড়নার অনেক কিছুর সঙ্গেই মানুষকে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করতে হয়।

সে দিক থেকে সাহিত্যের মুখ্য উপাদান যে মানুষ সে কথা বলাই বাহুল্য। মানুষ সাহিত্যে উপস্থিত হয় তার শরীর-মন-সমাজ-পরিবেশ সবকিছু নিয়ে। অন্য অনেক শিল্প মাধ্যমের চেয়ে সাহিত্যে মানব-মনের বিচিত্র অনুভব, আকাঙ্ক্ষা, বিকৃতি, প্রেষণা প্রভৃতি চিত্রণের সুযোগ অধিক বিস্তৃত। আধুনিক বহু সাহিত্যেই বাহ্যিক ঘটনা-বৈচিত্র্যের চেয়ে মানব-মনই লেখকের নিরীক্ষণের অবিকল্প কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। কালচক্রে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার বিকাশের সাথে সাথে আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক এবং মানুষের চিন্তা-বলয়ের বর্ণময়তা ও জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পসাহিত্যের ফর্ম ও কনটেন্ট উভয় ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়েছে গভীরভাবে। যা-কিছুর স্বপ্ন-কামনা-আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জাগ্রত হয় তার অনেক কিছুরই বাস্তবায়ন বা তার প্রচেষ্টা সমাজ স্বীকৃতি দেয় না। এ-সব সমাজের চোখে বিচ্যুতি কিংবা অপরাধ বলে গণ্য হয়। *অবদমন* শব্দটি মুখ্যত মানবমনের সাথেই সম্পৃক্ত। মনের কোনো বাসনা-এষণাকে সামাজিক-পারিপার্শ্বিক কারণে চেপে রাখাই সাধারণ অর্থে অবদমন। অবদমনের ইংরেজি প্রতিশব্দ রূপে repression-ই অধিক গ্রহণযোগ্য। Oxford Advanced Learner's Dictionary অনুসারে repression হল `the act of controlling strong emotions and desires and not allowing them to be expressed so that they no longer seem to be exists'.

সিগমুন্ড ফ্রয়েড বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, সভ্যতার আবির্ভাব হয়েছে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের তীব্র চাপের মধ্য থেকে আদিম প্রবৃত্তিগুলোর তৃপ্তিসাধন বিসর্জন

দিয়ে এবং এই জিনিশ ব্যাপকভাবে ব্যক্তির জীবনেও পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়েছে যখন সে সমাজে অংশগ্রহণ করে ও তার প্রবৃত্তিগত সুখ বিসর্জন দেয়সমষ্টিগত মঙ্গলের স্বার্থে।[১] "আজ পর্যন্ত মানবেতিহাসকে শাসন করেছে যা, তা হল শ্রমের প্রয়োজনীয়তা। ফ্রয়েডের কাছে এর অর্থ হল, শ্রম করতে গিয়ে মানুষ আনন্দ এবং তৃপ্তির বেশকিছু প্রবণতাকে চেপে রাখতে বাধ্য হয়েছে। বেঁচে থাকার জন্য যদি আমাদের কাজ না করতে হত, আমরা সারাদিন শুয়ে-বসে আয়েস করতে পারতাম। প্রতিটি ব্যক্তিকেই এই নিষ্পেষণ সহ্য করতে হয়। ফ্রয়েড একে বলেছেন 'বাস্তবধর্ম' দ্বারা 'আনন্দধর্ম'–এর অবদমন। আমাদের কারো-কারো জন্য, এমনকি সমগ্র সমাজের জন্য, এধরনের অবদমন হতে পারে মাত্রাতিরিক্ত এবং ফলত আমরা হয়ে পড়তে পারি অসুস্থ।"[২] তাই বহু আকাঙ্ক্ষার পায়ে সভ্য মানুষকে শেকল পরাতেই হয়। মানুষ যেমন যা-কিছু ভাবে তার সবটুকু বাস্তবায়ন করতে পারে না বা করার অনুমতি পায় না। তেমনি একজন লেখককেও চিন্তাগুলোকে ভাষারূপ দিতে অনেক কিছু সেন্সর করতে হয়। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব মতে শিল্পীর সৃজনকর্মের মূল বীজটি তার ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার গভীরে লুকিয়ে থাকে। তিনি মানবচিন্তা ও প্রবৃত্তিগুলোকে লোকসমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সহনীয় করে উপস্থাপন করেন। অবশ্য কবিসাহিত্যিকগণ সৃষ্টির সেই মৌল প্রেরণার ওপর নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী নানান আকৃতি দান করেন আর বর্ণের বিচিত্র স্পর্শ বুলিয়ে দেন তাতে।

দুই

মধ্যযুগ পর্যন্ত সাহিত্য বলতে কাব্যকেই বোঝাত, সে-সময়কার আখ্যানগুলোতে ব্যক্তিমানুষের চেয়ে কাহিনীই ছিল প্রধান বিষয়। কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে নীতিকথা, দেবমাহাত্ম্য, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য থাকত। সে যুগে সাধারণ বাঙালির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ জেগে ওঠেনি। কিন্তু মানুষের প্রবৃত্তি তো আদিম, অবদমন হয়তো তার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে। তাই মধ্যযুগের সাহিত্যেও শরীর-মনের তাড়না ও তার নিয়ন্ত্রণের চিত্র দেখা যায়। বড়ু চণ্ডীদাস *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে অসংস্কৃত সমাজের এক নবযুবকের আদিম প্রবৃত্তিকে তুলে ধরেছেন বিশেষ পরিমার্জন ছাড়াই। মধ্যযুগেও আর কোনো বাংলা কাব্যে শরীরী তাড়নার এমন অকপট চিত্রণ দেখা যায়নি। কাব্যের তাম্বুল খণ্ডে রাধার শরীরের বর্ণনা শুনে শ্রীকৃষ্ণ তীব্র আকর্ষণ বোধ করে:

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী ॥ বড়ায়ি ল ॥

আর সেই তাড়নার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এভাবে:

দৃঢ় ভুজযুগে ধরি কৈল আলিঙ্গনে ।
রাধার বদনে কাহ্নাঞিঁ কইল চুম্বনে॥
কুচ কনককমলকোরক আকার ।
ঘন ঘন মরদিল কাহ্নাঞিঁ রাধার॥

কেবল বড়ুচণ্ডীদাসের কাব্য নয়– সেকালে প্রেম ও শরীরী বাসনার মধ্যে লক্ষযোগ্য বিশেষ তারতম্য করা হয়নি। কৃষ্ণ যে রাধার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং পরিণতিতে শরীর ভোগ করেছে তাতে প্রেম নয় কামই ছিল প্রধান। অপর পক্ষে রাধা প্রথম দিকে সমাজ-সংসার-নীতিবোধ প্রভৃতি কারণে নিজের ভেতরকার ঈপ্সাকে দমিয়ে রাখে। বিভিন্ন যুক্তিতে সে কৃষ্ণের দুরভিসন্ধিকে প্রতিহত করতে চেয়েছে–

তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞিঁ আহ্মেত মাউলানী

কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যে নববধূ থেকে বহু দূরে রামগিরিতে থাকতে বাধ্য হয়ে যক্ষ স্বাভাবিক বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, তার শরীরও ভেঙে পড়ে । দেহমনে দেখা দেয় ক্লান্তি ও অবসাদ ।

যখন আটমাস কাটলো সে-পাহাড়ে কান্তা বিরহিত কামুকের,
সোনার কঙ্কন স্খলিত হ'য়ে তার শূন্য হল মণিবন্ধ ।
দেখলো মেঘোদয় ধূমল গিরিতটে একদা আষাঢ়ের প্রথম দিনে–
বপ্রকেলি করে শোভন গজরাজ আনত পর্বতগাত্রে (পূর্বমেঘ-২)[৩]

দীর্ঘ অবদমন তাকে অনেকটা উদভ্রান্ত করে ফেলে। তাই মেঘের মতো জড় বস্তুকে সে দূত করে পাঠাতে চায় তার প্রিয়ার কাছে–

কামের উদ্রেক যে করে, সেই মেঘে সহসা দেখে তার সমুখে
যক্ষ কোনমতে চোখের জল চেপে ভাবলে মনে মনে বহুখন:
নবীন মেঘ দেখে মিলিত সখীজন তারাও হ'য়ে যায় অন্যমনা,
কী আর কথা তবে, যদি সে দূরে থাকে সে চায় কণ্ঠের আলিঙ্গন। (পূর্বমেঘ-৩)[৪]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলোতে প্রায়ই নীতিবাদী শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি স্পষ্টতই সমাজের পরিশুদ্ধি ও ব্যক্তির বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে কামনা-বাসনা'র লাগামকে দৃঢ় শাসনে রাখার পক্ষপাতী। *বিষবৃক্ষ* ও *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসে লেখকের এই মনোভাব স্পষ্ট। সমাজ-অস্বীকৃত প্রণয়াকর্ষণ বিষয়ে *বিষবৃক্ষে* ঔপন্যাসিকের অভিমত, 'চিত্ত-সংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের

বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী, একবার ইহার পুষ্টি হইলে আর নাশ নাই।' উপন্যাসের সমাপ্তিতে বঙ্কিমের সেই নীতিবাদী মানসিকতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে: 'আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।'

রবীন্দ্রনাথ বর্ণময় অন্তরীক্ষে মানবচিত্তের পক্ষবিস্তারের চিত্র এঁকেছেন বহুস্থানে বিচিত্ররূপে। *সুরদাসের প্রার্থনা* কবিতায় দেবীর অবয়বের প্রতি অযাচিতভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন কবি সুরদাস–

জান কি আমি পাপ-আঁখি মেলে তোমারে দেখেছি চেয়ে?
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা ওই মুখপানে ধেয়ে।

কিন্তু দেবী তো কেবল আরাধনার পাত্রী, তাকে কামনার চোখে দেখা অক্ষমণীয় পাপ। বিষয়টি বুঝতে পেরে সুরদাস নিজেই দেবীর কাছে শাস্তি চেয়েছেন–

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম–
লও, বিঁধে দাও বাসনাসঘন এ কালো নয়ন মম।

নিষ্ফল কামনা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মানুষের কামনা ও তা নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত দিয়েছেন। *নিষ্ফল কামনায়* কবির চেতনা হল বৃহত্তর প্রাপ্তির স্বার্থে উপভোগ-বাসনাকে নিবৃত্ত করা আবশ্যক। কারণ কামনা-বাসনা উচ্চতর উপলব্ধিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। বাসনার ছুরি দিয়ে সেসব বৃহত্তর-উন্নত চেতনাকে বিনষ্ট করা সৃষ্টিশীল মানুষের কাজ নয়–

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি যতনে, অতি সঙ্গোপনে
সুখে দুখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে, জীবনে মরণে
শত ঋতু আবর্তনে
বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি–
সুতীক্ষ্ণ বাসনা ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্য বিকাশ,

নষ্টনীড় গল্পে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন সমাজ-অননুজ্ঞাত হৃদয়বৃত্তিক আকর্ষণকে দমন করতে দুই নরনারী নিজেদের অন্তরে কতখানি দুর্বহ বিক্ষোভ-ঝঞ্ঝা সহ্য করেছে।

বৌদি চারুলতার দীর্ঘ অবসরের সঙ্গী হয়ে ওঠে পিসতুত দেবর অমল । অমল একজন লেখক, তার রয়েছে জীবনকে দেখার নিজস্ব ধরন– লেখায়-বলায় নিজেকে প্রকাশের শৈল্পিক ভঙ্গিমা। অসামঞ্জস্যপূর্ণ অধিক বয়সের স্বামী ভূপতি সবসময় ব্যস্ত তার সম্পাদিত-প্রকাশিত পত্রিকা নিয়ে । চারুলতার মনের খবর রাখার ফুরসৎ তার নেই। অমলের আশ্রয়েই চারুর স্বপ্ন-কল্পনা-নন্দনবৃত্তির ব্রততী বেড়ে উঠতে চায়। সচেতন চিত্তে বুঝে ওঠার আগেই অমলের এক দুর্নিবার আকর্ষণ চারুলতাকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে। অমল অপেক্ষাকৃত স্থিত-সংযমী-দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তাই চারুলতার চিত্তদৌর্বল্য নিশ্চিত হওয়ামাত্র সে নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে নেয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম প্রায়ই শিল্পের চূড়া-স্পর্শ-স্পর্ধী হতে পেরেছে, তার মুখ্য কারণ : প্রকৃতির মতো নির্মোহ চোখে জীবনকে দেখার ধরন, চরিত্র নির্মাণের নিরাসক্ত পদ্ধতি। তাঁর রচনায় মানুষেরা স্বাভাবিক কাম-ক্রোধ-লোভ-প্রতিহিংসা-জিঘাংসা নিয়ে উপস্থিত হয়। না বললেই নয় *প্রাগৈতিহাসিক* গল্পের ভিখুর কথা। ভিখু কোনো প্রবৃত্তিরই অবদমন করতে শেখেনি। মনের কোনো বাসনাকেই চেপে ধরে সে অবচেতনে পাঠাতে চায় না, সকল তাড়নাকে বাস্তবায়িত করতে পারলেই তার সুখ। মানিক এই গল্পে সচেতনভাবেই দেখিয়েছেন অবদমনে ব্যর্থ বা অনিচ্ছুক হলে মানুষ কতখানি বেপরোয়া আর আদিম হয়ে ওঠে। *পুতুলনাচের ইতিকথার* নায়ক শশী প্রণয়মুগ্ধ কুসুমের হাতছানিতে সাড়া দিতে পারে নি সমাজ ও নীতিবোধের চোখ-রাঙানির ভয়ে। শশী জীবনের অমার্জিত বাসনার আবর্জনা উপড়ে ফেলে চেতনার জমিনে রুচিবোধ ও সৌন্দর্যের যে গোলাপের ডাল রোপণ করে তাকে বঞ্চনা-কাতর কুসুম তীব্র রোষে পায়ে দলে যায়। এক সময় কুসুম ছিল ডাক্তার শশীর জন্য উন্মুখ– শরীর-মনে ছিল বানের জলের মতো অবাধ্য টান। দীর্ঘ অবহেলায় গরম লোহার মতো তাতানো কুসুম এক সময় শীতল হয়ে যায়। ততদিনে সে নিজের আবেগ-বাসনাকে বেঁধে ফেলে। তাই কুসুম এতখানি কঠিন হয়ে উঠতে পারে: 'কতবার নিজে এসেছি, আজকে ডেকে এনে হাত ধরা কি উচিত ছোটবাবু? রেগেটেগে উঠতে পারি তো আমি। বড় বেয়াড়া রাগ আমার।' মানুষের কোনো প্রকার মোহই বোধহয় চিরকাল সমান তীব্র থাকে না । তাই কুসুমের এই পরিবর্তন অস্বাভাবিক নয়: "কাকে ডেকেছেন ছোটবাবু? কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম– সে বেঁচে আছে? 'সে মরে গেছে।' তখন শশীর জন্য কেবল অবশিষ্ট ছিল বিস্ময়-ভরা ঘোলাটে বেদনা।"

তিন

"কবিতা যখন দায়বদ্ধতা গ্রহণ করতে যায়, তখন পাশাপাশি আরেক ধরনের কৃতকর্মও অনুলিপিত হতে থাকে; মনোজগতের বিভিন্ন স্তর নিয়ে প্রকাশিত হতে থাকে অন্য অস্তিত্বের ভিন্নতা। কবিতায় যে কুৎসিত বোধের প্রভাব, সম্ভবত তার কারণ ফ্রয়েডিয় তত্ত্বকথা। ফ্রয়েডের চিন্তার অনুপ্রবেশের ফলে বিশ্ব কবিতায় বিশেষ ধরনের অবক্ষয়ী বাসনার অস্তিত্ব বেশি করে প্রতিভাত হতে থাকে। যার পথ ধরে বাংলা কবিতায় বিশেষভাবে সৃষ্টি হতে থাকে মনের তথাকথিত উন্মোচন প্রয়াস। চেতনাকে অতিক্রম

করে অবচেতনা পরে অতিচেতনা, বাস্তবকে অতিক্রম করে অধিবাস্তব পরে পরাবাস্তব ইত্যাকার শব্দাবলি যেন অনুঘটকের মতো নিহিত হতে থাকে। পশ্চিমা দেশগুলো থেকে খুব দ্রুততালে বাংলা সাহিত্যের পরম্পরার ক্ষেত্রে রীতিমত আরোপিতভাবে ডাডাইজম, ফবিজম, এক্সপেসনিজম, ফিউচারিজম, সিম্বলিজম, কিউবিজম ইত্যাকার আন্দোলনও কৃত্রিমভাবে এসে যায়। এবং আধুনিকতার নামে জীবনের কদর্য দিকগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি শুরু হয়ে যায়।" [৫]

"জীবনানন্দ দাশের কবিতায় মানবচিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের বহুবিধ স্বপ্ন-বাসনার চিত্র রয়েছে, জীবনের কাছ থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি স্বপ্নময়তার মধ্য দিয়ে কামনার রূপায়ণ দেখেছেন। তবে তিনি বর্ণনায় সতর্ক সংযম বজায় রেখেছেন। ব্রাহ্ম পরিবারের ভদ্র ও সভ্য জীবনাদর্শের শালীন রীতি-নীতির মধ্যে কবির ইন্দ্রিয়জ উপভোগের স্পৃহা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল বলে মনে হয়। ফলে অবদমিত কামনা-বাসনাগুলো বাঁকা পথ নিয়েছে।" [৬]

প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীতে মানুষ যেদিন এসেছে, যখনই তার কামনা-বাসনার সৃষ্টি হয়েছে– তখন থেকে অবদমনও শুরু হয়েছে । তাই কোনো একটি তত্ত্ব দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করা যথেষ্ট হয় না। সাহিত্যে মানুষের বিচিত্রধর্মী আশা-আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি বহুবিধ অবদমনের চিত্রও দেখা যায়। যুগের বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ নিজের অভিলাষ-প্রেষণাকে বাস্তব রূপ দিতে অনেক বেশি কৌশলী-যত্নশীল মনোযোগী এবং অনেক ক্ষেত্রেই বেপরোয়া হয়ে উঠছে। আর সাহিত্যেও এসব কামনা-তাড়না এবং অবদমন রূপায়ণে লেখকগণ আগের তুলনায় অনেক বেশি বাস্তবমুখী, অকপট এবং সাহসী ।

পাদটীকা

১. সিগমুণ্ড ফ্রয়েড: *মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা:স্বপ্ন* (ভাষান্তর: অরূপরতন বসু),দীপায়ন, কলকাতা; ১৯৯৯ পৃ.ভূমিকা চ ।

২. টেরি ঈগলটন: *সাহিত্যতত্ত্ব* (অনুবাদ: খোন্দকার আশরাফ হোসেন) নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা; প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৪ পৃ. ১৫৬ ।

৩. বুদ্ধদেব বসু: *কালিদাসের মেঘদূত* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ; এপ্রিল ২০০৬ পৃ. ৭১ ।

৪. পূর্বোক্ত ।

৫. খোকন বসু: *কবিতার উপপাদ্য* প্রতিভাস কলকাতা, কলকাতা বইমেলা ২০০৭ পৃ. ৬৭–৬৮ ।

৬. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়: *আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা* প্রকাশ ভবন, কলকাতা; চতুর্থ সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৯ পৃ.২০২ ।

নারী অবদমন প্রসঙ্গ

সা লে হা চৌ ধু রী

ইট চাপা-দেওয়া ঘাসের বিকাশ অবদমনের প্রকৃত দৃশ্য। নারীদের দেয়ালের ভেতরে, গণ্ডির ভেতরে, পা বেঁধে, শরীর ঢেকে, চোখে ঠুলি পরিয়ে, ধর্ম ও সমাজের ভয় দেখিয়ে কেমন করে বিকশিত হয়ে উঠবার পথ রুদ্ধ করা হয়েছিল সেটা ইটচাপা ঘাসের মতোই। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালে ১১৬৭-৬৮ সালে কেউ ভাবেনি একদিন নারী নামের দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ এখানে পড়াশুনা করতে আসবে। প্রায় সাতশো বছর পর মেয়েদের জন্য নির্মিত হয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় নারীর জন্য পাঁচটি কলেজ। ১৮৭৮ সাল থেকে মেয়েরা এখানে পড়াশুনা করবার সুযোগ পেলেও তারা কোর্স বা পড়াশুনা শেষ করে নামের শেষে ডিগ্রি লাগানোর সুযোগ পায়নি। এরপর দীর্ঘ আন্দোলন। ভোটাধিকার আন্দোলনের মতো। আন্দোলন সফল হয়। বলা হয়, ঠিক আছে মেয়েরাও নামের শেষে ডিগ্রি বসাতে পারবে। ক্যাম নদীর উপর ব্রিজ বানানো থেকে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম সেই ক্যামব্রিজ একটু বেশি রক্ষণশীল। নারীদের এই দাবি অক্সফোর্ড মেনে নিলেও ক্যামব্রিজ মেনে নিতে সময় নিয়েছে। যার জন্ম ১২০০ সালে সেই বিশ্ববিদ্যালয় নারীদের ডিগ্রিধারী হতে বা নামের শেষে ডিগ্রি সংযুক্ত করতে ১৯৪৮ পর্যন্ত সময় নিয়েছিলেন। পড়তে চাও পড়ো কিন্তু ডিগ্রিধারী হতে পারবে না। কারণ কী? ডিগ্রিধারী হলে তারা কি সব পুরুষ হয়ে যাবে? না তারা পুরুষদের সমকক্ষ হয়ে আর সন্তান প্রসব করতে চাইবে না? কারণ যাই হোক এই হল নারীর পড়াশুনার এক ধরনের ইতিহাস। পাক-ভারত উপমহাদেশে এসব ঘটনা নতুন নয়। আরব দেশের পুরুষ হেরেমে নারীদের ভরে রাখেন, যারা সর-চন্দন মেখে পুরুষের মনতোষণের জন্য অপেক্ষা করেন এবং কোনোমতেই তারা যেন পুরুষের মতো পুরুষালী ব্যবহার না করেন সেদিকে কঠোর কঠিন দৃষ্টি রাখা হয়।

এখনো পড়াশুনায় শানিত বা ব্যক্তিত্ব-জাগরিত কোনো নারীকে কেউ পছন্দ করে না। বলে এরা পাকা বাঁশ। এদের ঠিক করা সম্ভব নয়। মানে নারীকে হতে হবে একতাল বেলে মাটি, না হলে থরথর কম্পমান বাঁশের কঞ্চি। বাঁশ হলেই ভাগ্য গেল। নারীও কিন্তু পুরুষদের এই ব্যাপারে কখনো সাহায্য করেন, অবচেতন ভাবে। অবশ্য কেউ কেউ, সকলে নয়। যেমন কেউ কেউ সেজেগুজে বিজ্ঞাপনের সামগ্রী হয়ে ওঠেন।

আসলে ব্যক্তিত্বই নারীর সৌন্দর্য। সে বোন, মা ও জননী হতে পারে। সে নয়মাস সন্তান ধারণ করে পৃথিবীতে আনতে পারে। কাজ থেকে এসে রান্না করতে পারে। এমন কঠিন কাজ করতে পারার নারীকে কেউ কেউ বলেন– উইকার সেক্স। একজন বলেছিল– উইকার সেক্স মাই ফুট। যেন এমন শিশু যিনি এক গ্লাস পানি ঢেলেও খেতে পারেন না, আর এই সব শিশুদের কেউ কেউ আঁচলে ঢেকে রাখেন। যেমন শরৎচন্দ্রের বেশির ভাগ নায়িকা। মন্তব্যটি ভাবার মতো।

নারী অবদমনের বড় গল্প চীন দেশে। যেখানে হাজার হাজার বছর ধরে নারীর পা দুটো এমন শক্ত করে বেঁধে রাখা হতো যারা সেই বাঁধা-পা নিয়ে বাড়ির উঠোনও পার হতে পারতেন না। এক হাজার বছরেরও বেশিদিন ধরে প্রায় এক বিলিয়ন নারী এই কাজ করেছেন। যদি সে পা বেঁধে না রাখে তার ভালো বিয়ে হবে না, তার ভাগ্য হবে মুটে-মজুরের মতো। সেটা অবশ্য কেউ চায়নি। তবে এদের মধ্যে কেউ যে কেন বলেননি আমি মুটে-মজুর হতে চাই কিন্তু পা বেঁধে রাখব না সেটাও ভাবতে হয়। কেউ কেউ বলেন এটা শুরু হয়েছিল যিশুখ্রীস্টের জন্মের আগে থেকে। আবার কেউ কেউ বলেন ৯৬০ সালে ইউ লি নামের এক নারী, সম্রাটের অগণিত কংকাবাইনের একজনের পা নাকি ছিল ছোট, ফুলের মতো। পরে সেই পা দুটোকে সৌন্দর্যের মাপকাঠি করে সমস্ত মেয়েদের পা বেঁধে রাখার রীতি প্রচলিত হয়। ১২৭৩ সালে মোংগল যখন চীন দখল করে তারা এই নিয়মে অত্যন্ত খুশি হয়। কারণ চীনের কোনো মেয়েই তাদের ছোট পা নিয়ে মোংগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইবে না।

কতবছর বয়স থেকে এই পা-বাঁধা শুরু হয়? চার পাঁচ ও ছয় বছর বয়স থেকে। যখন পায়ের হাড় কোমল এবং কঞ্চির মতো নরম তখনই শুরু হয় এই পা বাঁধা পর্ব। প্রথমে পা দুটোকে গরম পানিতে ধুয়ে, বেশ করে ম্যাসাজ করা হয়। তারপর সেখানে কোনো বিশেষ সুগন্ধি মাখানো হয়। পবিত্র প্রাণীর রক্ত এবং ভেষজ পাতা দিয়ে পা দুটোকে যত্ন করা হয়। এরপর পায়ের নখ যতটা সম্ভব ছোট করে কাটা হয়। এগুলো কখনো যেন বড় হতে না পারে। এরপর মা বা নানি দাদি সেই শিশুকে যত্ন করে কোলে বসিয়ে পুট পুট করে তার পায়ের আটটি কোমল আঙুলের হাড় ভেঙে দেয়। এরপর ভাঙা পায়ে পরাবেন শক্ত ব্যান্ডেজ। সেই ব্যান্ডেজ পবিত্র রক্ত ও ভেষজ পাতার আরকে মেশানো। দু বছর পর সেই ব্যান্ডেজ খোলো এবং আরো শক্ত করে বাঁধো। ক্রমাগত যন্ত্রণার ভেতর সে চলাফেরা করবে। যে নখ কখনো বড় হবে না বলে কেটে ফেলা হয়েছে তা বড় হয়ে তার পায়ের পেছনে গিয়ে বড় বড় ক্ষত সৃষ্টি করবে। পায়ের মাংস পচতে পচতে, দুর্গন্ধে ভরে যাবে। একসময় পা দুটো ছোট হয়ে এক অসার বস্তু হয়ে উঠবে। দীর্ঘ কয়েক বছর যন্ত্রণাকাতর মেয়ে নিজের পচা পায়ের গন্ধ শুঁকে জীবন কাটাবে। মাঝে মাঝে কেবল ব্যান্ডেজ খুলে শক্ত করে ব্যান্ডেজ বাঁধা হবে। এই ঘটনায় কেউ কেউ সেপটিক হয়ে মারা যাবে। কিন্তু তাতে কী? বড়লোক বা সম্ভ্রান্ত মানুষের সঙ্গে যদি তার বিয়ে না হয় তার মেয়ে হয়ে জন্মানোর সার্থকতা কোথায়? সেই সময় ছেলের মা মেয়ে দেখতে এসে দাঁত, চোখ, নাক, কান দেখার আগে কাপড় তুলে

দেখবে মেয়ের পা বাঁধা আছে কিনা। যদি না থাকে পত্রপাঠ বিদায়। ফলে এসব মেয়েদের বিয়ে হওয়া একটা অসাধ্য ব্যাপার হবে।

১৬০০ সালে মাংচু ডাইনাস্টির (DYNASTY)-র সময়ে চেষ্টা করা হয়েছিল মেয়েদের পা-বাঁধা রীতি বন্ধ করে ফেলতে। তারা সক্ষম হননি। এরপর চীনের রানী জু সি স্বজাতির প্রতি দয়া অনুভব করে মেয়েদের পা-বাঁধা রীতি চিরতরে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য তিনিও সক্ষম হননি। এই রানীর সময়কাল ১৮৩৫ থেকে ১৯০৮। ১৯১১ সালে সান ইয়াৎ সান কঠোরভাবে এই নিয়ম বন্ধ করেন। তিন ইঞ্চি সোনার পদ্ম হয়ে উঠতে একজন নারী যে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে হয় তা নিয়ে চীনের একজন নারী একটি গ্রন্থ লেখেন। দুঃখ করে বলেছেন এত কাণ্ডের পর দেখা গেল তাঁর স্বামী একজন আফিমসেবী। যিনি জীবনে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাননি তিনি কী করে স্ত্রীর পায়ের দিকে তাকাবেন? ঝু গুইজন যখন বই লেখেন তিনি তখন বেঁচে আছেন। ওয়াং লাইফেন নামের একজন লিখেছেন, 'এখনো মনে আছে যখন আমার পায়ের আঙুল মুট মুট করে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। কী অসহ্য সে যন্ত্রণা'। মজার ব্যাপার কিং ডাইনাস্টির (DYNASTY)-র পর্নোগ্রাফিক বইতে এই বাঁধা নিয়ে কত বড় মজা করা যায় সে নিয়ে প্রায় ৪৮টি যৌনক্রীড়ার কথা আছে। বলা হয়েছে কতভাবে এই তিন ইঞ্চির পা-কে যৌনক্রীড়ার সময় আনন্দ দেওয়া যায়। পড়তে পড়তে বমি আসে। কিন্তু এই ছিল চীনের মেয়েদের জীবনের ভয়াবহ সত্য।

আজকের দিনের ইয়াসনুরি কাওয়াবাতা 'দি হাউজ অব শ্লিপং বিউটিতে' আর এক ধরনের আনন্দের কথা বলেছেন। কোনো কোনো বেশ্যালয়ে অল্পবয়স্ক নারীদের ঘুমপাড়ানি ওষুধে দীর্ঘ সময়ের জন্য ঘুম পাড়িয়ে নিশ্চিন্তে তার সঙ্গে যৌন ক্রীড়ায় মগ্ন হন পুরুষ। এর ভেতর কেউ কেউ মারা যায়। ছোট উপন্যাস শেষ হয়েছে এইভাবে। একজন পতিতালয়ের ম্যাডাম বলছেন– তাতে কী, মারা গেছে? আর একটা মেয়ে তো আছে। এই হল চীনের মেয়েদের গল্প।

আমাদের দেশের সতীদাহের কথা আমরা জানি। বাল্যবিবাহ নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন বিদ্যাসাগর। এসবও আমাদের জানা। পর্দাপ্রথার ভয়াবহতাও জানা আছে সকলের। এসব কিছুই কি নারীকে অবদমিত করে রাখবার জন্য নয়?

ব্রিটেনের রাজকবির দীর্ঘ ইতিহাসে আজ পর্যন্ত একজন নারী রাজকবি হননি। চারশো বছরের ইতিহাসে একজনও নয়। যখন এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর নাম উঠেছিল তিনি হতে পারেননি। বর্তমানের রাজকবি আন্ড্রুমোশনের সময় রাজকবি হবেন বলে প্রথমবারের মতো ওয়েন্ডিকোপের নাম বেশ জোরে উচ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি রাজকবি হতে পারেননি। বর্তমান রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাকে রাজকবি হতে বাধা দিয়েছিলেন। কেবল একজন পুরুষ নয়, একজন নারীর অবদমনের কারণ আর একজন নারীও হতে পারে। আমেরিকাতে আজ পর্যন্ত একজন মহিলা প্রেসিডেন্ট হননি। কেন? সমাজ যে এখনো পুরুষ শাসিত এইসব ঘটনা কি তা প্রমাণ বহন করে না?

ডক্টর হুমায়ুন আজাদের 'নারী' গ্রন্থে এমনি অনেক নারী অবদমনের কথা আছে। বোভেয়ারের 'সেকেন্ড সেক্স' এমনি ঘটনার কথা বলে। মধ্যপ্রাচ্যে বা আফ্রিকার

নানা দেশে নারীদের খৎনা করবার রীতি এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে। অনেক আগে পশ্চিমের কোনো দেশে স্বামী যুদ্ধে বা বাইরে যাবার সময় নারীকে চেসটিটি বেল্ট পরাতেন। যেন নারী সতী থাকে। চাবি থাকতো স্বামীদের পকেটে। বলা বাহুল্য স্বামীদের বেলায় এমন কোনো চেসটিটি বেল্টের প্রয়োজন ছিল না। ব্রিটেনে আজকের দিনেও অনেক নারীকে স্বামী কাজে যাবার সময় ঘরে তালা দিয়ে রাখেন।

দীর্ঘদিন ইউরোপে ডাইনি বলে মেয়েদের পুড়িয়ে মারা হয়। যে নারীকে বিয়ে করতে রাজা সপ্তম হেনরি চার্চ অব ইংলান্ড সৃষ্টি করেছিলেন একদিন সেই এ্যান বোলিনকে ডাইনি ঘোষণা করে জেন সেমুরকে বিয়ে করেন তিনি। ডাইনি কেন? এ্যান বোলিনের হাতে নাকি একটি বাড়তি আঙুল ছিল। তিনি আরো বলেছিলেন এ্যান বোলিনের স্তন নাকি তিনটি। এমনি নানা অভিযোগ। ইউরোপ বা ভারত যেই দেশই হোক নারীসংগ্রামের ইতিহাস দীর্ঘ। ভোটদান করবার দীর্ঘ ইতিহাস বা সংগ্রাম এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে। ইউরোপ, আমেরিকা বা ভারতের নারী ভোটাধিকার। কতই না সংগ্রাম করতে হয়েছে ভোট দেবার অধিকার নিয়ে। জেন্ডার নামের বিশ্বকোষ খুললেই এসব সংগ্রামের ইতিহাস পাওয়া যাবে। যখন নারীকে জেলে বন্দি করে, অত্যাচার করে তার এই দাবির বিপক্ষে কাজ করেছিলেন অনেকে। অনেকেই নারীকে বলেছিলেন– পেটিকোট পরা হায়েনা। এবং আরো অনেক কিছু।

বর্তমান ব্রিটেনে যা শুরু হয়েছে তার নাম অনার কিলিং। যে সব পাকিস্তানী বা মুসলিম দেশের মানুষ ব্রিটেনে বসবাস করেন তাদের মধ্যেই এমন ব্যাপার ঘটতে শুরু হয়েছে। মেয়ে বড় হয়ে যখন পশ্চিমী রীতিতে জীবনযাপন করতে চায় তখনই শুরু হয় এই অনার কিলিং নামের খুন। কেন সে অবরোধবাসিনী হয়ে থাকতে চায় না। কেন সে নিজের ইচ্ছামতো বেঁচে থাকতে চায়, স্বামী নির্বাচন করতে চায়। বাবা মেরে ফেলছে মেয়েকে, ভাইয়েরা মেরে ফেলছে বোনদের। মা পর্যন্ত এ ব্যাপারে ছেলেকে সাহায্য করে বলছে– 'ডরাও নাহি বেটা এ ইজ্জত কা সওয়াল হ্যায়'। এমন কিছু মেয়ের লাশ গুম করে ফেলা হয়েছে, যাদের আর কোনো খোঁজ জানে না কেউ। কাউকে পাওয়া যায় মাটির তলায়। কেউ নিজ বাড়িতে মারা যায়। এক পাঞ্জাবি শিখ বাবা মেয়েকে মেরে ফেলে হাওয়া হয়ে যায়। মেয়ের হাতের ভেতর ছিল বাবার দাড়ির কিছু চুল। সেটার ডিএনএ করে দেখা গেল দাড়িটা কার। অনার কিলিং ব্রিটেনের সবচাইতে বড় অপরাধ আজকের দিনে। সেখানকার পুলিশ পর্যন্ত হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে এসব সামলাতে। বাবা-মায়ের যুক্তি তারা মেয়েকে এবং তাদের নিজ পরিবারকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচাতে সাহায্য করছে।

নারী নির্যাতনের কারণ হিসাবে একজন বলেছিলেন ঈশ্বর পুরুষের বাঁকা হাড় দিয়ে নারীকে তৈরি করেছিলেন। ফলে নারী বাঁকা। তাকে সোজা রাখতে বা ঠিক পথে রাখতে তাকে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন। ভালো কথা। কিন্তু পাঁজরে তো কেবল একটা নয় অনেক হাড় থাকে।

খনা নামের একজন বিদুষী নারীকে জিভ কেটে ফেলতে হয়েছিল একদিন। শ্বশুরের চেয়ে নাকি খনা অধিক বিদ্বান হয়ে উঠছিল। আজও কি নারী পরিপূর্ণভাবে

বিকশিত হতে পারছে। তার সমস্ত সম্ভাবনা কি আজও পূর্ণতা পাওয়ার মতো সত্য হয়ে ওঠে? জানি না।

একবার নবনীতা দেবসেন তার এক ইংরেজি প্রবন্ধে বলেছিলেন যখন নারী লেখে বা সাহিত্যকর্ম করে স্বামী অবাক হয়ে বলেন– What is she upto. আর তাঁর ছেলেমেয়েরা বা সন্তান বলে– My mum is not like other mum. তারপরও নারী সাহিত্য করছে। নোবেল পাচ্ছে। এটা আশার কথা। আবার কোনো কোনো স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে গর্বও করেন। সেটাও সত্য। তাহলে কি বলব নারীসংগ্রামের দীর্ঘ টানেলে কিছু আশার আলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তবু নারীর সাহিত্য আজও কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষের সাহিত্য নয়? সেই কারণে কেউ খুব ভালো লিখলে বলা হয়– বেশ লেখেন তিনি। একেবারে পুরুষের মতো লেখেন। নারী তার সংবেদনশীলতায় ও স্পর্শকাতরতায় অনেক বেশি দেখতে পান, অনেক গভীরে যাওয়ার ক্ষমতা থাকে। নারীর এই পারসেপশন অনেক সময় পুরুষ লেখকদের থাকে না। নারীর এই বিশেষ ক্ষমতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা যায়। তাকে যে পুরুষের মতোই হয়ে উঠতে হবে, পেশল ও বলবান, তার কি খুব প্রয়োজন আছে? লেখার প্রধান কথা ম্যাচুরিটি। সেটা থাকলে এরপর তাঁর লেখা পেশল হল কিনা সে নিয়ে ভাববার তেমন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। এগারো জন নারী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এতদিনে আরো বেশি নারী কি নোবেল পেতে পারতেন না? যদি না তাকে নারী লেখক হিসাবে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হতো? নারীর ভাগ্য এসবে থেমে থাকবে এমন ভাবতে পারি না। তাকে এগোতে হবে অবদমনের দীর্ঘ রাস্তা ভেঙে। ভার্জিনিয়া উলফ-এর 'এ র‍ুম অব ওয়ান্স ওন' গ্রন্থে নারীর পথ ভাঙার কথা আছে। তিনি অবশ্যই একজন শক্তিশালী নারী লেখক। যাকে এখনো সকলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

নারীর অধিকারে অনেক আইন প্রণয়ন হয়েছে দেশে এবং বিদেশে। তবু কি নারী তার সমস্ত অধিকারে একজন পূর্ণ মানুষ? তার নামের আগে মেয়ে না বললে আমরা কি তাকে নারী হিসাবে চিনতে পারি? ইংরেজিতে বলে ওম্যান। ও মানে দুঃখকষ্ট। মনে হয় ওম্যান বলার সময় হয়তো বিবি হাওয়ার কথা মনে হয়েছিল অনেকের। আদমকে স্বর্গচ্যুত করেছিল যে নারী। কিন্তু কে স্বর্গচ্যুত করেছিল তার উত্তর কাজী নজরুল ইসলাম দিয়ে গেছেন।

শিশু ও নারীর অবদমন

বিভানুর মুন্সী

'দমন' শব্দটির মাঝে একটি অমানবিক প্রশাসনিক অসুরীয় গন্ধ পাওয়া যায়! অন্যদিকে অবদমন শব্দটিতে আছে নষ্ট এক সাংস্কৃতিক ছোঁয়া। 'দমন' কথাটি প্রয়োগে মনে হয় পরিস্থিতি বেশ জটিল এবং কুটিল। অন্যদিকে কত মানুষ সমাজে বা পৃথিবীতে অবদমনের শিকার হচ্ছে সর্বক্ষণ। তারা উপলব্ধি করে অবদমন নির্যাতনের কত-না ভয়ংকর রূপ। সমাজে দমন কর্মটি চক্ষুষ্মান, ফলে হয়তো সে কর্মটি প্রতিরোধ কিংবা প্রতিশোধ করা সম্ভব। কিন্ডু অবদমন একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। সবচেয়ে বেদনার কারণ এটা কখনো কখনো সংঘটিত হয় খুব কাছের ও নিকটের প্রিয়জনদের দ্বারা। ফলে এটি ভীষণভাবে কষ্টকর ও বেদনার। ক্ষেত্রবিশেষে অবদমন হয়তো ঘটে অনিচ্ছাকৃতভাবে তবে অবদমন-এর পক্ষ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি ঘটে ইচ্ছাকৃতভাবে। অবদমন একটি মনস্ড়াত্ত্বিক বিকারপ্রক্রিয়া ফলে এটির প্রকাশ ভয়ংকর এবং কদর্য। প্রত্যেক সমাজে প্রত্যেক দেশে অবদমন চলছে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। পৃথিবীর সর্বত্র নারী পুরুষ দ্বারা গরিব ধনী দ্বারা, ক্ষমতাবানেরা দুর্বলকে দমন ও অবদমন করছে। কেননা অবদমন একটি চলমান চক্রাকার প্রক্রিয়া। আর এর মূল চালিকাশক্তি ক্ষমতা। তা হতে পারে যেমন অর্থনৈতিক ক্ষমতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, শারীরিক ক্ষমতা, প্রভৃতি রকমের। সমাজে অতীতে অবদমন ছিল, আগামীতেও থাকবে, এখনও সর্বত্র অবদমন চলছে। অসাম্য আর বৈষম্যের পৃথিবীতে ফুল পাখি ও প্রজাপতির মতো অবদমনও সত্য। মানুষের জীবনের প্রথম ধাপ পরিবার। শিশু জন্মমাত্রই মানুষ হয় না। মানুষ হবার জন্য প্রয়োজন হয় আলো, বাতাস, শস্য আর শিশুকে এসব জোগান দেয় পরিবার। অর্থাৎ মানুষের জীবনের প্রথম পরিবেশই তার পারিবারিক পরিবেশ। কোনো শিশু জীবনের প্রথমেই লক্ষ করে পরিবারে পুরুষ সদস্যরা পরিবারের মহিলাদের যাপিত জীবনের বড় অংশই নিয়ন্ত্রণ করে কিংবা তাদের সব কাজে খবরদারী করে নয়তো বাধাদান করে। তাহলে সে শিশুর মাঝে মনস্তাত্ত্বিকভাবে কী ধরনের মনোভাব গড়ে উঠবে? শিশুটি যদি ছেলে হয় তবে সে ভেবে নেয় বড় হয়ে তাকেও পরিবারের মেয়েদের সাথে এভাবে আচরণ করতে হবে। উল্টোদিকে শিশুটি যদি মেয়েশিশু হয় তবে সে ভেবে নেয় বড় হয়ে তাকে এভাবে পরিবারের পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে এবং তাদের আদেশ ও অনুশাসনে থাকতে হবে। অর্থাৎ পরিবারের পুরুষরা সর্বক্ষেত্রে মেয়েদের আদেশ-নির্দেশ দিবে আর মেয়েরা তা পালন করবে। নয় শুধু পারিবারিক, এটি একটি সামাজিক অবদমন। কারণ জন্মেই মানুষ এমন হয় না। কে আদেশ করবে আর কে তা পালন করবে সেটা তো পুরুষ আর নারীর এই বিভাজন নির্ভর করতে পারে না। যে

কোনো মানুষের মাঝেই যোগ্যতার সমাবেশ ঘটতে সময় লাগে। শিশুদের মনে কোনো অসমতা থাকে না। তবুও পরিবারে নারী-শিশুদের বেলায় পুরুষ সেটা করে থাকে। এটি নির্মম অবদমন। পরিবার থেকেই দুটি সমবয়সী এবং প্রায় সমযোগ্যতার শিশুকে দু'ধরনের সুযোগ দেওয়া শুরু হয়। এটা অসাম্য। পারিবারিক কারণেই দুটি শিশুকে দু'রনের পরিবেশ পরিস্থিতিতে বড় হয়ে উঠতে হয়। ছেলেশিশুটি বড় হয় সহযোগিতা ও সহজ পরিবেশে। মেয়েশিশুটি পরিবারেই বড় হয় প্রতিকূল পরিবেশে জটিলভাবে। ফলে দুটি শিশুর মাঝে গড়ে ওঠে দু'ধরনের মানসিকতা। ছেলেশিশুটির মানসিকতা হয় কর্তৃত্ববাদী আর মেয়েটির মানসিকতা হয় আপসকামী কখনো সেটা বিদ্রোহী। কারণ সব মেয়েশিশু এক মানসিকতার হয় না। ফলে ছোটবেলা থেকেই মেয়েশিশু ও ছেলেশিশুদের মাঝে গড়ে ওঠে ভিন্ন মন-মানসিকতা। আজকের সমাজে নির্যাতনের যে ভয়াবহ রূপগুলো আমরা দেখি তার মূল নিহিত এরকম ছোট একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণের ভেতর। সাধারণ পরিবারে নারী-পুরুষের অসাম্যতা একান্ত অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। পরিবারের নারীদের মনে করা হয় স্বামী বা পিতার সম্পদ। টাকা-পয়সা, দালান-কোঠা ও গবাদিপশু যেন শুধুই পরিবারের সম্পদ। নারীও যেন পরিবারে পুরুষেই সম্পদ। আমাদের সমাজে একজন নারীকে ছোটবেলা থেকে চাপ ও নিয়ন্ত্রণের মাঝে রাখা হয় কারণ ধারণা করা হয় পরিবারের মেয়েদের কর্ম দ্বারাই পরিবারের মান-সম্মান নির্ধারিত হবে। যেমন পরিবারের কোনো মেয়েকে যদি কোনো অর্থশালী বা প্রতিষ্ঠিত পরিবারে বিয়ে দিতে পারে তাতে মেয়ের পরিবার বা সমাজ মনে করে সমাজে মান-মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পাবে। উল্টোভাবে কোনো মেয়ে যদি দৈবক্রমে কোনো গরিব বা অপ্রতিষ্ঠিত পরিবারে বিয়ে করে ফেলে বা হয়ে যায় সমাজ ও পরিবার মনে করে সারা জীবনের জন্য তাদের মান সম্মান বিলীন হয়ে গেল। এই যে মেয়েদের ওপর পরিবারের মান-মর্যাদা নির্ধারণের মাপকাঠি ঝুলে থাকে। তার কারণেও পরিবারে একটি মেয়েশিশুকে তার শৈশব থেকে একটি চাপ ও নিয়ন্ত্রণের মাঝে বেড়ে উঠতে হয় যা অমানবিক ও অস্বাভাবিক। এটা মানবাধিকারের লঙ্ঘন। কিন্তু নিয়ত এ কাজটি সমাজে ও দেশে চলছে। এর কোনো প্রতিকার নেই। শিশুবেলা থেকে একটি মেয়েকে তার সহজাত বেড়ে ওঠা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এটা অবদমন। এবং তা করছে পরিবারের খুব প্রিয়জনেরা। ছোটবেলা থেকে খুব নিয়ন্ত্রণ ও চাপের মাঝে বড় করেও মেয়েশিশুটির পরিবার ক্ষান্ত হয় না। বড় হওয়ার সাথে সাথে মেয়েটি একসময় জানতে পারে, যে পরিবারে সে জন্মেছে এ পরিবার তার নয়। তার পরিবার হবে যেখানে মেয়েটির বিয়ে হবে। এবং ঐ পরিবারের সাথে যদি মানিয়ে চলতে পারে তবেই মেয়েটি একটি পরিবার পাবে। আশৈশব কৈশোর মেয়েটি যে বাবা-মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়, এক সময় সে জানতে পারে তারা তার আপন নয়। আরও বেদনাকর হয় যখন মেয়েটিকে জানানো হয় যে আঙিনায় সে হেসে নেচে গেয়ে মানুষ হচ্ছে সে আঙিনাও তার নয়। তার আঙিনা হবে সেটি যেখানে তার বিয়ে হয়ে যাবে। এসব ভয়ঙ্কর ধারণা নিয়ে একটি ছোট মেয়ে আমাদের সমাজে বড় হয়ে ওঠে। একটি অচেনা অপরিচিত পরিবারে তাকে চলে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে তাকে খাপ খাইয়ে

মানিয়ে চলতে হবে। তবেই সে ঐ পরিবারে একটি বাড়ি বা আঙিনা পাবে। যে কোনো সাধারণ মানুষের জন্য, একজন সুস্থ মানুষ হয়ে যদি আমি চিন্তা করি এসব ঘটনাগুলো একজন নারীর ওপর কী ছাপ ফেলে এবং তা কত ভয়ংকর, আমাদের সমাজ কিংবা সমাজের মানুষ কি একবার ভেবে দেখে? অনেকেই বলেই ফেলে মহিলাদের আচরণ কিছুটা অস্বাভাবিক। আমি জানতে চাই এতসব পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যারা বড় হয় তাদের আচরণ কি স্বাভাবিক হবে? হওয়া উচিত? আমাদের পৃথিবীতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি মেয়েকে অনুক্ষণ প্রতিকূল ও পুরুষ কর্তৃক তৈরি পরিবেশের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু কেন? এটা কি ঈশ্বরের বিধান, নাকি সমাজের বেঁধে দেওয়া নিয়ম-নীতি। অবশ্যই এগুলো ঈশ্বরের বিধান নয়। এটা সমাজের সমাজপতিদের বিধান। কারণ সমাজপতিরা ক্ষমতাবান এবং তারা পুরুষ। যেহেতু মেয়েদের শারীরিকভাবে সন্তান ধারণ ও আরো কিছু প্রাকৃতিক অতিরিক্ত বিষয়ের মধ্যদিয়ে যেতে হয় তাই মনস্তাত্ত্বিক কারণেই সমাজ বা সমাজের পুরুষরা এসব বিধান চালু করার সুযোগ পায়। শারীরিক কারণে নারী মানসিকভাবেও দুর্বল হয়ে যায়। এভাবে সমাজ ও পরিবার দ্বারা মেয়েরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবদমিত হচ্ছে। মেয়েদের স্বাভাবিক যে বেড়ে ওঠা, যোগ্যতা অর্জন করা তা প্রায় প্রত্যেক মেয়ের জন্য স্বপ্নবিলাস। অন্যদিকে একটি ছেলেশিশু কিভাবে বেড়ে উঠছে? পৃথিবীতে আসার পর থেকে সে শিশু শুনতে পায় সে শ্রেষ্ঠ, সে ভালো, তার ওপর নির্ভর করে তার পরিবারের পরিচয় । তাই তাকে পরিবারে সবচাইতে উৎকৃষ্ট সুযোগুলো ভোগ করে বড় হয়ে উঠতে হবে। এই যে একটা তোষামোদী ও প্রতিযোগিতাহীন পরিবেশে সে বড় হয় তার কারণে শিশুটির সহজাত যে গুণগুলো প্রকাশ বা বিকাশ হওয়ার প্রয়োজন তা হয় না। ফলে বৃহত্তর পৃথিবীর আঙিনায় সেই শিশুটি একসময় নিজেকে দুর্বল ভাবে। ফলে তার মাঝে বিভিন্ন প্রকারের বিকার বা অক্ষমতা আশ্রয় নেয়। তখন হয় সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে অথবা অন্য অসৎ বা অন্যায় পন্থা অবলম্বনের সুযোগ খোঁজে। আজকের সমাজে যে অনেক বিকৃত অপরাধ দানা বেঁধেছে তার অন্যতম মনস্তাত্ত্বিক কারণ এটি। কারণ ছেলেশিশুরা আজন্ম শুনে আসে তারা বড়, তারা শ্রেষ্ঠ কিন্তু সমাজে বৃহত্তর পরিসরে যখন সে নিজেকে প্রমাণ করতে পারে না সে শ্রেষ্ঠ তখন তার মাঝে ভর করে হীনমন্যতা, অক্ষমতা– যেগুলো সে প্রকাশ করে নোংরা এবং। অশ্লীল অপরাধের ভেতর দিয়ে। শুধুমাত্র পরিবারের অসুস্থ মানসিকতার জন্য এভাবে সমাজে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অবদমন প্রগতির কোনো চিহ্ন নয়। বরং সুস্থ প্রতিযোগিতা ও নারী-পুরুষ ভেদে সমান সুযোগ একটি সমৃদ্ধ পৃথিবী গড়ে তুলতে পারে। যে শিশু ছোটবেলা থেকেই দেখে আসে পিতা তার মাতা বা স্ত্রীকে সম্মান করে না বা মর্যাদা দেয় না– বড় হয়ে সে শিশু কখনো তার মা বা স্ত্রীকে সম্মান দিতে পারে না। কারণ শিশুরা পরিবারে যা দেখে তাই শেখে এবং অনুকরণ করে। এখন ছোটবেলা থেকে শিশুরা দেখছে পরিবারে মেয়েদের কোনো সম্মান বা মর্যাদা নেই তখন মেয়ে শিশুর মানসিক গঠন হয় আপসমূলক। অর্থাৎ সেও নিজেকে তৈরি করে এভাবে মান-মর্যাদাহীনভাবে জীবন কাটিয়ে দেওয়ার জন্য অথবা কোনো কোনো শিশুর মাঝে

জীবনের প্রথম স্তর থেকেই একটি প্রতিরোধ বা বিদ্রোহী মানসিকতা গড়ে ওঠে, যা সমাজ ও পরিবারের জন্য ভালো হয় না। কারণ প্রতিবাদের স্তর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মেয়েশিশুর মাঝে ক্ষোভ জেগে ওঠে ফলে সে অনেক ধরনের বিপজ্জনক অপরাধে জড়িয়ে পড়তে পারে। অন্যদিকে যে ছেলেশিশুটি একই ঘটনা দেখে বড় হয় হয়তো সে ছেলেশিশুটি বড় হয়ে পরিবারের পুরুষদের মতো একই প্রক্রিয়ায় মেয়েদের ওপর নির্যাতন শুরু করে আবার অনেক সংবেদনশীল শিশু সে পথে না গিয়ে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে যায় ফলে বড় হয়ে তার মাঝে মানসিক বৈকল্য দেখা দেয়। অর্থাৎ সমাজ ও পরিবারের কারণেই শিশুদের মাঝে অনেক অসংগতি দেখা দিতে পারে। সুতরাং শিশুদের সামনে যে কোনো কাজ করার জন্য অনেক ভাবনা চিন্তা করা উচিত।

আমাদের দেশ একটি স্বল্প আয়ের দেশ। এ দেশের এক শ্রেণীর হাতে আছে টাকার পাহাড়, অন্য শ্রেণীর নুন আনতে পান্তা ফুরায়, ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য এত বিরাট যা কল্পনাতীত। ফলে সমাজে তৈরি হয়েছে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা। টাকার কারণে এক শ্রেণীর মানুষ সমাজ বা মানুষকে মানুষ মনে করে না। তাদের বিত্ত ও বৈভব বাড়ানো এবং অটুট রাখার জন্য সমাজকে বিভিন্নভাবে কলুষিত করতে চায়, অন্য-এক শ্রেণী, শ্রেণী-বৈষম্যের কারণে অর্থবান শ্রেণীর কাছে সব সময় পীড়িত হচ্ছে। সমাজে এটিও এক ধরনের অবদমন। যার হাতে প্রচুর টাকা তার আরও টাকা চাই আরও টাকা চাই বলে সমাজের অলি-গলি সব জায়গায় টাকা বানানো এবং ব্যয় করার জায়গা খোঁজে। আর যাদের টাকা নেই তারা টাকাওয়ালা শ্রেণীর টাকা পাওয়ার জন্য নিজেদের বুদ্ধি-বিবেক বিসর্জন দিয়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধে জড়িয়ে যায়। এভাবে বৈষম্য ও অসাম্য সমাজকে, দেশকে, জাতিকে অপরাধী করে। অবদমন একটি মনস্তাত্ত্বিক অপরাধ যা গোটা মানব জাতিকে বিভিন্নভাবে ধ্বংস করছে। সাম্প্রতিককালে দেশে যে উগ্রবাদীদের উত্থান হয়েছে, পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে তার জন্যও দায়ী অবদমন। কোনো বিষয় সম্পর্কে যখন মানুষের সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকে না তার থেকেও অবদমন তৈরি হয়। বিশ্বের ক্ষমতাবান রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন ইরাক আক্রমণ করল, তাও অবদমনের জন্য। সাদা চোখে হয়তো মনে হয় যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে অবদমন করতে চাচ্ছে আসলে ঘটনা তা নয়, মার্কিনিরা মানসিকভাবে ইরাক দ্বারা অবদমিত হচ্ছে তাই তারা ইরাক আক্রমণের দ্বারা তাদের জিঘাংসা বাস্তবায়ন করেছে।

সুষ্ঠ স্বাভাবিক মানসিকতা অবদমন ঘটাতে পারে না; সুষ্ঠ মানসিকতার জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠ জীবন ও সুন্দর পরিবেশ। বর্তমান সমাজে কি নারী কি পুরুষ কেউই পূর্ণ যোগ্যতা নিয়ে বিকশিত হতে পারে না, শুধুমাত্র অবদমনের কারণে। এক শ্রেণী বিকশিত হচ্ছে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে অন্য শ্রেণী বিকশিত হয় প্রতিযোগিতাহীন অনুকূলতার মাঝে। ফলে কারোরই স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। একারণে এ সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তিত হওয়া দরকার।

এবার দুর্নীতি নিয়ে বলি, গোটা পৃথিবীতেই দুর্নীতি আছে। দুর্নীতি অতীতেও ছিল আগামীতেও থাকবে। যতদিন নীতি আছে ততদিন সুনীতি দুর্নীতি হাত ধরাধরি

করে সমাজে থেকে যাবে। এক শ্রেণীর লোক সুনীতিকে ধারণ করে জীবনপাত করবে অন্য-এক শ্রেণীর লোক দুর্নীতির চোরাগলি খুঁজে খুঁজে জীবন অতিবাহিত করবে। কারণ দুর্নীতি কোনো বায়বীয় ধারণা নয়। এটা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তিক ধারণা, এবং সব মানুষের মাঝে এটি গড়ে ওঠে দীর্ঘ সময় নিয়ে। কখনো লোভলালসা থেকে কখনো বঞ্চনা-অবহেলা থেকে। অর্থাৎ দুর্নীতি-সুনীতি মানুষের প্রবৃত্তিগত আচরণ। পরিসংখ্যান আর জরিপ দিয়ে চটকদার দুর্নীতি আলোচনার চাইতে দুর্নীতির গভীরে যাবার যে প্রয়োগ আমাদের সেখানেও জোর দিতে হবে। তা প্রশংসাযোগ্য। যে কোনো আলোচনাই যদি গভীর থেকে করা না হয় তবে তা হয় মাটি ছাড়া গাছের শিকড়ের বাতাসে ঝুলে থাকার মতো। গাছের চারা কখনো মাটি বা পানি ছাড়া বড় হতে পারে না। দুর্নীতি আমাদের সমাজে সব সময়ই হয়েছে বড় কিংবা ছোট আকারের। দুর্নীতি দূর করার জন্য বা নিয়ন্ত্রণের জন্য তাই দরকার গোড়ায় গিয়ে আলোচনা করা, গোড়া উপড়ে না ফেললে আগাছা কখনো দূর হয় না। তাই দুর্নীতিকে আমরা যদি সমাজের আগাছা মনে করি তবে গোড়া ধরেই টানতে হবে। মনোবিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে বিষয়সমূহ দেখতে হবে। কথার পাহাড় তুলে আলোচনা করার চাইতে বিষয়ের গভীরে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে অনুধাবন করা খুব জটিল প্রক্রিয়া। সে কারণে 'হালখাতা'র দুর্নীতির মনস্তত্ত্ব সংখ্যাটি একটি কার্যকরী সংখ্যা হয়েছে। যে দুর্নীতির পেছনের প্রধান কারণ অবদমন।

যাপিত জীবনে

ফে র দৌ সী সু ল তা না

লতিফা দৌড়ুতে দৌড়ুতে বাসে চড়ল। আজও অফিসে দেরী হয়ে যাবে। সে বাসে 'মহিলা' লেখা জায়গাটির দিকে এগুলো। ওখানে বসে আছে দুই যুবক। লতিফাকে সামনে দাঁড়ানো দেখে অলস চোখে তাকাল একজন। আরেকজন মনে হল ভাব জগতে আছে। ইহজগতের কোনো কিছুই যেন তাকে স্পর্শ করছে না। বাসের দুলুনির সঙ্গে দুলছে লতিফার দেহ , সঙ্গে তার মস্তিস্কও ।

লতিফা দাঁড়িয়েই থাকল। বাসের কনডাকটর এসে দুই যুবককে মনে করিয়ে দিল এ সিট মহিলাদের সংরক্ষিত। মনে হল তারা দু'জন হঠাৎই দেখল লতিফাকে। চেপে বসে জায়গা করে দিল একজন, কোনোমতে বসতে পারা যায় এরকম, লতিফা বসল। একবার ও ভেবেছিল বলবে, মেয়েদের জায়গায় আপনারা বসে আছেন কেন, কিন্তু সে কথাটি পরিস্থিতি বুঝে ও গিলে ফেলল। বলল না।

এরকম অনেক কিছুই গিলে ফেলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে লতিফা। প্রতিবাদ করাও যায়; কিন্তু সব জায়গায় নয়। বিকট হর্ন দিয়ে ঘ্যা-অ্যা-স করে থামল বাসটি। হুড়মুড় করে অফিসগামী বেশ কয়েকজন ঢুকে পড়ল। বাসের ভিতর বেশ ভিড়। এর মধ্যে দু'জন মহিলাও আছেন, যথারীতি তারা এগিয়ে আসছেন মহিলা সিটের দিকে। লতিফা চোখের কোণ দিয়ে দেখলো পাশে বসা স্মার্ট লুকস ভদ্রলোকদের মুখের এবড়মৎধঢ়যু ঈযধহমব হয়ে গেছে। সরু চোখে তারা মহিলা দুজনকে দেখছে- যেন অনাকাঙ্খিত কোনো পদার্থ, চোখের সামনে, না থাকলেই ভালো হত। পাথরের মূর্তির মতো বসেই আছে। এরা এই সমাজের ভদ্রলোক। মহিলা দুজন বাসের দোলায় দুলছে। এর গায়ে ওর গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে। কেউ কেউ নিজেরাই নিজেদের শরীরকে সমর্পিত করছে মহিলা দুজনের ওপর। লতিফা একটু ঘুরে বসল। পরিপূর্ণ চোখে পাশে বসা সহযাত্রীদের দিকে তাকাল। লতিফার চোখে এবার যেন তীব্র নির্দেশ, কিছুটা ঘৃণাও। এ দৃষ্টির কাছে নতি স্বীকার করে এতক্ষণে আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে দাঁড়ায় দুই ভদ্রলোক।

অবশেষে মহিলাদের আসনে দাঁড়িয়ে থাকা দুই মহিলার আসন গ্রহণ । দৃশ্যটার এখানেই সমাপ্তি হলে ভালো হত। কিন্তু হয়নি। শুরু হয় মহিলা সিটের সামনে আলোচনা টীকা-টিপ্পনী ।

দুই

অশ্লীল, শ্লীল সব ধরনের রসাত্মক পর্যালোচনা। বিষয়বস্তু;মহিলাদের জন্য পর্দাপ্রথা আবশ্যক কিনা, চাকরি করা হারাম কি হালাল ।

লতিফা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। চোখ কান গরম হয়ে ওঠে তার। জিভটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকে ও। প্রতিনিয়ত এরকম কালা-বোবা হয়ে থাকতে হয়। খুব বেশি অসহ্য হলে মনে মনেই প্রতিবাদ করে– সশব্দ নয়। এত সবের পরেও মাঝে মাঝেই মন মানতে চায়না। প্রতিবাদী হতে ইচ্ছে করে। কিন্তু শেষমেষ নিজেকে দমন করে সে। এভাবেই দিনে কত বার যে, কি কর্মক্ষেত্রে, কি পথে-ঘাটে, কি বাড়িতে নিজেকে অবদমিত রাখতে হয়, তার হিসাব দেবে কে?

লতিফা বাসের ঝাঁকুনিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যায়। হঠাৎ পায়ের কাছে কেমন এক শিরশিরে অনুভূতিতে তন্দ্রা ছুটে যায় ওর। হকচকিয়ে তাকায় নিজের পায়ের দিকে; আস্তে ধীরে সহযাত্রীর গুটিয়ে নেয়া পায়ের দিকে স্তম্ভিতের মতো লতিফা তাকিয়ে থাকে। পায়ের মালিককে দেখার জন্য ওর চোখ পা বেয়ে দেহের উপরের অংশে উঠতে থাকে কোমর-কাঁধ-মাথা– একটি অবয়ব অপলক চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। চোখে চোখ পড়তেই নির্লজ্জের মতো হাসল লোকটি। দৃশ্যমানভাবে জিভ দিয়ে আয়েশ করে ঠোঁট চাটছে সে এখন। ক্ষোভে-ঘৃণায়-লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে লতিফার। অনেক অনেক বারের মতো এবারও আক্ষেপ হয় তার, কেন মেয়ে হয়ে জন্মালাম!

মতিঝিলের বাণিজ্যিক এলাকার নির্দিষ্ট স্টপেজে থামে বাসটি। লতিফা নামে। ৯-৬টা চাকরি, সারাদিনের পরিশ্রমের জন্য মনকে তৈরি রাখা, এসময় এধরনের অনাকাঙ্খিত ঘটনায় মেজাজ ধরে রাখাই মুশকিল। লতিফা হনহন করে এগোয় অফিসের দিকে। তার পায়ের নিচে দলিত হতে থাকে অসহিষ্ণু রাগ বিদ্বেষ। সে দুপায়ে মাড়িয়ে যায় অপসংস্কৃতি, অবহেলা, অসঙ্গতি ।

অফিসে পৌছে নিজের সিটে বসে সে। আস্তে ধীরে চোখ বুলায় হলরুমে। না, এখনো সবাই এসে পৌঁছায়নি। ৯টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। আয়েশ করে চা পান করে আর লতিফা ভাবে, এমন কেন আমাদের চারপাশটা? মহিলারা কি কোনোদিন ইজ্জতের সাথে, সম্মানের সাথে মানুষ হযে বাঁচবে না?

তিন

মনের ভেতরে একটা বড় 'না' ভেসে ওঠে ছায়াছবির মতো, তার মনে পড়ে কিছুদিন আগে 'নারীর অধিকার মানবাধিকার' সংক্রান্ত এক সেমিনারে বক্তারা বলেছিলেন, নারীর প্রতি বৈষম্যের কারণ অনেকগুলো ।

মুসলিম আইনে নারীর উত্তরাধিকার সম্পর্কিত সাধারণ নীতি হল, সম্পত্তির অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে পুত্র কন্যার চেয়ে দ্বিগুণ সম্পত্তি পাবে। পৈত্রিক সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার এখানে পুত্র-কন্যার মধ্যে অসম। এখানেই অবদমনের বীজ রোপিত হয়েছে। যদিও, বাংলাদেশের সংবিধানে আছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকে নাগরিক হিসেবে সমাধিকার লাভ করবে। এক্ষেত্রে মুসলিম ল-এর নারীর পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দুটো ধারাই একে অপরের বিপরীতধর্মী। কোনটা মানছি আমরা? যেখানে বৈষম্য ও বঞ্চনা আছে সেটিই। রাষ্ট্রের চোখে, প্রশাসনের চোখে যদি নারী সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তবে পথে-ঘাটে-অফিস-আদালতে এরা লাঞ্ছিত তো হবেই। এখনো কি সময় আসেনি সাংবিধানিক এ অসঙ্গতি দূর করার? জাতিসংঘ ঘোষিত সব ধরনের বৈষম্য বিলোপের সনদ সিডও এবং বেইজিং কর্মপরিকল্পনার আলোকে নারী পুরুষের সমতার আদর্শ প্রতিফলিত করার? প্রশাসনের সকল পর্যায়ে, নীতি নির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার? আমরা যারা নারী তারা কম কিসে? জ্ঞান বিজ্ঞান, প্রযুক্তিতে নারীরা তো সমান দক্ষতার সাথে কাজ করে চলছে।

চার

পিয়ন কখন চা রেখে গেছে অন্যমনস্ক লতিফা টেরই পায়নি। সে অলস হাতে চায়ের কাপ ঠোঁটে ছোঁয়ায়। ঠাণ্ডা, বিস্বাদ তেতো লাগে চা। সে বিকৃত মুখে কাপটি টেবিলে রেখে দেয়।

মনে পড়ে লতিফার কিছুদিন আগে বান্ধবী রুনার সাথে দেখা হয়েছিল। টগবগে তরুণীর উচ্ছ্বাস আনন্দের ছিটেফোঁটাও এখন নেই ওর মাঝে।

-কেনরে? তুই এমন মিইয়ে গেছিস কেন বল তো?

বিস্মিত লতিফার প্রশ্নের জবাবে রুনা শোনায় স্বামীর লাম্পট্য আর অত্যাচারের কাহিনী।

লতিফা রাগ করে বলে,– এসব সহ্য করছিস কী করে? চলে এলেই তো পারিস। রুনা ছলছল চোখে শোনায়, দুই বাচ্চার মা আমি। বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ তো আছেই, তাদের ভরণ পোষণ কে করবে বল্? চাকরি তো করছি না, স্বামীর সোহাগে ভুলেই গিয়েছিলাম অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া দরকার ছিল আমার। বাবার বাড়িতে যাওয়ার কী আর উপায় আছে? তালাকপ্রাপ্তা মেয়ে পরিবারের কলঙ্ক। কে নেবে আমার ভার?

পাঁচ

শুনে মনটা বিষণ্নতায় ভরে ওঠে। লতিফা জানে, স্বামী পরিত্যক্ত মহিলার চেয়ে শোষিত-নির্যাতিত মহিলাই সমাজে আদরণীয়। বোবা কালার শত্রু নেই।

লতিফা ভাবে, নিজের সংসারের দিকে তাকিয়ে মেয়েটাকে লেখাপড়া শেষ না করিয়ে কিছুতেই বিয়ে দেবেন না সে। আগে স্বাবলম্বী হবে তারপর....।

রুনার চোখের পানি, ওর অসহায়ত্ব মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। লতিফার মতো যুগ যুগ ধরে নারীরা এভাবে বংশ পরম্পরায় লাঞ্ছিত বঞ্চিত হচ্ছে, বিড়ম্বিত হচ্ছে কেবলি কি আর্থিক কারণে? আর কোনো কারণ নেই? অবচেতন মনের গহীনে মেয়ে শিশুকে তার মা বাবা বেড়ে ওঠার প্রতিটি ধাপে যে নিষেধবাণী, যে সামাজিক নিয়মকানুনের শৃংখল ধীরে ধীরে রোপণ করে দেন; পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে সে যখন নিজেকে আবিষ্কার করে তখন এই দাসত্ব থেকে সে মুক্ত হতে পারেনা। কখনো ননদিনী হিসেবে, কখনো শাশুড়ি হিসেবে সে-ই নিজে নিজের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। তার অবচেতন মন অন্য নারীকে শোষণ নির্যাতনের মধ্যেদিয়ে পুরুষের হাতকেই শক্তিশালী করে। এভাবে অবদমিত হয় নারীর সার্বিক সত্তা।

শৃংখলিত নারী চারপাশে শুধু দেখে নিয়মকানুন, দেখে সমাজের রক্তচক্ষু, হায়েনার হাসি, শোষকের লোমশ হাত। মায়ের আদর, পিতার বাৎসল্য, ভাইয়ের স্নেহ সবকিছুর উর্ধ্বে থাকে অবাঞ্ছিত, অদৃশ্য নিষেধাজ্ঞার খড়গ। কবে, কিভাবে এ থেকে মুক্ত হবে– ভঙ্গুর, ক্ষয়িষ্ণু সমাজে নারী নিজেকে মেয়ে মানুষ নয়, মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে?

লতিফা ভেতর থেকে অনুভব করে একটা তাগিদ, এখন থেকে ঠিক এই মুহূর্ত থেকেই নয় কেন? আমি আমার মেয়ে থেকে ছেলেকে পৃথক করে না দেখে একই নিয়মে দু'জনকে বড় করি, একই মূল্যবোধ দু'জনের মাঝে বপন করি। আমাদের বন্ধুদেরও বলি তোমরাও তোমাদের শিশুদের মাঝে ছড়িয়ে দাও মানবাধিকারের মূল্যবোধ। আর সামাজিক এসব অসঙ্গতির বিরুদ্ধে লড়তে হবে সবাইকে একসাথে। এভাবে চিন্তা করতে করতে ভেতরটা হালকা হয় লতিফার। কল্পনার জগত থেকে বাস্তবে ফেরে সে। অফিস গমগম করছে। সহকর্মীরা কাজে হাত দিয়েছে। হঠাৎ মুচকি হেসে নিচুমাথা করে নিজের কাজে ডুবে যায় লতিফা।

অবদমন: একটি অশালীন পর্যালোচনা

তুহিন সমদ্দার

ক.

খারাপ হবার চান্স পাইনি বলে ভালো...

ঝিকাতলা থেকে বারিধারা যেতে, যেভাবেই যাই– কমসে কম একঘণ্টা লাগবেই। তার ওপরে আজ সোয়া আটটা বেজে গেছে! নটার অফিস ধরার জন্য ব্যাকুল আমি রাস্তায় বেরিয়েই বুঝতে পারলাম আজ খবর আছে। মোড়ের কাছে যেখানে সিএনজি অটোরিক্সা চালকবৃন্দ নেহাৎ খোশগল্প করার জন্য ওৎ পেতে থাকে– আজ তারা আরও বেপরোয়া। বারিধারা কেউ যাবেনা। কোথায় যে যাবে, তা তাদের জন্মদাতারা জানলে নিশ্চয়ই তাদের জন্ম দেয়ার কথা ঘুণাক্ষরেও মনে জন্ম দিত না। আমার আশেপাশে আরও অনেকে বিভিন্ন স্থানে যাবার জন্য *প্যাশলামী* করছে। কিন্তু চালকেরা আমাদের উপদেষ্টা মণ্ডলীর[১] মতোই নীতিতে অনড়! এর ভেতরেই দেবদূতের মতো একটি সিএনজি চ্যারিয়টের ন্যায় আমার সামনে এসে থামল। কোঁই জ্জাইবেন বাঁই? গ্রিল করা খাঁচার ভেতর থেকে নেহাৎ অবজ্ঞাভরে মেগাসিটির টোনে জিজ্ঞেস করলো সে। (আমার ধারণা, এই খাঁচা সৃষ্টির পেছনে প্রধান মোটিভ হল: ভয়। পাবলিকের ওপর নিতান্ত অন্যায়ভাবে তারা যে বাড়তি ভাড়া আদায় করে কিংবা মিটার ছাড়া 'কন্টাকে যাইমু' বলে *খামি* দেয়; তার থেকে নিজেকে নিরাপদ অবস্থানে সচ্ছন্দ রাখার জন্য এহেন খাঁচার চেয়ে উপযুক্ত আর কী আছে?) তারপর খুব দয়ালু স্বরে উঠতে ইশারা করে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়র মতো লাজুক হেসে বলল দশটা টাকা[২] বাড়াইয়া *দেতে অইবে* কইলাম। এবার আমি তার দেশের বাড়ি *ঠিক* পেলাম। বরিশালের বিল অঞ্চল থেকে এসেছে ব্যাটা। আর এসে একদম অমানুষ হয়ে গেছে। লোকটার কপাল খারাপ, তাই বাঁ দিকের দরজাটা খুলল থুথু ফেলবে বলে। কিন্তু ওর আর থুথু ফেলা হয়ে উঠল না। কেননা 'দেতে হইবে' শুনেই আমার রক্ত চড়ে গেছে মাথায়। খপ করে বাঁ হাতে চুলের মুঠি ধরে ডান পা ভাঁজ করে মাসুদ রানার স্টাইলে হাঁটু দিয়ে সজোড়ে মারলাম ওর মুখে। নাকের হাড় যে এত নরম তা আগে জানা ছিল না। ঘট করে শব্দ আর গলগল রক্ত একসাথে বেরোলো। মাথাটা ঠুকে গেল উপরের রডের সাথে। খানকীর পোলা, তোর দশটাকা আইজ বাইর করতাছি শুয়ারের বাচ্চা, বাইরা চোদনা! ...কী হইলো, মারলেন কেলেগা? বলে যে হিতাকাঙ্ক্ষী বোকাচোদা ব্যক্তিটি এগিয়ে এল সিএনজি চালকের সহমর্মী হয়ে– তাকে আমি মারলাম না। শুধু বললাম, মাঙ্গের পোলা যেইহান দিয়া আইছো, হেইহানে ভইরা দিম্ যা ফোট্! আমার রক্তচক্ষু আর খুনে

চেহারা দেখে জটলা তেমন জমল না। অদূরে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের মতো জনৈক ট্রাফিক সার্জেন্ট অলস দৃষ্টিতে ঘটনা প্রত্যক্ষ করছেন। ট্যাক্সিচালক নাক চেপে হতবাক কাঁপছে ভয়ে। আমি চাপা শাসানির স্বরে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম- চালা!! লোকটা টু-শব্দ না করে মিটার এ্যাডজাস্ট করল আমি উঠে বসার আগেই তারপর ঘরাৎ করে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। বেশ খুশি খুশি মনে ক্রোধ প্রশমিত আমি সিগারেট ধরালাম... আপনাদের কী ধারণা, ওপরের ঘটনাটা সত্যি সত্যি ঘটিয়েছি আমি? আরে নাহ্ , ও-তো আমার ভেতরের জিঘাংসা! যা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত ক্রমাগত হজম করে যাচ্ছি। আসল কাহিনী হল দশ টাকা বাড়তি মেনে নিয়েই আমি সিএনজিতে উঠে বসেছি। তবু যদি অফিসটা পাই আজ... বোকাচোদার বাটখারা আর কাকে বলে! তদুপরি মদনমোহন তর্কালঙ্কার আমাকে মেনে নিতে হয়েছে ওর মিটার টেম্পারিং আর ভাংতি নাইয়ের নখড়া। ফলাফল একশত টাকা!

দর্শকশ্রোতা[৩], আমার অবদমনের এই উদাহরণ আপনাদের জীবনে সত্যি সত্যি হয়ে বার বার ফিরে ফিরে আসুক এই কামনা নিয়ে শুরু করছি। আশা করি সবাই খারাপ আছে, অবদমিত আছেন এবং সেই খারাপ থাকাকে যথাসম্ভব দমিত করে ভালো থাকার বেহুদা এ্যাক্টিং করতে করতে রীতিমতো হাত পাকিয়ে ফেলেছেন। সাবাস!

তো আগেভাগেই বলে রাখি: গদ্যে তত্ত্বের তালাশ করেন যারা, তাদের জন্য দুঃখিত, কোন আশার বাণী শোনাতে পারছি না। এবং যারা অবদমন বলতে যৌন-অবদমন শব্দবন্ধের মোড়কে ফ্রয়েড-ফ্রাই খেতে চান তাদেরকেও অন্য রাস্তা দেখতে হবে। বস্তুত, যৌনদ বা তদ্বিষয়ক কোনো চুলচেরা (বালছেড়া) ব্যাখ্যা এখানে বালখিল্য! প্যাট্রিয়ার্কির ইয়ার্কি করতে করতে এমন ন্যারো ফিল্ড অব ভিশন তৈরি হয়ে গেছে আমাদের যে অবদমন শব্দটি তার প্রকৃত আবেদন হারিয়ে বসে আছে। শুনলেই যৌনগন্ধের ভিয়েনের স্বাদ পাওয়া যায় যেন। অথচ বসের ঝাড়ি খেয়ে, চারপাশে কত কত সফলতার হাইরাইজ প্রত্যক্ষ করে আর বন্ধু বা কলিগের স্ত্রীর আটসাঁট শরীরের সাথে নিজের প্রাপ্তির ব্যালেন্সসিটে ঘাপলা তৈরি হলে যে সো-কল্ড অনেস্টির মখমলে নিজেকে জড়িয়ে দিব্বি ঘুরে বেড়ায় আর 'এই গরীব দেশে জন্ম না নিলে হু হু আমিও দেখিয়ে দিতাম...' আচরণকে আপনি কী বলবেন, শুধু ব্যর্থতা? নাকি আরও কোনো ফ্যাক্টর কাজ করছে এখানে? প্রকৃতপক্ষে, এক অমোঘ অচীন অবধারিত অবদমন আমাদের চলমান জীবনে ক্রমশ বহমান। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে শ্রোতা-ভাই-বন্ধু আপনাকে দিয়ে কিছু শর্তসন্ধি সাইন করিয়ে নিতে চাই। তাতে আমাদের দুপক্ষেরই কথা বলতে সুবিধা। কেননা অঙ্ক করতে হলে কিছু সমীকরণ তো আপনাকে মানতে হবেই, না কি? তো এক্ষণে আমার প্রধান দুটি অনুসিদ্ধান্ত– যা আমি বোধ করছি– আপনি একমত হবেন–

এক: আমরা একটি বদ্ধ সমাজে বসবাস করছি। এবং

দুই: আমরা একটি সাম্প্রদায়িক[৪] বদ্ধ সমাজ-রাষ্ট্রে বাস করছি।

খ.

আগামী শতাব্দীতে বালুচরী শাড়ি
বালিহাঁসের মতোই মাংসাশীদের খপ্পরে পড়বে...

অতিসাম্প্রতিক বিষয়-বিশ্লেষ করার কিছু বিপদ আছে কারণ কাহিনী যেহেতু তখনও চলমান তাই শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা বলা মুশকিল। যাদুঘর থেকে প্রত্ন-পাচারের বিষয়টি সম্বন্ধে আপনারও নিশ্চয়ই নিজস্ব বীক্ষণ আছে। তথাপি যদি জিজ্ঞেস করা হয় সরকার বা সরকারে বসা লোকগুলো কি শুধুমাত্র তাদের মাথামোটা চিন্তার ফলেই এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে, তাহলে আপনি তার সাথে যোগ করবেন উদাসীন পথিকের মনের কথা, লোভ, ওভারসীজ টুরের মূলো, ডোনারদের প্রেসার, দেশপ্রেমের অভাব আর কর্তব্যে গাফিলতি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ভাবুন তো, যারা বামিয়ান পর্বতে বুদ্ধের প্রাচীন মূর্তিদুটি গোলার আঘাতে উড়িয়ে দিয়েছিল, সেখানে তো আন্তর্জাতিক চাপ ছিল, নিন্দা উঠেছিল। তবুও রক্ষা পায়নি শেষ পর্যন্ত। আমরা তো তবু প্রতিবাদ করেছি (ভাবতে শান্তি পাই! আসলে কি প্রতিবাদ হয়েছিল, তেমন করে?)। আর এসবের পেছনে আমাদের প্রত্যেকের অবদান সমপরিমাণ। শৈশব থেকে অবদমনের চূড়োয় আরোহণ করে বসে আছি আমরা। এবং একথা আশ্চর্যরকম সত্যি যে, যত ধরনের দমননীতি রয়েছে তার মধ্যে সাংস্কৃতিক অবদমন শিরচূড়ামণি! রাষ্ট্র তাতে মদদ দেয়। বলেঃ দেশে ভয়ানক সৌভাত্তৃত্তো বিরাজ করিতেছে। ওদিকে যথাযোগ্য ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে নানাপ্রকার অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। রাস্টোপতি ও বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক নেত্রীবর্গ তাতে বাণী দেন। বলেন, আমাদের হাজার বছরের সাফল্যমণ্ডিত ইতিহাস রয়েছে। দেশে এখন উন্নয়নের জোয়ার। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামী অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আমরা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় অবস্থান করতে যাচ্ছি বলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে কচুশাকের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে বলে চালের দাম গত সপ্তাহের তুলনায় দুই টাকা কমে এখন মাত্র বিয়াল্লিশ[৫] টাকায় বিকোচ্ছে। ওদিকে ঘোষিত পুরাকীর্তির নিদর্শন-মন্দিরগুলোর খোয়া যাওয়া মূর্তির বেদিতে ছাগলের লাদি আর সদ্য চুনকাম করা শ্যাতলা পড়া মোটা দেয়ালে অনভ্যস্ত বাংলালিপিতে খোদিতঃ তোরে চু-![৬] শ্রোতাবন্ধু আপনি যদি বিষয়গুলিকে কো-র‌্রিলেট করতে পারেন তাহলে ল্যাঠা চুকে গেল। আর তা না হলে আমাকে সেই শুরু থেকে শুরু করতে হবে, যখন আমাদের শেখানো হয় জল নয় পানি, মাংস নয় গোশ্‌, খোদা হাফেজ নয় আল্লাহ হাফেজ। তো আমাদের সাংস্কৃতিক অফিসাররা যদি বজ্রসত্ত্ব বা বিষ্ণুমূর্তির মাজেজা না বুঝে থাকেন তবে তা তো তুশ্চু। অবদমনের বাই প্রডাক্ট হয়ে আমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছি আর ছড়িয়ে দিচ্ছি আহা রাশি রাশি অন্ধকার। কে আমাদের ভরসা দেবে কে দেখাবে আশার বাউন্ডারি– তাতে কোন্‌ চ্যাঁয্যয্যয্যাট এলোগেলো? আর আমার বিদেশিনী কলিগ কিছুতেই বুঝে পায়না, ফ্রান্সের মতো একটি কালচারালি ডেব্‌লাপ কান্ট্রিতে আমাদের আর্টিফ্যাক্টসগুলি পাঠানোতে আমার আপত্তি কেন, যেখানে আমার সরকারই সাইন করেছে। তার মতে এ-ও একধরনের কালচারাল রিপ্রেশন। এবং ফ্রয়েড সাহেব

যথার্থই বলেছেন (?), অবদমনের ফল হয় মারাত্মক– সুদুরপ্রসারী এবং বহুদিগবিস্তৃত! জেনে রাখুন, নিজের বৌকে নাভির ওপর শাড়ি পড়তে বলে অন্য মেয়ের নাভির দিকে তাকাবেন না।

গ.

হালায় আইজকা নেশা করছি বহুত...

ঢাকা শহরের যতগুলো ঘোষিত ও অঘোষিত বার বা মদবিপণনকেন্দ্র রয়েছে তারা সকলেই শুক্রবার বন্ধ থাকে। একমাত্র বোকাচোদা কান্ট্রিতেই এহেন ফাজলামি চলতে পারে। এর মানে হচ্ছে আপনি ইচ্ছে হোক বা অনিচ্ছায় সাপ্তাহিক ঐ ছুটির দিনটিতে অন্তত সাত্ত্বিক থেকে নিরীহ সাদাসিদা সহি জীবন যাপন করতে বাধ্য হবেন। বাকি ছয়দিন ধর্ষণ ও অপরাপর অন্যায় আচরণ করলেও আপনার নাম সিলেবাসে নেই। আমাদের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী সম্ভবত এ কারণেই বাড়িতে মদ রাখতেন। আর কেউ সম্ভবত রাখে-টাখে না। আহা বেচারা।

ঘ.

ডেকো-হেক্টা-কিল-মারিয়া-দেশি-সেন্টি-মিলি!

যৌন-অবদমন ওয়াইডলি স্প্রেড হবার পেছনে বড় কারণ পাশ্চাত্যের প্রপাগান্ডা বলে আমি মনে করি যদিও তাবৎ রিপ্রেসনের ভেতরে উহা অতি সামান্য অংশ। বলতে গেলে হিমশৈলচূড়া। কোথায় নেই তার অস্তিত্ব বলতে পারেন? ভালো মানুষের সংজ্ঞার খোলসে আর খারাপ মানুষের তকমার কাঠামোয় বারুদের মতো ঠাসা আছে বিস্ফোরণোম্মুখ অবদমনের এমুনিশন। তবে আপাত-দৃশ্যমান অংশ বলেই হয়তো যৌন-অবদমনভিত্তিক কালচার আর কূটকচালি অন্যান্যগুলোর চেয়ে বেশি। একে *ফিগার-আউট* করা অপেক্ষাকৃত সহজ সেই অর্থে। নিষিদ্ধ ভোগ চরিতার্থ না করতে পারার রিরংসা পরিমাপণের মাধ্যমে অনায়াসে তাকে লেবেল মারা সম্ভব। এবং তার পরিত্রাণে পাশ্চাত্যের প্রেসক্রিপশন পাওয়াও তেমন কঠিন নয়। অথচ প্রাচীন-প্রাচ্য কখনোই যৌন-অবদমনের পীড়ন অনুভব করেনি। তার নিজস্ব একটি স্যাক্সুয়াল-ফিলসফি ছিল, আছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের তাতে মন ভরে না। তারা বরাবরের মতো তাদের আগ্রাসী বোধ থেকে আমাদেরকে জ্ঞান দেয়। আমরা যেন তা গ্রহণ করি। তারা বলে, তোমরা এখনও সোসাল-এনিমেল হয়ে উঠতে পারোনি। দেখো আমরা এভাবে এভাবে সেক্স করি, একে বলে উদ্দামতা, একে বলে অর্গাজম আর এইভাবে নারী শরীরকে ছুঁলে তাতে সম-অধিকার বিঘ্নিত হয় না। এর ফলাফল ধরে উঠে আসে আর এক ডব্লিউ ডব্লিউ এফ চ্যাম্পিয়ন– জেন্ডার ইস্যু। কিন্তু তাদের বেঁধে দেয়া বেঞ্চমার্কে আমাদেরকে উৎরাতে হবে কেন? আর এইসব, সকল বঞ্চনার পেছনে যে অর্থনৈতিক অসাযুজ্য; তার কথা তুললেই ওরা তখন একরবে বলতে থাকেন রাজনৈতিক অব্যবস্থা ও অদূরদর্শিতার কথা। ফলত গুড গভর্নেন্স আমাদের পথ দেখাবে এই মনে করে কত কত বাকোয়াজের পাখোয়াজই-না আমাদের কানের কাছে বাজানো হচ্ছে।

কেমন করে এমন একটি ভিশাস-সার্কেলে যুক্ত হলাম আমরা তা খুঁজতে গেলে দেখা যাবে সমাজের স্তরে স্তরে সুপার শপের মতো সাজিয়ে রাখা আছে দমন-অবদমন আর ভোগের নামে আসক্তির যাবতীয় অনুপান যা একটি বৈষম্যময় বিজাতীয় সমাজসূচনার জন্য কেবল উপযুক্তই নয় অনিবার্য উপকরণও বটে। এবং চোখ থাকলে দেখা যাবে চোরে চোরে মাসতুতো ভাইয়ের মতো যতগুলো রাষ্ট্রীয় সংস্থা ক্রিয়াশীল তারা ঐ চরকায় রীতিমতো তেল দিয়ে যাচ্ছেন এবং নিয়মমাফিক দেখভাল করছেন যাতে তা ক্রমাগত আরও শক্তিসঞ্চয় করে গর্দানে-গতরে দেখনসই হতে পারে। এবং এভাবেই ভোগ-বঞ্চনার বিপরীতমুখী দুই স্রোতে আমাদের নিজস্বতা ভেসে যাচ্ছে আর ভিজুয়ান একুইটির ভেতরে কাঠের পুতুলের মতো খাড়া করা হচ্ছে কিছু চিহ্নিত শত্রুমণ্ডলী। যারা প্রতিরোধ পেলে ছায়াবাজির মতোই মিলিয়ে যেতে সক্ষম। কিন্তু আসল গডফাদার[৭] ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। এভাবে ধাঁধায় ফেলে দেয়া বহু প্রাচীন একটি স্ট্যান্ট, যা বর্তমানে আমাদের নিজেদেরকেই হাত পা বেঁধে কুয়োয় ফেলে দেবার অবস্থা করেছে। আর আমরা তলিয়ে যাচ্ছি নিচে আর যেতে যেতে ভাবছি আমার সমাজে আমার কালচারের এই এই দিকগুলো সেকেলে হলেও তা আমার মেনে চলা উচিত কেননা তা এইভাবে নিজস্ব কৃষ্টি ধরে রাখতে সহায়তা দেবে। এবং পাশ্চাত্যের এই এই ভালো ভালো বিষয়গুলো আমার সংস্কৃতিতে অবশ্যই অবশ্যই আনতে হবে কেননা তা রপ্ত করতে পারলে সবাই আমাদের আধুনিক জাতি হিসেবে মেনে নেবে...

আমার কিছু দার্শনিক-কাম-বন্ধু রয়েছে যাদের কাছে মাঝে মাঝে তত্ত্বে টান পড়লে আমি তালাশ করি। তাঁদের মতে– অবদমন এক প্রকার ক্ষুধা, যার চরম প্রশমন অবাস্তব বলে সতত চলমান। এই তৃতীয় বিশ্বের[৮] দেশে বসে অবদমনের অবদান নিয়ে বাক্যব্যয় করাটাই এক সেন্সে লোকসান। কারণ ঢাকায় বসে পাত্তায়া বা বালির বীচের বিকিনির আস্ফালন নির্ঘাৎ ব্যাকফায়ার ঘটাবে চলমান জীবনে। মন আর মাথার কৈবল্য (বৈকল্য?) ঘটে যাবে। তবে এ কথাও ঠিক যে হিউম্যান ব্রেইন এমনভাবে প্রোগ্রামড্, যার কারণে চরম অপ্রাপ্তিকেও সে কোনো না কোনোভাবে ম্যানেজ করে নেয়। আর করে নেয় বলেই আমরা ক্রমাগত সংখ্যাটা বাড়িয়ে চলেছি: এই সেদিন শুনছিলাম বারো কোটি; তারপর সাড়ে তের কোটি, চৌদ্দ কোটি, এখন শুনছি পনের কোটির কিছু বেশি, সঠিক সংখ্যাটা চালের দামের মতো ব্যস্তানুপাতিক নয়তো!

ঙ.

এ্যায়সি আসানি নেহী হ্যায়রে মাগী...

আমার কৌতূহল ছিল একালের নিউ জেনারেশন অবদমনকে কিভাবে দেখে, কী ভাবে অবদমন বিষয়ে– তারা তো নেটিজেন। প্রত্যেকেরই হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইস আর ফেসবুক আছে। বেলবটমের সহোদর কাটিংয়ের রাস্তা-ঝাড়ু-দেয়া জিন্স আর যেনতেনপ্রকারেণ শট-ঢোলা টি-শার্ট চড়ানো মায়াময় দুটো চোখ আর চিবুকের কাছে এক চিলতে দাড়ির

বাহানায় তাদেরকে নগর বাউল বলেই মনে হয়। গোড়ালি ছুঁই ছুঁই যে ল্যাগব্যাগ আনইস্প্রেসিভ ঝোলাটা সবসময় ওদের কাঁধে ঝুলে থাকে আমার রহস্য লাগে দেখতে ওর ভেতরে কী রাখে ওরা, কোন স্বপ্ন ফেরি করে বেড়ায় নিয়ত! তো এদের কিছু স্যাম্পলের সাথে বাতচিত করে বোঝা গেলো, মুক্তিযুদ্ধকে তারা ৯০-এর পর থেকে বিবেচনা করতে চায়। তাদের কাছে একটি স্বাধীন দেশ পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই স্বাধীনতার বিরোধিতাকারীরা ঘৃণিত কিন্তু শেখ মুজিবের হত্যাকাপোঁছাতে উৎরাতে তারা নিয়তই ব্যস্ত। এবং কী ভীষণ পরিমাণে তারা ব্যস্ত সবকিছু *ডাউনলোড*[৯] করতে! ব্যতিক্রম হয়তো আছে। তবে তা সংখ্যায় সামান্য। অথচ কী বিপুল প্রাণশক্তি, তাকে যদি আত্মঅন্বেষণের দিকে প্রবাহিত করা যেত...

চ.

শটগান দিয়ে তুমি চাঁদ পেড়ে ফেলো নার্সিসাস...

মাঝে মাঝে আমি ওভারব্রিজের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষ দেখি। মানুষের চরম অসহযোগের ভেতর যুক্ত হবার প্রচেষ্টা দেখি। এবং দেখি ম্যানিকিন মেয়েরা সাজুগুজু করে গুটি গুটি পায়ে ভীষণ অর্থবহ ইশারায় নিষ্পাপ-সরলতার পরাকাষ্ঠা হয়ে ত্রস্ত হেঁটে যায়। যেন আতঙ্কিত; না জানি কার ভয়ে ক্রমাগত তারা কেবল পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ছুটে যাচ্ছে জীবনে যা ঘটে চলেছে তার থেকে মুখ সরিয়ে হয়তো বাস্তবকে অস্বীকার করে অবাস্তব *পিওরিটির* দিকে। মনে হয় কে যেনো তাদের কাছে মন্ত্রণা দিয়েছে– তুমি ভেবো না, তুমি দেখো না, তুমি জেনো না যে, তুমি আরও বেশি কিছু জানতে দেখতে ভাবতে পারতে। বরং এই ভণ্ড নিষ্পাপের, সৌন্দর্যের শিরোপা তোমায় দিলাম। তুমি তাতে আপাদমস্তক ঢেকে চলো ভালো মেয়ে! সবকিছু এমন করে ঢাকো যেন বোঝা না যায় তোমার ভেতরে নারীত্ব উঠেছে।

- আসলে কাকে বলে ভালো মেয়ে?

শেষ সংকেত

যা লেখা প্রয়োজন ছিল অথচ লেখার পরে নিজেই ভেতর থেকে বেছে বেছে শব্দগুলো পাল্টে দিলাম, পুরো লাইন প্যারা অব্দি ডিলিট করে দিলাম যেটুকু পড়তে বা পড়াতে সাহসে কুলোবে না ভেবে, আসলে হয়তো তাই-ই অবদমন।

টীকা

১. এই লেখাটি মক্‌সো করি গত ডিসেম্বরে, সেই সময়কার কতিপয় এডভাইজর ছারদের কথা কল্পনায় রেখেই!

২. দর্শকশ্রোতা, আমি দশ বলছি, সংখ্যাটা বিশ, ত্রিশ যা খুশি আপনি বসিয়ে নিতে পারেন, সময় বিশেষে

[৩.] এই স্যাট-টেক-ইনফোর ভিজুয়াল দুনিয়ায় সঙ্গীতও যেহেতু দর্শিত হয় এবং ভিজিবিলিটিই একমাত্র মোক্ষ বলে ধরেই নিচ্ছি আপনি পাঠ করছেন না– দেখছেন।

৪. এখানে এসেই আপনার চোখ আড়চোখে এই প্রবন্ধ রচয়িতার নামের উপর চলে গেল। যাবেই। আর আপনি যা গেস করেছেন ঠিক তাই: লেখক মনে হয় অযথা খুঁচিয়ে দেশে বিরাজমান সম্প্রতিতে চিড় ধরাচ্ছে। শালা মালু! ...বস্তুত এই শব্দটি জ্ঞান হবার পর কিংবা তার আগে থেকেই এত শুনেছি এবং এতভাবে কু-ব্যবহৃত (এ্যাবিউজড?) হয়েছি এই শব্দটির পীড়নে যে মা ডাকের চেয়েও বড় আপন মনে হয় মাঝেমাঝে। কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করুন একাত্তরে সর্বস্ব লুট হয়ে যাবার পর এগারো দিন পায়ে হেঁটে শরণার্থী শিবিরে নয়মাস কাটিয়ে কিসের আহ্বানে আমার পিতামাতাকুল নতুন একটি ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের দেশে ফিরে এল? আর কিসের কারণে আমিই-বা গভীর রাতে ভলভো বাসের শেষ যাত্রীর মতো সংখ্যালঘু হয়ে এখনো সিট কামড়ে পড়ে আছি? ...খেয়াল করেছেন, 'লঘু' অক্ষরগুলো পুরো ইস্যুটাকেই কেমন লঘু করে রেখেছে?

[৫.] চালের দাম হয়তো আরো বাড়বে ভবিষ্যতে। সেই সময়ে এই লেখাটি পড়তে বসে আমাকে আবার 'সেকেলে' বলে গালি দেবেন না যেন!

[৬.] বলেন তো, শূন্যস্থানে কোন্ অক্ষরটি মোক্ষম?

[৭.] শব্দটিকে সাম্প্রতিক অনুষঙ্গের সাথে মিলিয়ে ফেলবেন না প্লিজ!

[৮.] দেখেছেন, পকেটে পাত্তির জোরে ওরা কেমন পৃথিবীটাকেই গ্রেড করে পৃথক করে ভিন্নভাবে আলাদা করে ফেলেছে?

[৯.] মাঝ বরাবর চাড় দিয়ে শব্দটি দুই খণ্ড করে ফেললে দেখবেন কি কুৎসিত নঞার্থক শব্দধাতু রয়েছে ভেতরে।

ভিডিও চলচ্চিত্র ‘ব্ল্যাকআউট’ ও কিছু অবদমন দৃশ্য

টো ক ন ঠা কু র

‘ব্ল্যা’কআউট’ আমার প্রথম ভিডিও ছবি। দৈর্ঘ্য ৯৭ মিনিট। এই ছবির প্রধান দুই চরিত্র রাফি ও মাদল। রাফি তরুণ চিত্রশিল্পী, মাদল তরুণ কবি। দুজনে থাকে নগরীর এক চিলেকোঠার দুই রুমের ভাড়া বাসায়।

রাফি ও মাদল রাতে এক বিছানায় ঘুমায়। তারা বন্ধু। পরস্পরের প্রতি দারুণভাবে সহমর্মী। কারণ সম্ভবত এই হতে পারে যে, তারা দুজনেই একা একা...। যদিও, দৃশ্যত, ‘ব্ল্যাকআউট’ ছবিতে দেখা যায়, রাফি একটা প্রেমিকাসুলভ বালিকা জুটিয়ে নিয়েছে, যার নাম মিটি, তবু শেষপর্যন্ত রাফি কি বালিকা মিটিকে যাকে বলে পাওয়া, তা পেয়েছে? পায়নি। পাওয়া যেহেতু প্রাণের ধর্ম, তাই পাবার অধিকার অনিবার্য, তবু রাফি মিটিকে না পায় শারীরিকতায়, না পায় শরীরহেতু অন্যান্যতায়। এই পাওয়ার প্রত্যাশা ও না পাওয়ার চাপে মন-শরীর অবদমনে কাবু হতে থাকে। ক্ষুব্ধ হতে থাকে। এক কথায়, যৌন অবদমনের শিকার এই হতভাগ্য বাংলার প্রায় যাবতীয় যুবকদের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব পড়ে রাফিরূপী তানভীর হাসানের ওপর। বলে রাখা দরকার, বাংলার যুবতীগণও কম অবদমিত নয়। যা হোক অবদমনের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ব্ল্যাকআউট-এর অন্য চরিত্র মাদলও থমকে থাকে পুরো ছবি জুড়ে। রাফি তবু মিটিকে কিছুটা বা দৃশ্যত পায়, এদিক-সেদিক যায়, একটা প্রেম-প্রেম অনুভূতির মধ্যে নিজেকে চারিত করতে পারে, কিন্তু মাদলের যেন তা-ও নেই। মেমোরিতে তার আছে এক নারী– শাল্মলি। পুষ্পাবৃত ফাঁকা মাঠের মধ্যে শুয়ে আছে সেই নারী। মাদল তাকে চুমু খেতে চায়। ঝুঁকে পড়ে চুমুও খায়।

কিন্তু আমরা দেখি মাদল রাতের বিছানায় শুয়ে চুমু খেতে গিয়ে প্রায় রাফির মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ছে। রাফি রিঅ্যাক্ট করে, বলে, ‘কী করিস, স্টুপিড’! মাদল যেহেতু কবি, সে একটু কবিয়ালি করে এই যাত্রা পার পেতে চায়, বলে, ‘যা এথু চাহমি, সো এথু নাহি’– রবীন্দ্রনাথ যাকে অনুবাদ করে বলেছেন, ‘যা চায় ভুল করে চায়...’। সর্বোপরি মাদল চিলেকোঠার ছাদে ও রেলিঙে দাঁড়িয়ে পাশের ভবনের গ্রিলের ফাঁকে দাঁড়ানো এক শিশু-কিশোরীকে নিজের নিঃসঙ্গতাহেতু নানা প্রকার আকার-ইঙ্গিত ছুঁড়ে দেয়। অবদমনের এই প্রকাশ ছাড়াও মাদল মদের খালি বোতলের মধ্যে নির্জনে

শুয়ে বারবার হাতের আঙুল ঢোকায় আর বের করে। এই দৃশ্য নিশ্চয়ই নি:ঙ্গতার এমন এক স্তর, যেখান থেকে দেখলে, আমাদের যে-কেউ-ই কখনো-না-কখনো যার যার মতো এ ধরনের বা অন্যধরনের অবদমন করে থাকব, হয়তো বা যার সঙ্গে এ-দৃশ্য মিলে যায়। এছাড়াও, ব্ল্যাকআউট-এ মাস্টারবেসান দেখানো হয়েছে আরো দুই বার। একটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছে তাস উড়ে যাওয়া চিত্রকল্প। তাসের মধ্যেও অবদমন প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে।

কিংবা ছবিটির শুরুতেই যে দেখা যায়, একটি আঁকানো ঘোড়া টগবগ করে ছুটে এল এবং ছবির শেষে সেই ঘোড়া পাহাড়ি উপত্যকা বেয়ে জোসনা-চরাচর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত, তারপর এগিয়ে আসে আস্তাবলে। কেন?

একটি আপেল নানামাত্রায় ছোট-বড় হয়, ছুটে আসে ছুটে যায়, ব্ল্যাকআউট-এর মধ্যে। কেন?

বাথরুমে স্নানে গেলে মাস্টারবেশন দেখানো হল দুই বার। কেন?

ক্যানভাসে রাফি এঁকেছে বা লিখেছে, 'মিটি, তুমি ল্যুভর মিউজিয়াম।' তখন রাফির মুখ, নারীর সম্পূর্ণ লাল। কেন?

দুই বন্ধু গাঁজা সিগারেটে পুরে টানে, অনেক চিত্রকর্ম, ন্যুড ফটোগ্রাফি, আঁকানো ফিগার ইত্যাদি কোলাজ নৃত্যের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে এই ভিডিও ছবিতে। কেন?

এই রকম কিছু কেন'র নেপথ্যে রয়েছে দুই চরিত্রের নিঃসঙ্গতা, নারীসঙ্গ বঞ্চনা, ক্রোধ, ক্ষোভ, অবদমন এবং এতকিছুর পরেও লুকিয়ে স্বপ্ন দেখার বাসনা।
শেষ পর্যন্ত, ব্ল্যাকআউট হচ্ছে দুই বন্ধুর অসীমাংসিত রজনীর গল্প। এই অমীমাংসা যৌবন পর্যন্ত।

ব্ল্যাকআউট
৯৭ মি. ২০০৬

অভিনয় তানভীর হাসান, রাহুল আনন্দ, তিনা, সারা, কফিল আহমেদ, ধ্রুব এষ,
বর্ষা বিভাবরী, বাপ্পি আশরাফ, বেলায়েত হোসেন, মডেল দাদু, লাবু মিয়া,
রাজীব আশরাফ, আবদুল হালিম, চঞ্চল, বিমল বাউল, লাভবার্ড, নিহত
কয়েকজন ফড়িঙ প্রমুখ।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা টোকন ঠাকুর
চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা সামির আহমেদ
শব্দ ও সঙ্গীত অর্ণব
আর্ট-গ্রাফিক্স আবদুল হালিম চঞ্চল
স্থিরচিত্র রিচার্ড রোজারিও

এনিমেশন চিন্ময় দেবর্ষি
কবিতা রণজিৎ দাস
গান কফিল আহমেদ, অর্ণব, ডন ম্যাকলিন, আশিক হাসান ইস্কান্দারি,
বিমল বাউল।
প্রযোজনা আস্তাবল (STABLE)

কবি, চিত্রশিল্পী, চলচ্চিত্র নির্মাতা, ঢাকা।

অবদমন: প্রথা ও সংস্কারের জাল

আ নো য়া র হা সা ন

আভিধানিক অর্থে দমন শব্দটি বলতে বোঝায় দণ্ড দেওয়া, শাস্তিদান, শাসন, সংযম, নিবারণ ইত্যাদি। তেমনি অবদমন– মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা বাসনা দমন। কাজেই দমন-অবদমন শব্দবন্ধটি আমাদের চেতনায় একটা অপ্রীতিকর ভাব-চেতনা জাগিয়ে তোলে। মানুষের তৈরি এই অভিধাটির রয়েছে ইতিহাস-পরম্পরা। সময়ের পরিবর্তনের সাথে মানুষের ভেদ-বুদ্ধি ও জীবন-মান জটিলতর হতে শুরু করে। সেই সাথে মানুষের অসহায়ত্বও বাড়ে। মানুষ যখন প্রকৃতির রাজ্যে ছিল তখনও অসহায় ছিল। তখন তার অসহায়তা ছিল বিশাল প্রকৃতির কাছে। কিন্তু মানুষে মানুষে ছিল স্বাধীনতা এবং সাম্যের সম্পর্ক। মানুষ সম্মিলিতভাবে প্রকৃতির নানা প্রতিকূলতার মোকাবেলা করেছে, সংগ্রাম করেছে। তখনও লড়াই সংগ্রাম করেই খাদ্য আহরণ করতে হয়েছে মানুষকে। তবে সেই আহরিত খাদ্য সমান অধিকারের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে।

আজকে আমরা যাকে 'ভাগ্য' বলি তাও তো সেই 'ভাগ' শব্দটি থেকেই উদ্‌গত। যা শ্রমের সাথে সম্পর্কিত ছিল। অথচ সেই ভাগ্যের চেতনা এখন অন্যরকম হয়ে গেছে। ঐ সমাজ ছিল মূলত সাম্যবাদী সমাজ। খাদ্যবস্তু সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে আহরিত হতো। শিকারে সকলকে অংশগ্রহণ করতে হতো। অর্থাৎ শ্রমের প্রশ্নে

প্রত্যেকের অংশগ্রহণ ছিল অনিবার্য। অবশ্য তখন খাদ্য আহরণের কৌশল এমন আদিম অবস্থায় ছিল যে, বহু ব্যক্তির সমন্বয় ব্যতীত গোটা শিকার কার্যক্রম সফল করা সম্ভব ছিল না। আর এক ব্যক্তির পক্ষে যেখানে একজনের খাদ্য সংগ্রহই ছিল কঠিন, সেখানে উদ্বৃত্ত থাকা তো কল্পনা মাত্র। কিন্তু ক্রমে হাতিয়ারের উন্নতির সাথে সাথে ব্যক্তির স্থান দখল করে নিল হাতিয়ার। ফলে সৃষ্টি হয় উদ্বৃত্ত। আর সম্পদের উদ্বৃত্ত সৃষ্টির সাথে সাথেই মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদের সৃষ্টির হল, আর এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টির সাথে সাথে মানুষ আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে বেরিয়ে এল। উৎপাদন পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে মানুষের সমাজে সৃষ্টি হল স্তরবিভক্তি। এভাবে মানুষের মাঝে শ্রেণী তৈরি হল। তৈরি হল শ্রেণীশোষণ। আর শোষণ এবং শাসনের প্রয়োজনে সমাজ ধীরে ধীরে নানা সংস্কার এবং প্রথার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে গেল। শুরু হল মানুষ কর্তৃক মানুষের ওপর দমন-অবদমন। সমাজ সংগঠনের প্রথম ধাপ পরিবার, এরপর সমাজ। পরিবার এবং সমাজ চলে সংস্কার এবং প্রথার মাধ্যমে। নানা কু- সংস্কার এবং প্রথা পরিবারকে যেমন গ্রাস করে আছে তেমনি সমাজকেও। পরিবারে পুরুষপ্রাধান্য একটি বদ্ধমূল সংস্কার। এই সংস্কার অনুযায়ী নারী অধঃস্তন। কাজেই পুরুষ কর্তৃক নারী নানাভাবে দমনের শিকার হয়। গ্রামীণ পরিবারে এর মাত্রা ভয়ানক। তারা স্বামীর নাম মুখে আনে না। এমনকি ভাসুরের নামও না। আমি এক পরিবারের কথা জানি, ঐ পরিবারে কোনো নারী 'সাবান' কথাটি মুখে আনে না। তারা সাবানকে ফেনা বলে। কারণ ঐ পরিবারের বড় কর্তার নাম ছিল সাবান আলী। লোকটি অনেক আগেই মারা গেছেন, কিন্তু বংশ-পরম্পরায় সাবান তাদের কাছে ফেনা হিসাবেই পরিচিত। পুরুষ কর্তৃক নারীকে দমনের এর চেয়ে জঘন্য উদাহরণ–সম্ভবত আর হতে পারে না।

প্রথা অনুসারে বাবা পরিবারে কর্তা। এমনকি সন্তান-সন্ততির ওপর তার অধিকার ষোল আনা। ফলে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক গোটা পরিবার তার স্বেচ্ছাচারিতাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। পরিবারে এই পুরুষতান্ত্রিক আবহের দরুণ শিশু এবং নারী অবদমনের শিকার হয় বেশি। একটি শিশুর মানস-গঠনে অবদমন যে কত ভয়ঙ্কর তা বলাই বাহুল্য। শিশুকে অবশ্যই বাধাহীনভাবে বাড়তে দিতে হয়, তবেই সে সমস্ত শক্তি নিয়ে গড়ে উঠতে পারে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, কাজেই ব্যক্তি পরিবারের হয়েও সমাজের বাসিন্দা। আর এই সমাজও নানান সংস্কার ও প্রথাজালে আবদ্ধ। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের মনুষ্যসমাজ তো কুসংস্কার এবং কুপ্রথার আখড়া। জাত-পাত, বর্ণবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, ফতোয়া ইত্যাদি দ্বারা ব্যক্তি অহরহ নির্যাতিত হয়ে চলছে। এখানেও নানাবিধ কুসংস্কার সবচেয়ে বেশি শিকার নারী। সমাজে কেবল নারীকে দমন করার উদ্দেশ্যেই যুগের পর যুগ ধরে নানান সংস্কার সংরক্ষণ করা হচ্ছে। 'লজ্জাই নারীর ভূষণ' এই প্রবাদটি নারী দমনের একটি যুৎসই অস্ত্র বলেই আমার কাছে প্রতীয়মান হয়। লজ্জা নারীর ভূষণ নয় বরং আত্মঘাতী আয়ুধ। এই লজ্জার জন্যই নারী পরিবার থেকে কিংবা সমাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখে সর্বক্ষণ। সেজন্য তার ভেতর গতি শক্তির স্ফুরণ ঘটে সামান্যই। শুধু তৃণমূল সমাজেই নারী নিগৃহীত নয়, সে শিক্ষিত সমাজেও নির্যাতিত। চাকরিজীবি নারীর যে কত সমস্যা এর কোনো হিসেব নেই।

পর্দাপ্রথা , যৌতুকপ্রথা, পরপুরুষসংশ্রবে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সন্দেহ ইত্যাদি নানাভাবে স্ত্রী দমন-পীড়নের শিকার। অবদমন যে কেবল শিশু এবং নারীর ক্ষেত্রে ঘটে তা নয়। সর্বস্তরের মানুষ এ ব্যাধিতে কম-বেশি সংক্রমিত। মানুষ জন্মসূত্রে অপরাধপ্রবণ নয়, বরং সমাজ-সংসারের নানা নিয়মশৃংখলের অবদমনের ফলে তার ইচ্ছাগুলোকে চেপে রাখতে গিয়ে, একসময় সে শিকারগ্রস্ত হয় কিংবা অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। কাজেই বিভিন্ন সামাজিক অনুশাসন এ ধরনের অবদমনের জন্য দায়ী।

সমাজে সবল কর্তৃক দুর্বলদের ওপর দমন তো নিয়তি-নির্ধারিত। আশরাফ-আতরাফ, বড়লোক-ছোটলোক ইত্যাদি কল্পিত বিভাজন সমাজে দুরারোগ্য ব্যাধি। এধরনের বিভাজনের মধ্য দিয়েই ক্ষমতাবানেরা ক্ষমতাহীনদের চিরদিন শাসন-শোষণ করে আসছে। সমাজের ক্ষমতাবানরা ধর্মকে নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করে ক্ষমতাহীনদের দমন-পীড়ন করে থাকে। এ আরেক ভয়ানক সংকট। মানুষ কোনো-না- কোনো একটা ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। এই বিশ্বাসের কাছে সে দুর্বল। এই সুযোগটাকে ক্ষমতাবানরা তাদের পক্ষে ব্যবহার করে সমাজে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সর্বক্ষণ ব্যাপ্রিত থাকে। এক অর্থে সংস্কার থেকেই সংস্কৃতি। আর সংস্কৃতি হল সভ্যতার বাহন। 'সভ্যতার সংঘাত' নামে বর্তমানে পাশ্চাত্যের যে হিংসাত্মক তত্ত্ব বিশ্বসমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিয়েছে, এর মূল কথা হল পাশ্চাত্যের সবকিছুই ভালো, সুতরাং পৃথিবীকে শাসন করার অধিকার কেবল তাদেরই। কত ভয়ানক কথা! সাংস্কৃতিক দমন যে কেবল সভ্যতার সাথে সভ্যতার সংঘাত হিসেবেই ফলে এমন নয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, পরিবারে পরিবারে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, সমাজে সমাজে এর প্রভাব সমানভাবে। যেমন– কোনো ব্যক্তি তার বাহারি পোশাক বা নিদেনপক্ষে একটা দামী পারফিউম ব্যবহার করেও অন্যের কাছে নিজেকে অসাধারণ প্রমাণের মাধ্যমে এক ধরনের সূক্ষ্ম দমনপ্রক্রিয়া চালাতে পারে। এরকমভাবে মানুষ তার পরিবারকে নিয়ে অহঙ্কার করে। গোষ্ঠী বা বংশেরও অহঙ্কার করে। সে জন্যে মানুষ তার নামের সাথে বিভিন্ন খেতাব টাইটেল সংযুক্ত করে রাখে। যেমন– তালুকদার, চৌধুরী,খান, পাঠান, সৈয়দ, চক্রবর্তী, ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি ইত্যাদি নানা কিশিমের টাইটেল। তেমনি আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার যে আইন রয়েছে তাও তো সমকালীন ও সংশ্লিষ্ট সমাজের নানা সংস্কার ও প্রথার ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রাচীন ব্যবিলনীয় আইন (হাম্বুরাবির আইন) ও প্রাচীন রোমান আইনগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে এ সত্য অনুধাবন কোনো কঠিন বিষয় নয়। যেগুলো ছিল দাস শাসনের নামে কেবলি বিবর্তনমূলক, একতরফা।

সেই ধারাবাহিকতা এখনও চলছে, রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তির ওপর শাসন, শোষণ, এ্যাকশন, দমন-পীড়ন ইত্যাদি নানা মাত্রায় এবং নানা পদ্ধতিতে। পরিশেষে বলব দমন-অবদমন নয় বরং আমাদের বুদ্ধিকে সকল কুসংস্কার এবং কুপ্রথার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে হবে আগে। অতঃপর আমাদের সামনে বিজ্ঞান-ভিত্তিক চিন্তার পথকে সুগম করে দিতে হবে। বিশ্বাসকে নয় যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।এপথেই সর্বস্তরের মানুষের মুক্তি নিশ্চিত হতে পারে।

[লেখক: সাহিত্যপত্র সম্পাদক, কলেজ শিক্ষক, নেত্রকোণা।]

অবদমন ও একটি জাতির ভবিষ্যৎ

ফ রি দু জ্জা মা ন

অবদমন সম্পর্কে ফ্রয়েডের তত্ত্ব হল– মানুষের অবদমিত কামনা বাসনা স্বপ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মানবশিশু যখন বড় হতে থাকে তখন তার স্মৃতি ধরে রাখার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাধারণত মাতৃগর্ভের স্মৃতি বা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরের ৩/৪ বছরের স্মৃতি মানুষ ধরে রাখতে পারেনা। জাতিস্মর সম্পর্কে যে সকল গল্প শোনা যায় তার ওপর সুনির্দিষ্ট কোনো গবেষণা না হওয়ার কারণে এতদসম্পর্কিত জ্ঞানের পরিধি ব্যাপকতর নয়। তবে স্মৃতি ধরে রাখার ক্ষেত্রে অবদমনের স্মৃতি মানুষের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য।

দুই

ধরা যাক, বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় বেড়ে-ওঠা একটি মানবশিশু তার কৈশোরকালে দাদিমার হাতের তিল-পাটালি খেতে চেয়েছিল। দাদিমা হয়ত খেজুরের রস জ্বাল দিচ্ছিছিলেন। হয়ত অভাব-অনটনের সংসারে কাজের চাপে দাদিমার পক্ষে ওই কিশোরকে তিলপাটালি বানিয়ে দেয়ার ফুরসৎ ছিল না। তাই দাদিমা বলেছিল– এ গুড় ভলো নয়; অবিকল টক রসের ঝোলা। তাই অন্য একদিন দাদিমা তার অপোগণ্ড নাতিকে টলটলে খেজুরের রসের গুড় ঘুটে বেছন ঝরিয়ে সুবাসিত তিল-পাটালি বানিয়ে

দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু দাদিমার পক্ষে আর টলটলে খেজুরের রসের গুড় ঘুটে বেছন ঝরিয়ে সুবাসিত তিল-পাটালি বানিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিশোরটি এখন যৌবনউত্তীর্ণ অথচ স্বপ্নের ভেতর আজও তিল-পাটালি খোঁজে। এভাবে অবদমনের গল্পের নায়ক আমাদের অনেকেই। এই অবদমন নির্ভর এমন হাজার স্মৃতি নিয়ে আমাদের পথ চলা। কৈশোরে অবদমনের ঐ নায়কের আর একটি স্মৃতি হল খেজুর গাছের এক গাছি'র কাছে সে চুমুরের মাথি খেতে চেয়েছিল। গাছি ভাই বারে বারে তাকে ফাঁকি দিয়েছে এই বলে, সে– 'এ চুমুড় ভাল নয়; নূরার বাড়ির সেই খেজুরের গাছ ঝুড়ে এনে দেব অমৃত চুমুড়'। অমৃত চুমুড়ের গল্প গাছি ভাই কিশোরকে অনেক শুনিয়েছিল। অথচ গাছি ভাই কিশোরের আকাঙ্ক্ষিত চুমুড় আর দেয়নি। অবদমনের এই স্তরে যৌবনউত্তীর্ণ নায়কের ঘোরের মধ্যে আজও গুমড়ে কেঁদে ওঠে না-পাওয়া তার সেই চুমুড়ে বেদনা। এই দুরন্ত কিশোর এককালে মৌয়ালির পিছে ছুটত মোমসহ মধুখণ্ড পাওয়ার আশায়। মৌয়ালি তাকে বলেছিল– 'এ মধু ভালো নয়; অবিকল তালের রসের ঝোলা, সুন্দরবন থেকে এনে দেব-বিবিধ ফুল থেকে আহরিত মোমসহ মধুখণ্ড'। অথচ মৌয়ালি তাকে আর সুন্দরবন থেকে আহরিত মোমসহ মধুখণ্ড এনে দেয়নি। এমনভাবে দুরন্ত কিশোর অল্পবয়সে তার দিদির সাথে গাঁয়ের আড়ং-এ গিয়ে কাঁসার কলস (ঘোড়দৌড়ের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার) দেখার বায়না ধরেছিল। দিদি তাকে পাগলা ঘোড়ার ভয় দেখিয়ে নিবৃত্ত করেছিল। এককালের সংস্কৃতিকর্মী দিদি'র ঠিকানা আজ অসীম আকাশ। অথচ ঘোরের মধ্যে আজও সেই কিশোর এখন যে যৌবনউত্তীর্ণ, সে কাঁসার কলস দেখে।

তিন

অবদমনে পড়া এ নায়ক অস্বচ্ছল পরিবারে বেড়ে-ওঠার কারণে কৈশোরে অনেককিছু হতে বঞ্চিত হয়েছে। একটা রঙিন ঘুড়ি কেনার ইচ্ছা ছিল তার। বায়নাটা সে মার কাছে বার বার করেছেও। কিন্তু মা তার বায়না পূরণ করতে পারেনি। তবে মা বায়নার কাছাকাছি কিছু একটা দিয়ে দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। মা একটা লাল ফড়িং ধরে তার লেজে মিহি সুতা বেঁধে উড়াতে দিয়েছিলেন। অথচ ঘুড়ি উড়ানোর স্থালে ফড়িং উড়ানোর সুখ ছেলের মনে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। কারণ অল্প সময়ের মধ্যেই মিহি সুতো ছিঁড়ে ফড়িংটা উড়ে গিয়েছিল। যৌবনউত্তীর্ণ কৈশোরের স্বপ্নে রঙিন ঘুড়ি আর লাল ফড়িং এসে ধরা দেয় আজ। ধরা দেয়– সুবাসিত তিল-পাটালি, মোমসহ মধুখণ্ড, খেজুরের চুমুড়ের মাথি আর কাঁসার কলস। এই কিশোর তার ছেলেবেলা অনেক দূরে ফেলে এসেছে। তাই স্বপ্নের ভেতর রঙিন ঘুড়ি, লাল ফড়িং, সুবাসিত তিল-পাটালি, মোমসহ মধুখণ্ড, খেজুরের চুমুড়ের মাথি আর কাঁসার কলস তাকে অপরিমেয় সুখ মঙ্গল দিলেও তার মানসিক স্বাস্থ্য যে সুস্থ নয় তা সহজেই অনুমেয়।

চার

কিশোর বয়সের বায়নাগুলো মৌলিক চাহিদানির্ভর কিনা তা-ও স্পষ্ট নয়। তার এ বায়নাগুলো মৌলিক চাহিদা তথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসংশ্লিষ্ট হতেও পারে আবার না-ও হতে পারে। তবে কিশোরবয়সের বায়না মিটানোর ওপরে কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। কিশোরদের বায়নাগুলো যদি মৌলিক চাহিদানির্ভর হয় এবং সেগুলো যদি যৌক্তিকভাবে মিটানো না যায় তবে পরিণামে তা শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য উভয়কেই ব্যাহত করতে পারে। কাজেই একটা জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার উত্তরসূরীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর।

কবি, প্রকৌশলী, ঢাকা।

দিনযাপন

অমিতা চক্রবর্তী

ঠিক ন'টা বারো মিনিটে অফিসে পৌছালো রাশেদা। ইতোমধ্যে 'অফিস অ্যারাইভল শীট' চলে গেছে বস' এর রুমে। মাথা নিচু করে রাশেদা বসের রুমে ঢুকে বিনীতভাবে বলল 'স্যার' সিগনেচারটা.....'। রাগত স্বরে তিনি তাকালেন, বললেন, 'দু মিনিট আগে আসলে কী হত! ন'টা দশ পর্যন্ত টাইম, আপনার জানা নেই? আমিও তো অনেক কিছু পেরিয়েই আসি, বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আসি, কই আমার তো 'লেট' হয় না!

'স্যার এবারের মতো, প্লিজ' প্রকাশ্যে বলল রাশেদা। আসলে বলতে চাইছিল, 'স্যার' আমার কোনো প্রাইভেট কার নেই, গাড়ি পাওয়াটাই বিরাট বিড়ম্বনা, তার পর তো জ্যাম-জেলী। বলা হল যেমন– আজ সকালে আসবার সময় ভিড় বাসে হাত-ঘড়ি খোয়া গেলেও কিছু বলা হল না কাউকে, কারণ বাস থেকে নামার অনেক পরে রাশেদা টের পেল তার ঘড়ি নেই। কেবল চেপে রাখতে হল ক্ষোভটাকে। নিজের টেবিলে বসে রাশেদা কাজ করতে পারছে না আজ তিন দিন। কারণ একটাই। চেয়ারম্যান সাহেবের

অপজিশন গ্রুপের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনতে বলা হয়েছিল রাশেদাকে। তাও কি যে সে অভিযোগ! মানহানির অভিযোগ সেই সঙ্গে চাঁদাবাজির।

রাজি হয়নি রাশেদা। তার পর থেকে তাকে কর্মহীন করে রাখা হয়েছে। কিছু করার নেই রাশেদার। মৌখিকভাবে তাকে বলা হয়েছিলো 'রিজাইন' করতে। তাতেও রাজি হয়নি রাশেদা। উল্টো বলে এসেছে হয় তাকে লিখিত 'শো কজ' লেটার দেয়া হোক অথবা সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বরখাস্ত করা হোক। রাশেদা খুব ভালো করে জানে আধা-সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কোনো ননপ্রফেশনাল অভিযোগ আনার ক্ষমতা নেই। অফিসের কেউ রাশেদাকে বলেছে সাহসী, কেউ স্বেচ্ছাচারী আবার কেউ কেউ বলেছে, 'রাজি হয়ে গেলেই পারতেন। মহিলা হয়ে .....'। রাশেদা কেবল মুচকি হাসল।

কর্মহীন আটঘণ্টা অতিক্রমের পর রাশেদা বের হয় অফিস থেকে। যথারীতি ভীড় বাসে ধাক্কাধাক্কি করে বাসায় ফেরার যুদ্ধ। মাঝে মাঝে রাশেদার মনে হয় 'জীবিকার জন্য জীবন উৎসর্গের' এই যুদ্ধে সে বুদ্ধিহীন অভ্যাসবশত লেফ্‌ট্‌-রাইট করা সৈনিক। অর্থহীন কাজে দিনটা ফুরিয়ে যায়। ভাল লাগে না রাশেদার। কেবল মাস শেষের টাকাটার জন্য এই জীবনের অপচয়। বাসায় ফিরে রাশেদা চটপট গোসল সেরে নেয়। আজ তার দু'ছেলেমেয়েরই টিকা দেবার দিন। ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে ফিরে খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছে। ড্রইংরুমের সোফায় গা এলিয়ে খবরের কাজ হাতে নিয়ে দেখে প্রথম পাতার বীভৎস লাশের ছবিগুলো। 'সিডর'–তাণ্ডব। পত্রিকাটা মুখের সামনে তুলে ধরতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে নিচে পড়ল চার পাতার রঙিন ট্যাবলয়েড– তারকা বিষয়ক। রাশেদার এমন অদ্ভুত অনুভূতি হয় খবরের কাগজের এইসব ভারসাম্যহীনতায়! দেশের হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর খবর, লাশের বীভৎস ছবি দেখার পর চিত্রতারকার 'পোজ' দেখে ছবি দেখলে সুস্থ মস্তিষ্ক কী করে থাকে মানুষের! ভালোলাগে না রাশেদার।

পত্রিকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভাবে, এর পরের রুচিমাফিক কাজগুলোর কথা। ডাক্তার– রাতের রান্না সবশেষে স্বামীর সাথে রাতের সহবাস। কী অদ্ভুত জীবন! কী অদ্ভুত অবদমন নিজের কাছে নিজের। যেন পুরনো ঢাকায় এই সময়কার বাড়িগুলো– ঘর থেকে বেরিয়েই রাস্তা। কোনো উঠোন নেই, নেই কোনো খোলা বারান্দা। নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলার, নিজের মতন অলস সময় কাটানোর কোনো সময় নেই রাশেদার। কেবল মনে পড়ে রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সেই কবিতাটির কথা, 'নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আর আকাশ দেখা হয় না'।

লেখক, সংগঠক , ঢাকা।

অবদমন ও আমরা

ই য়া সি র আ জি জ

অবদমন বিষয়টি মানুষের জন্মগত না হলেও এটি একেবারে শিশুকাল থেকে মানুষের সঙ্গী হয়ে পড়ে। শিশু তার বেড়ে ওঠার সময় থেকে এটা করা উচিৎ, এটা কোরো না– এ ধরনের আদেশ-নিষেধের মধ্য দিয়ে করণীয় শেখে। কিন্তু এরপরও অনেক কিছুই তাকে আকৃষ্ট করতে পারে। সে যে-সমস্ত বস্তুর কাছাকাছি হয় এবং পারিপার্শ্বিকতা হেতু সংগত কারণেই বুঝে ফেলে সেসবের কিছু কিছু সর্বদাই তার নাগালের বাইরে। তখন সে এসব বস্তুকে আকাঙ্ক্ষা করা থেকে মনকে বিরত রাখতে চায়। স্বভাবতই মনকে বিকল্প বিষয়ের দিকে ধাবিত করতে হয় কিংবা উল্লিখিত বিষয়টি মন থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে হয়। এভাবে প্রায়শ অবদমনের ঘটনা ঘটে।

শৈশব কৈশোরে এরকম অসংখ্য অবদমনের ঘটনা ব্যক্তির মানসিক গঠনকে প্রভাবিত করে। আমরা যদি একজন হতাশাগ্রস্ত মানুষকে তার ব্যর্থতার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি সে হয়তো বলবে তার দুর্ভাগ্যের কথা। কিংবা হয়তো বলবে যে সে এরকমই দুর্বল যে-কারণে সে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অক্ষম। এভাবে আমরা বহু লোককে দেখতে পাই যারা খুব সীমিত পরিসরে জীবন যাপন করে। তারা জীবনের রঙ-রূপ-হাসি-আনন্দ থেকে বঞ্চিত কালো ছায়ার মানুষের মতো কোনোভাবে জীবনটা পার করে দেওয়ার ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। সুখ, ঐশ্বর্য কিংবা সম্মানের জন্য এক সময় যারা হাত বাড়িয়েছিল কিন্তু মেলেনি, অন্যদিকে যারা সে-সমস্ত কিছু পেয়ে গরীয়ান, সমাজের যারা কিছু হয়েছেন – এই ধরনের মানুষের মধ্যে এক বিভেদরেখা স্পষ্ট। অবদমিত হতে হতে অনেকেই ভুলে যায় কাঙ্ক্ষিত উচ্চতায় ওঠার সম্ভাবনার কথা। আর সেই অবদমনের ক্ষেত্রটি বিশাল। মানুষের শিক্ষণ প্রক্রিয়ার ভেতর অঙ্গাঙ্গীভাবে অবদমন রয়েছে। সাঁতার না জানলে পানিতে ডুবে মানুষ মারা যায়– এই জ্ঞান হওয়ার আগে পুকুর বা নদীতে নামার ক্ষেত্রে অবদমন থাকে না। আবার দক্ষ সাঁতারু ব্যতীত খরস্রোতা নদীতে সাঁতার কাটা অথবা নদী পেরুনো সম্ভব নয়– এই জ্ঞান লাভের মধ্যে অবদমনের বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়। সাঁতারে পারদর্শী হতে না পারলেও কোনো ব্যক্তি নদীর তীরে বেড়ানো কিংবা নৌকায় ভ্রমণের মধ্যে আনন্দ খুঁজে নিতে পারে। এভাবে এক বিষয়ে অবদমন অন্য বিষয়ের দিকে আগ্রহ বা আকর্ষণ তৈরিতে ভূমিকা রাখে। লিঙ্গ ভেদে অবদমনের ঘটনা অহরহ ঘটে। জোছনারাতে মাঠে একজন তরুণের পক্ষে একা ঘুরে বেড়ানো সহজ কিন্তু একজন তরুণীর পক্ষে সহজ নয়। সে-কারণে জোছনারাত কিংবা চাঁদের সঙ্গে সখ্য অথবা এ ব্যাপারে উচ্ছ্বাস প্রকাশের ধরন একজন

নারীর অবশ্যই আলাদা। একজন কিশোরী বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীর সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং পোশাক দ্বারা শরীর আবৃত রাখার বাধ্যবাধকতাগুলো শেখে। একই সঙ্গে সে শিখতে থাকে গোপন আচরণ এবং প্রকাশ্য আচরণ। একটি মেয়ে যেভাবে একাকী বদ্ধঘরে শারীরিক বৃদ্ধিকে দেখবে একটি ছেলে সেভাবে দেখবে না। একজন পুরুষের জন্য খোলা প্রকৃতি অবারিত হলেও একজন নারীর কাছে তা বিপদসংকুল মনে হতে পারে।

সামাজিক অবস্থানের কারণে মানুষ তার অধিকার ও প্রাপ্তির মধ্যে নিয়ত অবদমন প্রত্যক্ষ করতে পারে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন মানুষ অনেক সময়ই সেরকম উচ্চস্বর হতে পারে না এবং নিরাপত্তাহীনতাবোধ তার মধ্যে কাজ করে। একজন ধনীর সন্তান এবং একজন গরিবের সন্তান একই স্কুলে পড়া সত্ত্বেও কিংবা কাছাকাছি বাস করা সত্ত্বেও নানাবিধ পার্থক্য স্পষ্ট দেখতে পাওয়া পায়। এসব ক্ষেত্রে পূর্বসংস্কার খুব বেশি ক্রিয়াশীল থাকে এবং সহজ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার অনেক রকম অন্ত রায় দেখা দেয়। অবদমন মনের গভীর স্তরে তার কাজ রেখে যায় এবং যা আমরা বিস্মৃতি হিসাবে ভাবি কিংবা মনে করি যেসব বিষয়ে আমাদের আদৌ কোনো উৎসাহ নেই– সেসব ব্যাপারেও কিন্তু মনের গভীর স্তরে এক ধরনের নিস্পত্তি অপেক্ষা করে। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড যৌনতা বিষয়ে মানুষের অচেতন মনের গূঢ় বাসনার কথা বলেছেন। তাঁর মতে শিশু তার মায়ের প্রতি যৌন অভিলাষ পোষণ করে এবং একই সঙ্গে পিতা যে মাকে দখল করে রেখেছে এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করে পিতাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে । তবে আচরণ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ফ্রয়েড যে রকম একরৈখিকভাবে শুধুমাত্র যৌনতাকেই বিবেচনায় এনেছেন, সেরকম না হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি দেখা যায়। বরং বলা যায় এটি একটি বহুমাত্রিক ব্যাপার। মন নানা সময়ে নানা বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট থাকে। শুধুমাত্র খাওয়ার বিষয় দিয়ে অথবা শুধুমাত্র যৌনতার অবদমন দিয়ে শিশুর মনস্তত্ত্বকে বিচার করা যুক্তিসংগত নয়। খেলাধুলা, চিত্রাংকন, পড়ালেখা, বিনোদন সমবয়সীদের সঙ্গে নিত্যদিনের আচরণ এমনকি ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রার্থনার মতো বিষয়গুলো তার জীবনযাপনের প্রকৃতিকে চিহ্নিত করে। মনের গভীর স্তরটিকে নানা রঙের সুতায় মাকড়সার জালের মতো জটিল বুননে এক আশ্চর্য কাপড় হিসেবে তুলনা করা যায়।

চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানের একটি পদ্ধতি হল সম্মোহনের মাধ্যমে রোগীর অবচেতন মনে প্রবেশের চেষ্টা। রোগীকে সম্মোহিত অবস্থায় এনে সাজেশন দেয়া হয় অতীত ঘটনা বলতে। যে সমস্ত ঘটনা তার জন্য ক্ষতিকর হিসেবে রেখাপাত করে আছে সে সমস্ত কিছু ভুলে যেতে কিংবা সেসবের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মনকে মুক্ত রাখতে বলা হয় পরবর্তী বৈঠকসমূহে। এরকম মনোচিকিৎসা পদ্ধতি যদিও বহুল প্রচলিত এবং মনোচিকিৎসকের চেম্বারে রোগীর ভিড়ও এ যাবৎ লক্ষ্যণীয় পর্যায়ের তবু এর যথার্থ সফলতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যায়। নিবিড় অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে কতভাগ রোগীর সুস্থতা সাময়িক আর কতভাগ রোগীর স্থায়ী। কিংবা আসলেই সুস্থ হওয়ার হার আশাব্যঞ্জক কিনা। বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগেও মানসিক রোগ প্রায়

অজেয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রে ট্রাংকুলাইজার জাতীয় ঔষধ দ্বারা রোগিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয় এবং ভাবা হয় যে দীর্ঘদিন এভাবে রোগির স্নায়ুসমূহ বিশ্রামের ফলে উত্তেজনাকর অবস্থা থেকে পূর্বের প্রকৃত শান্ত অবস্থায় ফিরে আসবে । সম্মোহনের ক্ষেত্রেও এভাবে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা থাকে । রোগিকে আপাতসম্মোহিত মনে হলেও এবং চিকিৎসকের সাজেশন অনুযায়ী সম্মোহিত আচরণ দৃষ্ট হলেও প্রকৃত সত্য হল যে অবচেতন মনের গভীরতা পরিমাপ করা দুঃসাধ্য । রোগির অবচেতন মন রোগিকে এতটাই সম্মোহিত হতে অনুমতি দিবে কিংবা চিকিৎসকের সঙ্গে সহযোগিতা করবে যতটা সে আরও গভীর স্তরে অনেক জটিল হিসেবনিকেশের মাধ্যমে বের করতে সক্ষম হবে । এটা আসলেই বিস্ময়কর যে অবচেতন মন মানুষকে অতুলনীয় সমৃদ্ধি দান করতে পারে আবার ফেলে রাখতে পারে দীনহীন নির্জীব করে ।

যদি আমরা মনের কার্যকরণ ক্ষমতাকে নিতান্তই জটিল যন্ত্রের ক্ষমতা হিসেবে ধরি এবং মনে করি যে বিভিন্ন ঘটনার মিথষ্ক্রিয়ায় সে একটি ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে, তবে আমরা এ-ও ধরে নেব যে সে তার সামাজিক ও পেশাগত জীবনে নির্দিষ্ট অবস্থানে থাকা হেতু নানা অবদমনের মাধ্যমে পরোক্ষে এরকমই অনুমতি পেয়েছে । এক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব বেড়ে যায় এবং অন্ধকারে আলো জ্বালাতে সক্ষম কাউকে-না-কাউকে এগিয়ে আসতেই হয় ।

কবি, গবেষক, ঢাকা ।